নারী স্বাধীনতার স্বরূপ

ড. ইয়াদ কুনাইবী

নাজমুল হক সাকিব
অনূদিত

সূচিপত্র

পশ্চিমা নারীর গল্প

এখন আমরা আছি ইউরোপে। সময়টা খ্রিষ্টাব্দ উনবিংশ শতাব্দী। আমাদের অবস্থান এখন ব্রিটেনে। এখানে আমরা এসেছি একটি আন্তর্জাতিক বাজার পরিদর্শনে। আমরা দেখব, এখানে কী কী পণ্য নিলামে বিক্রি হচ্ছে। একজন পুরুষকে দেখলাম, তার পণ্যের নিলাম করতে হাঁক ছাড়ছে। কী তার পণ্য? তার পণ্য হলো তার স্ত্রী। নিজের স্ত্রী? হ্যাঁ, তার নিজের স্ত্রী।

তৎকালীন ইউরোপে অনেক পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত। বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি www.history.com ওয়েবসাইটটিতে গিয়ে 'WIFE SELLING' লিখে সার্চ করুন। যাবতীয় ইতিহাস ও তথ্য হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন। স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়া তখন তালাক দেয়ার চেয়ে সুবিধাজনক ছিল। তাই কখনো কখনো স্ত্রীকে বেচে দিয়ে পুরুষেরা তাদের ঋণ শোধ করত। পশ্চিমা ইতিহাসের নথিপত্রে এমন বহু প্রচলনের তথ্য পাওয়া যায়। তখন স্ত্রীকে মনে করা হতো পুরুষের জন্য বিরক্তিকর ও অপমানজনক। তারা নারীকে বলত Nagging woman (নরকীয় নারী)। নারীর প্রতি তাদের অবিচারের একটি দৃষ্টান্ত ছিল ধাতব লাগাম। সেই লাগামকে তারা বলত Scolds Bridle (তিরস্কারের লাগাম)। লাগামটি ছিল মানুষের মাথার মাপে লোহার তৈরি একটি খাঁচা আকৃতির। জিহ্বার নিচে ছিল কাঁটার মতো ধারালো। যাতে কথা বললে তা মুখে বিদ্ধ হয়ে যায়। এই লাগাম পরিয়ে স্বামীরা স্ত্রীদের শাস্তি দিত। এগুলোর বাস্তব চিত্র দেখতে আপনি Scolds Bridle লিখে ইউটিউবেও সার্চ করতে পারেন। নারীর কথা ও তার অভিযোগকে দমিয়ে দিতে এটাই ছিল সে সময়ে ইউরোপিয়ানদের পদ্ধতি।

এভাবেই নারীর উপর প্রয়োগ করা হতো অত্যাচারের নানান পন্থা। বিশেষত সমাজের নিম্নশ্রেণির নারীদের উপর এসব অত্যাচার ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। প্রশ্ন হলো, এই নারী এখন কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবে? কীভাবে সে তার মাঝে ও পুরুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করবে? কীভাবে সে সত্যকে বাস্তবায়ন ও মিথ্যাকে বিতাড়ন করবে? কীভাবে সে ইনসাফ ও অধিকার ফিরে পাবে? ইনসাফ ও অধিকারের অর্থ অনুধাবন করতে হলে তো তাকে আসমানি ওয়াহির সংস্পর্শে আসতে হবে। এমন একটি সংবিধান তো থাকতে হবে, যা পুরুষ ও নারী উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেবে।

মুক্তির লক্ষ্যে তাই পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করল। দেখল সেখানে লেখা আছে, নারীকে সারা জীবন চুপ থেকে পুরুষের আনুগত্য করতে শিখতে হবে।

তার জন্য শিক্ষার কোনো অনুমতি নেই। কখনোই সে পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু কেন? কারণ, সে 'হাওয়া' এর জাতি। যে হাওয়ার কারণে পুরুষ আদম পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সকল বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়েছে। তাই সে সকল অপরাধের মূল। মানবজাতির দুর্ভাগ্যের পেছনে সে-ই একমাত্র হোতা। এ জন্যই প্রতিপালক তাকে শাস্তিস্বরূপ সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষকে তার মনিব বানিয়েছেন। পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে লেখা পেল যে, তারা শুধু পুরুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের জন্য পুরুষ সৃষ্টি হয়নি। তাই একজন পুরুষ চাইলে তার কন্যাকে বিক্রি করে দিতে পারে।

পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মের মাঝে এই অত্যাচারের স্টিমরোলার থেকে নিজেদের মুক্তির কোনো পথ অনুসন্ধান করে পেল না। যখন আসমানি ওয়াহি নারীকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারল না, তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে পারল না, তার অধিকার আদায় ও ইনসাফের কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না—তখন কোথায় যাবে নারী? অবশেষে নারীর জন্য একটি পথই খোলা থাকল। সেই পথ হলো স্বাধীনতা ও সমতার পথ। এবার নারীকে পুরুষের কবল থেকে স্বাধীন হতে হবে। পুরুষের সাথে সমতা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নামতে হবে। কিন্তু কী হবে এই স্বাধীনতা ও সমতার রূপরেখা? যা অধিকার ও ইনসাফের বিকল্প হবে। কে নির্ধারণ করবে কোনটা অধিকার আর কোনটা ইনসাফ? ধর্ম? না, পশ্চিমা নারীর কাছে ধর্ম হলো তার প্রতিপক্ষ। তার আশ্রয়দাতা বা ত্রাণকর্তা নয়। এভাবেই তথাকথিত পশ্চিমা 'নারী স্বাধীনতা' তার যাত্রা সূচনা করল। তারা তার নামকরণ করল Women Liberation (ওম্যান লিবারেশন)। যা নিতান্তই মানবকল্পিত মতবাদ। আসমানি ওয়াহির সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

স্বভাবতই একদিকের অবহেলা অপরদিক থেকেও অবহেলার হেতু হয়। ফলে নারীমুক্তির আন্দোলনের সূচনালগ্নেই তৈরি হলো লিঙ্গভিত্তিক বিভেদ। জন্মলাভ করল ফেমিনিজম তথা নারীবাদ। যা নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দিলো। নারী ও পুরুষের মাঝে শত্রুতা ও প্রতিযোগিতার বীজ বপন করল। নারী যেন এবার তার প্রতি অতীত অবিচারের প্রতিশোধ নিতে নামল। এভাবেই লিঙ্গগত বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল। যার সারকথা হলো—পুরুষ কখনো নিরাপদ নয়, নারী সব সময় তার প্রতিপক্ষ এবং সব ক্ষেত্রেই সে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর নারী কখনোই কারও জন্য একবিন্দু ছাড় দিতে পারে না। কেউই তার পক্ষ থেকে আত্মত্যাগ গ্রহণ করার অধিকার রাখে না। শুধু নারী নিজে ও তার মতো অন্য নারীরা সেই অধিকার রাখে। তাই নারীর উপর কারও কোনো কর্তৃত্ব থাকা চলবে না। জগতে বাঁচতে হলে নারীর আর কাউকে প্রয়োজন নেই। ফলে নারীর

কোনো স্বামী, ভাই বা সন্তানের প্রয়োজন নেই। নারীকে বলা হলো, তোমরা উপার্জনের সক্ষমতাই তোমার সম্মানের উৎস। যখন তুমি কাউকে তোমার জন্য খরচ করার সুযোগ দিলে, তখন তুমি নিজের সম্মান হারালে। তখন তুমি যেন তার দাসত্ব স্বীকার করে নিলে। তাই তোমার জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক।

এখানে এসে কিছু বিবেক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হলো। প্রশ্ন উঠল, নারীর মূল্যায়ন যদি শুধু তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার ভিত্তিতে করা হয়, তবে সন্তান লালনপালন করবে কে? যদি স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মাঝে প্রতিপক্ষের সম্পর্ক হয়, তাহলে কে পরিবারকে পরিচালনা করবে? সর্বশেষ কার মতামত বাস্তবায়িত হবে? এভাবে চললে তো পরিবারব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। উত্তর এল, পরিবার-সন্তান সব জাহান্নামে যাক। এসব মিষ্টি কথার আড়ালে তোমরা নারীকে আরেকবারের জন্য দাসী বানাতে চাও। এসব তোমাদের চতুর শিরোনাম। আমরা তো তোমাদের আগেই বলে দিয়েছি, কেউ আমাদের আত্মত্যাগ গ্রহণ করার অধিকার রাখে না। নারীর মুক্তির স্বার্থে আমরা একবিন্দু ছাড় দিতে প্রস্তুত নই। আমরা নিপীড়িত। যথেষ্ট অত্যাচার তোমরা আমাদের উপর করেছ।

এভাবেই মিলিয়ে গেল পরিবার ও সমাজব্যবস্থা রক্ষার সর্বশেষ আওয়াজ। বলা হলো, এসবের প্রবক্তরা হলো নারী স্বাধীনতার বিরোধী। তারা নারীকে আবারও দাসত্বের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে চায়। নারী কারও কোনো আওয়াজে কান না দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। তারা তো দীর্ঘদিন নির্যাতিত হয়েছে। এখন স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অল্পবিস্তর নির্যাতন যদি তারা করে, তাহলে তাতে দোষের কী আছে?

এ বক্তব্য লিঙ্গবিভেদ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় বহু নারীর মুখে স্পষ্টই ফুটে উঠল। যেমন : আমেরিকান নারীবাদী হেলেন সোলেঙ্গার স্পষ্ট বলে দিলো, পুরুষরা আমাদের মাথায় বিয়ের চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের ব্যর্থতার পেছনে বিয়েই একমাত্র দায়ী। তাই আমাদের এই বিয়েব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। নারীমুক্তির জন্য একটি মৌলিক শর্ত হলো, বিয়েব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দেয়া। তাই নারীদেরকে এখন স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা আর পুরুষের সাথে থাকবে না। ইতিহাসকে আবারও নতুন করে সেই অধ্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেখান থেকে নারীর উত্থান হয়েছিল। এবার তার শিকার হবে স্বয়ং পুরুষ। নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রীদের এমন বহু বক্তব্যের নথি আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে।

এই নির্যাতিতা বিপ্লবী নারী ছিল একদল পুঁজিবাদী, নৈতিক স্খলনের এজেন্ডাবাহী, রাজনীতিক ও বিশেষ একটি মহলের সদস্যদের জন্য না চাইতেও বৃষ্টির মতো। যাদের

অধিকাংশই ছিল পুরুষ। এসব লোকেরা লিঙ্গবৈষম্য ও নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে স্বয়ং নারীবাদীদের পিঠে চড়ে বসল। যে কথার স্বীকারোক্তি শেষ পর্যন্ত নারীবাদীরাই দিতে বাধ্য হয়েছিল। নারীবাদী লেখিকা ন্যান্সি ফ্রেজার ব্রিটেনভিত্তিক পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানে এই শিরোনামে একটি আর্টিকেল লিখেছেন, 'কীভাবে ফেমিনিজম পুঁজিবাদের দাস হয়ে গিয়েছে এবং কীভাবে পুনরায় সে মুক্তি পেতে পারে'। নারীবাদী আন্দোলনের একজন প্রসিদ্ধ নেত্রী গ্লোরিয়া স্টাইনেম তার একটি সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তিনি নারীবাদী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়াও নারীবাদী আন্দোলনের অনেকেই মার্কিন সরকারের এই সংস্থাটি থেকে সহায়তা পায় বলে তিনি সেই সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। স্টাইনেম হলেন হলেন নারীবাদীদের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'মিস' ম্যাগাজিনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই পত্রিকাটির লক্ষ্য হলো, নারীসমাজে বিপ্লব ও স্বাবলম্বিতার চিন্তা ছড়িয়ে দেয়া। তাদের ভাষায়, 'সুপারওম্যান' তৈরি করা। স্টাইনেম মূলত ইন্ডিপেন্ডেট রিসার্চ সার্ভিস নামে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী। তবে তাকে কোনো গবেষণামূলক কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। বরং বেসরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি তার মাধ্যমে রাজনীতিক সুবিধা নেয়ার জন্যই শুধু তাকে নিয়োগ দিয়েছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদীরা নারীবাদ ও লিঙ্গবৈষম্যের কাঁধে চড়ে কী কী ফায়দা লুটে নিচ্ছে? আসুন তা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

১. স্বাবলম্বী ও সামর্থ্যবান হওয়ার লক্ষ্যে তারা নারীকে কাজে নামাতে পেরেছে। অর্থাৎ সমাজের অর্ধেক মানুষ যারা বিনা বেতনে বাড়িতে কাজ করত তাদেরকে তারা বেতনসহ বাড়ির বাইরে কাজে নামিয়েছে। খুব সহজেই তারা এসব নারীদের থেকে পুরুষদের চেয়ে কমমূল্যে শ্রম নিয়ে নিচ্ছে। বেতন ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের এই বৈষম্য আজও পর্যন্ত বিদ্যমান। তারপর নিজের পায়ে দাঁড়ানো এসব স্বাবলম্বী নারীরা নিজেদের অর্থ বিউটিপার্লার, পার্টি ও বিভিন্ন বিলাসিতামূলক কাজে ব্যয় করতে শুরু করেছে। অবশেষে দেখা যাচ্ছে, দিনশেষে এসব অর্থ আবারও পুঁজিবাদীদের পকেটে ফিরে আসে।

২. 'বিভক্ত করো ও জয়ী হও' রাজনীতি। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিকদের সিদ্ধান্ত রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণের উপর থেকে মানুষের দৃষ্টি সরে যায়। মানুষের চোখের আড়ালে চলে যায় যে, এই পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদ শুধু এক শতাংশ মানুষের হাতে আবদ্ধ। 'the mighty wurlitzer'

বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে, কীভাবে নারী ও পুরুষের ব্যবধান এবং সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে রাজনীতিবিদরা পুঁজিবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে? কীভাবে নারী ও কৃষ্ণাঙ্গদেরকে তারা নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে?

৩. বাবা ও মায়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্কের ফলে সন্তানদেরকে তারা সময় দিচ্ছে না। এভাবে পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। বাবা ও মায়ের বিশ্বাস ও আদর্শ অনুযায়ী সন্তানরা গড়ে উঠতে পারছে না। ফলে সন্তানকে প্রতিপালন করছে স্কুল ও রাষ্ট্র। এ সুযোগে রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণকারী পুঁজিবাদীরা তাদের শিশুমনে নিজেদের ইচ্ছেমতো যেকোনো স্বার্থান্বেষী চিন্তার বীজ বপন করছে। এসব প্রক্রিয়া থেকে আমেরিকায় একটি পরিভাষার প্রচলন ঘটেছে। তারা পরিবারের নাম দিয়েছে 'পারমাণবিক পরিবার'। কারণ, তা যেকোনো সময়ে বিস্ফোরিত হতে পারে।

লিঙ্গগত বৈষম্য থেকে রাজনীতিবিদরা চরম ফায়দা লুটে নিচ্ছে। তারা চাচ্ছে পরিবারব্যবস্থা আরও ভেঙে পড়ুক। লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মেরি বেন বলেন, সন্তানদেরকে লিঙ্গসমতা শেখাতে হলে তাদেরকে পরিবার থেকে দূরে রাখতে হবে এবং তাদেরকে পৃথকভাবে সামাজিক শিক্ষা দিতে হবে। এভাবেই বস্তুত অধিকাংশ পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে আমেরিকায় অভিভাবকহীন শিশুর সংখ্যা ইতিহাসের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকান সংবাদমাধ্যম 'নিউজউইক' তাদের একটি আর্টিকেলে তথ্যটি প্রকাশ করেছে। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০১৩ সালে আমেরিকায় গৃহ ও পরিবারহীন শিশুর সংখ্যা ছিল ২.৫ মিলিয়ন। এসব শিশুদের অনেকেই পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কারণ, বাবা ব্যস্ত। মা-ও ব্যস্ত। যখনই তারা অবসর হচ্ছে এবং পরিবারের সাথে মিলিত হচ্ছে তখন তাদের মাঝে শত্রুতা ও প্রতিযোগিতা লেগেই আছে। শিশুদেরকে নিয়ে ভাবার মতো কেউ নেই। তাদের সাথে কথা বলার মতোও কারও সময় নেই। এ জন্য অতিষ্ঠ হয়ে তারা পালাতে বা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

আমেরিকান বিচার বিভাগ এসব পালিয়ে যাওয়া শিশুদেরকে সংরক্ষণের জন্য একটি সংস্থা তৈরি করেছে। যার নাম 'চিলড্রেন রানওয়ে'। মা-বাবার অবহেলা ও অনাদরে বেড়ে ওঠা এসব শিশুদের অধিকাংশই মানসিক রোগে আক্রান্ত। শৈশব থেকে দেখে আসা বিবাদ ও উপেক্ষা তাদেরকে এতটাই মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে যে, তারা একটি বাসস্থানের বিনিময়ে নিজেকে অন্যের যৌনতা মেটানোর বস্তু হিসেবে বিক্রি করে দিচ্ছে। এসব শিশু ও কিশোরের সংখ্যা প্রতিদিনই অব্যাহতভাবে বেড়ে চলছে।

এখন নারীর কী হবে? নিজের স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তো সে রাজনীতিবিদ আর পুঁজিবাদীদের ক্রীড়নকে পরিণত হলো। সে কি নিজের অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারল? নাকি তার কল্পিত স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারল? আসুন তার বাস্তবতাটা আমরা পশ্চিমা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংস্থাগুলোর পরিংখ্যান থেকে জেনে আসি। আমার ধারণা, এখন আপনার যা শুনবেন তাতে আপনারা আঁতকে উঠবেন। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি কথা বলে রাখি। আমাদের উল্লেখিত তথ্যগুলো শোনার পর কেউ কেউ বলবেন, ঠিক আছে, তবে মুসলিমদের মাঝেও তো নারীর প্রতি অবিচারের দৃষ্টান্ত আছে। আপনারা কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন যে, মুসলিম সমাজেও নারীর প্রতি অবিচারের অনেক গল্প আছে? আমি আপনাকে বলব, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে আপনার প্রশ্নের কী সম্পর্ক? এ ধরনের তুলনা করার উপকারিতা কী? আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কি আমাদের সমাজ ও পশ্চিমা সমাজের মাঝে তুলনা করা? নাকি আমাদের সমাজ থেকে নারীর প্রতি অবিচারকে দূর করা? বরং আমরা স্বীকার করি, আমাদের সমাজ নারীর প্রতি এবং নারী ছাড়া অন্য আরও বহু শ্রেণির অবিচারে ভরে গেছে। যার দুর্ভোগ পুরুষ ও নারী উভয়ে ভোগ করছে। তাই আমাদের আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, সামগ্রিকভাবে অবিচার ও অত্যাচারকে দূর করার এবং সকল প্রকার দুর্ভোগকে বিতাড়িত করার একটি প্রয়াস।

পশ্চিমা রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মুসলিম নারীদেরকে বিশেষ একটি পন্থায় সেবা দিতে চায়। তারা অত্যন্ত জোরালোভাবে মুসলিম সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের প্রসার ঘটাতে চায়। তাই আজ আমরা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট করতে চাই। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, পশ্চিমা নারীর গল্প। আমরা মূলত দেখতে চাই, পশ্চিমারা নারীমুক্তির যে স্লোগান নিয়ে এসেছে তার কিঞ্চিৎ কি তারা তাদের ভূখণ্ডে নারীদের উপর বাস্তবায়ন করেছে? তারা কি তাদের নারীদের ইনসাফ, স্বাধীনতা বা সমতা কোনো একটি দিতে পেরেছে? আসলেই কি তারা মুসলিম নারীর কল্যাণ চায়? এসবের উপরই ভিত্তি করে মুসলিম নারী ও মুসলিম সমাজের সামনে পদক্ষেপটি কী হবে? কোথায় আমাদের গন্তব্য হবে? তাই আমার সুপ্রিয় পুরুষ ও নারী শ্রোতাবৃন্দ, আসুন আমরা এই গল্পটি আদ্যোপান্ত শুনি।

কোনোপ্রকার সংশয় ছাড়াই আমি আপনাদেরকে বলতে পারব, বর্তমানে কিছু মুসলিম সমাজে যে অবিচার চলছে ইসলাম তাকে সমর্থন করে না। ইসলাম নারীর সাথে আচরণের যে বিধান আমাদেরকে দিয়েছিল আমরা তা পরিপূর্ণ পালন করতে পারছি না। তাই আশা করি আপনারা ভুল বুঝবেন না। আসুন আমরা সেই আত্মরক্ষার পন্থা থেকে

বের হয়ে আসি, আমাদের শত্রুতা সব সময় আমাদেরকে যার মাঝে আবদ্ধ রাখতে চায়। আসুন আমরা সমস্যা সমাধানে এবং প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণে প্রত্যেকে মুসলিম ভাই ও বোনের মতো আচরণ করি। অনর্থক আমাদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতাকে বর্জন করি। এসব আমাদেরকে অশান্তি আর দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই দিতে পারবে না। তাহলে, আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো পশ্চিমা নারী। আসুন আমরা ধাপে ধাপে তার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

পথে পথে ঘুরতে থাকা পরিবারহীন তরুণী বা পরিবারের সাথে থাকা নিঃসঙ্গ তরুণী—যে পরিবারের সাথে থেকেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চায়। সে নিজের খরচ নিজে মেটাতে চায়। কিংবা তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। এখন সে কী করবে? তার এই সমস্যার কী সমাধান হতে পারে? এ ক্ষেত্রে 'নারী স্বাধীনতার দেশে' একটি তিক্ত বাস্তবতা রয়েছে। আমরা দেশটির নাম নিচ্ছি না। সেখানে এসব প্রয়োজনগ্রস্ত তরুণীরা নিজেকে একজন বয়স্ক পুরুষের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। সেই পুরুষ হয়তো তার বাবার বয়সী। পুরুষ তাকে নিজের শয্যাসঙ্গী হিসেবে কিছু অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নিচ্ছে। অর্থাৎ সে পার্টটাইম পতিতাবৃত্তি করছে আর পার্টটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেখা করছে। এভাবেই একজন পুরুষ শুধু অর্থের বিনিময়ে বহু নারীর সম্ভ্রমকে কিনে নিচ্ছে। এবার অনুমান করুন, তাদের কাছে নারীর মূল্য কী?

টোমা নামে এক ব্যক্তি একটি সংবাদমাধ্যমে কাজ করে। সে অবসরে যাবে। তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থও রয়েছে। কারণ, তার কাছে শয্যাসঙ্গী ক্রয় করার জন্য বছরে দেড় লক্ষ ডলার রয়েছে। সে বলছে, এটা বিয়ে থেকে অনেক সস্তা। এভাবে সে যা উপভোগ করতে পারবে তার তুলনায় উপরের অঙ্কটি খুবই নগণ্য। পরের কথাগুলো তার মুখ থেকেই শুনুন। সে বলছে, 'আপনি যখন কোনো রুমে প্রবেশ করবেন এবং আপনার পাশে একজন সুন্দরী নারীকে দেখতে পাবেন তখন আপনাকে তার সাথে একজন পুরুষের মতোই আচরণ করতে হবে। মেয়েটিকে আপনার একটি ফেরারি গাড়ি বা এ ধরনের উপভোগ্য বস্তু মনে করতে হবে।' তাহলে এই ভাড়াটে পুরুষ বলতে চাচ্ছে, এই পন্থায় একাধিক তরুণীকে ভোগ করা বিয়ের চেয়ে সস্তা। নির্জন স্থানে কোনো সুন্দরী নারীকে কাছে পাওয়া একটি সুন্দর গাড়িকে কাছে পাওয়ার মতোই। এই হলো তাদের কাছে নারীর প্রকৃত মূল্য।

এ ধরনের সেবা দেয়ার জন্য পশ্চিমা বিশ্বে ইন্টারনেট-ভিত্তিক বহু ব্যবস্থা আপনি পেয়ে যাবেন। পরিসংখ্যান বলছে, যেসকল লোকেরা সাময়িক উপভোগের জন্য তরুণীদের ভাড়া করছে তাদের অধিকাংশই তাদের সাথে ক্রয়কৃত পণ্যের মতো আচরণ করছে। আর এসব লোকদের অধিকাংশই বড় বড় কোম্পানির অফিসার ও কর্মজীবী মানুষ। উপরে আলোচ্য ব্যক্তির বক্তব্য থেকেই আপনারা কিছুটা অনুমান করতে পারছেন যে, এসব পুরুষের আচরণ কেমন হতে পারে। তারা নারীকে শুধু একটি ভোগের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে। তার মতে এসব তরুণীরা হলো বস্তু; মানুষ নয়। কিন্তু আপনি যদি জানতে পারেন যে, নারীর সাথে পণ্যের মতো আচরণ করাই পশ্চিমাদের মূলনীতি হয়ে গেছে, তাহলে কি বিস্ময়বোধ করবেন?

বহুদিন পূর্বে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে আমেরিকানদের প্রশ্ন করা হয়েছে, পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন কোন গুণাবলি সমাজের মানুষ বেশি মূল্যায়ন করে থাকে? এই প্রশ্নের জবাবে পুরুষের ক্ষেত্রে যেসব গুণাবলির কথা এসেছে তার শীর্ষে হলো, সততা ও চরিত্র। আর নারীর ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে হলো তার শারীরিক আকার ও গঠন। তাহলে আমেরিকার অধিবাসীরা নারীকে মূল্যায়ন করে তার শারীরিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে। এটি আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার সন্ধান দেয়। তাদের ভাষায় যার নাম Sexual Objectification Of Women। এভাবে তারা নারীকে একটি যৌনতা মিটানোর পণ্য হিসেবেই দেখতে চায়। তাই নারীর সাথে তাদের আচরণ হয় একটি ভোগ্যপণ্যের মতোই। একজন মানুষ হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয় না। তার বিশ্বাস, চরিত্র, সততা দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি তার মেধা ও দক্ষতা দিয়েও তাকে বিবেচনা করা হয় না। এই প্রতিবেদন আরও দুই যুগ আগের কথা। বর্তমানে এ বিষয়ে আরও বহু পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে। 'তারা নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না' এ কথার মানে এই নয় যে, তারা নারীকে ঘৃণা করে, নারীকে অপবিত্র বলে, নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। বরং তাদের কাছে নারী হলো একটি উন্মুক্ত বস্তু। সে তার ইচ্ছেমতো পড়ালেখা করবে, চাকরি করবে, আমোদ করবে এবং দিনশেষে নিজের সবটুকু পুরুষের কাছে বিলিয়ে দিয়ে চলে যাবে। ধীরে ধীরে এখন পশ্চিমা নারীরাও নিজেদেরকে পুরুষের জন্য ব্যবহারের পণ্য বলে ভাবতে শুরু করেছে। কারণ, মিডিয়ার দেয়া তথ্য থেকে এই চিন্তাই চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। সমাজও এই চিন্তার ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে। এমনকি ভিডিও গেইম পর্যন্ত এই চিন্তার বীজ বপন করে যাচ্ছে। নারীর শরীরকে এখন বিজ্ঞাপন ও ডেকোরেশনে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে বহু নারী তাদের দেহের সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যস্ত। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে তারা এখন আয়নার সামনেই বেশি সময় দিতে শুরু করেছে। এতে তাদের মাঝে নানা রকম

মানসিক রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকেই নিজের দেহ নিয়ে হতাশায় ভুগছে। অনেকেরই নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে। কারণ সে জানে যে, তার দেহটা সব সময় পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ সে এটাকে মানতে পারছে না।

নিজেকে পণ্য ভাবার মানসিকতা থেকে অনেক নারীই মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বাধ্য হয়ে তাদেরকে টেলিভিশন ও সিনেমায় প্রচারিত নারীদের মতো সেজে পুরুষদের আকর্ষণ করতে হচ্ছে। এ জন্য প্রচুর পরিমাণে আর্টিফিশিয়াল সাজগোজের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কখনো বা প্লাস্টিক সার্জারি করতে হচ্ছে। নিজেকে পুরুষের সামনে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন গিয়ে কখনো চুল ও চামড়ার রং বদলাতে হচ্ছে। এমনকি সার্জারির আশ্রয় নিয়ে চোখের রংও বদলাতে হচ্ছে।

আপনি এখন ইচ্ছে করলে আপনার মস্তিষ্কে এই পশ্চিমা স্বাধীন নারীর একটি চিত্রায়ণ করতে পারেন। যে একদিকে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে সমাজ তাকে শুধু একটি পণ্য হিসেবে দেখছে। তার সবকিছু মূল্যায়িত হচ্ছে দৈহিক কাঠামোর ভিত্তিতে। আপনি কল্পনা করুন, তাকে রাস্তা-ঘাটে, স্কুল-কলেজে, কর্মক্ষেত্রে ও পাব্লিক প্লেসে কী ধরনের আচরণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমনকি বাড়িতে বসে ভার্চুয়াল জগতেও সে একই রকম আচরণের শিকার হচ্ছে।

২০১৪ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মৌলিক অধিকার বিষয়ক সংস্থা এফআরএ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যার শিরোনাম, 'নারীর প্রতি সহিংসতা : প্রতিদিন, প্রতিটি স্থানে'। এই প্রতিবেদনে এমন অনেক সহিংস আচরণের কথা তুলে ধরা হয়েছে—শৈশব থেকে একজন পশ্চিমা নারী যার সম্মুখীন হয়। দুই বছর পূর্বে (২০১৭) জাতিসংঘ একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার শিরোনাম, নারীদের অনেক বড় একটি অংশ প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে লিঙ্গগত কারণে সহিংস আচরণের শিকার হচ্ছে। বলা হলো, অনেক বড় একটি অংশ। সেই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, এসব আচরণ অনবরত একটি বৈশ্বিক হুমকির রূপ নিচ্ছে। ফরাসি নারী অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাতে আরেকটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ফ্রান্সে যেসকল নারী পাব্লিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করছে তাদের শতভাগই কোনো না কোনোভাবে যৌনহেনস্থা ও সহিংস আচরণের শিকার হচ্ছে। তবে ফ্রান্সের জাতীয় টেলিভিশন দাবি করেছে, এই প্রতিবেদনে অতিশয়তার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তবু আপনি কল্পনা করে দেখুন, সেখানে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা প্রতি এক শ জনের সবাই অথবা তারচেয়ে সামান্য কিছু কম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর কেমন সময় কাটছে? আমার মনে পড়ে, যখন আমি ডক্টরেট করার জন্য আমেরিকার হিউস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম তখন আমাদেরকে একটি ছোট্ট লিফলেট দেয়া হলো। সেখান থেকে জানতে পারলাম, প্রতি তিনজন ছাত্রীর একজন যৌনসহিংসতা বা হেনস্থার শিকার হচ্ছে। একজন ছাত্রী সহিংস আচরণের শিকার হলে তাকে কী কী করতে হবে, কোন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয় লিফলেটটিতে উল্লেখ ছিল। কিন্তু ব্যাপারটির নিকৃষ্টতা দিনদিন বেড়েই চলছে এবং বিশ্বব্যাপী তা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি যেসব খ্যাতিমান শিক্ষাঙ্গনকে সামাজিকভাবে সম্মানিত বলে বিবেচনা করা হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানেও একই চিত্র বিরাজমান। গত বছর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমেরিকায় চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়নরত ৫০ শতাংশ ছাত্রীই যৌনসহিংসতার শিকার। এ বছর (২০১৯) ব্রিটেনে অধ্যয়নরত অর্ধেকের বেশি ছাত্রীই যৌনহয়রানি শিকার হয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ব্রিটেনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানে। এই যৌনহয়রানির জন্য শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ও শিক্ষকদের তদারকি কোনো বাধাই নয়। ফলে ডক্টরেট করতে আসা ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের দ্বারা যৌনহয়রানির শিকার হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফরা পর্যন্ত এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়।

চিন্তা করুন, একজন ছাত্রী তার শিক্ষকের কাছে কিছু শিখতে গেল। অথচ শিক্ষার পরিবর্তে সে যৌনহয়রানির শিকার হয়ে ফিরল। এভাবেই বিভিন্ন প্রকারের যৌনহয়রানি আর সহিংসতার শিকার হতে হতে ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পাড়ি দিলো। সর্বনিম্ন ৫০% শতাংশ ছাত্রী ইতিমধ্যে যৌনহেনস্থার শিকার হয়ে গেছে। এখন তাদেরকে চাকরি খুঁজতে হবে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে নারীর চাকরিই তার নিরাপত্তার একমাত্র উৎস। তাদের ধারণামতে, সেখানে তাদের কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। স্বামী, বাবা, সন্তান, ভাই কেউ তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে আসবে না। কারণ, তারাও তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল নয়।

অধিকাংশ সময়ই আমরা এই তিক্ত বাস্তবতাটি ভুলে যাই। আমরা শুধু পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা নিয়েই আলোচনা করি। কিন্তু ভুলে যাই যে, এই স্বাধীনতা তার প্রতি অন্যের দায়িত্ববোধকে তুলে দিয়েছে। এখন আর কেউ অর্থনৈতিকভাবে তার পাশে দাঁড়াবে না। কেউ তাকে মানসিকভাবে শক্তি জোগাবে না। তার কিছু হয়ে গেলে তার দায়ভার কেউ বহন করবে না। যাইহোক, এ জন্য নারীকে তার কাজে থিতু হতে হবে। নতুবা সে চাকরি হারাবে। আর চাকরিই তার সকল নিরাপত্তার উৎস। আচ্ছা, চাকরি করতে গিয়ে যদি তার উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় যা তার নারীসুলভ স্বভাবের বিরোধী,

তাহলে সে কী করবে? সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না। কারণ, সে শর্তহীনভাবে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমতাকে মেনে নিয়েছে। তাই তাকে সম্পদ উপার্জনের জন্য যেকোনো কাজ করতে হবে। এভাবেই তার কল্পিত একমাত্র নিরাপত্তার উৎস সেই চাকরিই তাকে পুনরায় দাস বানিয়ে নেয় এবং তার সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

২০০২ সালে ব্রিটেনের বিবিসি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার শিরোনাম, ব্রিটেনে প্রতি চারজনের একজন কর্মজীবী নারী 'অফিসসেক্স' করে। দিনদিন এই সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। ব্রিটেনভিত্তিক পত্রিকা সেফলাইনে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ব্রিটেনে কর্মজীবী নারীদের অর্ধেকের বেশিই যৌনহেনস্থার শিকার হয়। বেশির ভাগ সময়ই অফিসের বস ও উপরস্থ অফিসারের দ্বারা হেনস্থার শিকার হয়। আমেরিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মসংস্থানে যৌনহেনস্থার শিকার হওয়া নারীর সংখ্যা শতকরা ৫৬ শতাংশ। একই রকমভাবে নারী ডাক্তাররাও পুরুষ ডাক্তার দ্বারা হেনস্থার শিকার হচ্ছে। এমনকি রোগীরাও ডাক্তারদের কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। নার্সিংকে বলা হয় মানবীয় পেশা। আমেরিকার একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ৭০ শতাংশেরও বেশি নার্স রোগী ও সহকর্মীদের দ্বারা যৌনহেনস্থার শিকার হচ্ছে। ব্যাপারটা এতই সহজ হয়ে গেছে যে, পুরুষ সহকর্মীরা নারী সহকর্মীকে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরতে বলছে। যাতে তারা তাকে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন বলছে, রেস্টুরেন্টে কর্মরত বহু নারী প্রতিদিন পুলিশকে ফোন করে অভিযোগ করছে যে, রেস্টুরেন্টের মালিক তাকে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরতে বাধ্য করছে। মালিকরা বলছে, তারা শুধু খাবার পরিবেশন করার জন্য নারী কর্মচারী রাখেনি। বরং তাদের দ্বারা পুরুষ ক্রেতাকে আকর্ষণ করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

আমরা এখানে সেসব নারীদের নিয়ে কথা বলব না, যেসব নারীর স্বভাবই ব্যভিচার করা। ইকোনোমিস্ট ম্যাগাজিন বলছে, জার্মানিতে প্রতিদিন চার লাখ নারী কর্মী এক মিলিয়ন পুরুষের সেবা করছে। প্রতিদিনিই কোনো না কোনো নারী প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কিংবা নারীর স্বভাববিরুদ্ধ কাজের কারণে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু উপার্জন বন্ধ হয়ে গেলেই সে ভয়াবহ সমস্যায় পড়ছে। তার পিতা, স্বামী, ভাই, সন্তান কেউ তাকে দেখছে না। কেউ তার দায়িত্ব নিচ্ছে না। কারণ, সে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছে। দায়িত্ব নেয়ার মতো প্রতিটি পুরুষকে সে তার প্রতিপক্ষে পরিণত করেছে। এভাবে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজের পাশ থেকে সবাইকে হারিয়েছে। তাহলে এখন কী সমাধান? কে তার দায়িত্ব নেবে? আপনি বলবেন, সেখানে তো সামাজিক নিরাপত্তাভাতার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তাভাতা যদি তার

জন্য পর্যাপ্ত না হয়? কিংবা সামাজিক নিরাপত্তাভাতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যদি বিলম্বিত হয়? এ কথার উত্তর আপনি ব্রিটেন বিবিসি কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পেয়ে যাবেন। প্রবন্ধটি গত বছর এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে, 'সামাজিক নিরাপত্তাভাতা আমাকে পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করেছে'। প্রবন্ধটির শুরুতেই বলা হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তাভাতা না পাওয়ার কারণে ব্রিটেনে নারীরা পতিতালয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। বিবিসি এ ব্যাপারে ব্রিটেনের পাঁচটি সামাজিক সংস্থার সাথে কথা বলেছে। তারা তথ্য দিয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তাভাতা প্রাপ্ত নারীদের চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক নারী সুবিধাটি না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তিতে নেমে পড়ছে।

এভাবে নারী যখন তার সম্মান ও মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বাধ্য হয়ে একটি জঘন্য কাজে নেমে পড়ল তখন তা থেকে পুঁজিবাদীরা বড় একটি ফায়দা লুটতে শুরু করল। শুরু হলো ক্যাসিনো, নাইটক্লাবের রমরমা ব্যবসা। লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, শিক্ষাঙ্গন, পাব্লিক প্লেস ও কর্মস্থানে যেসব নারীরা যৌনহয়রানি বা সহিংসতার শিকার হচ্ছে তাদের অধিকাংশই পুলিশকে তা জানাচ্ছে না। আপনি বলতে পারেন, তারা হয়তো ব্যাপারগুলোকে উপভোগ করছে। তার দিকে তাকিয়ে আপনি এমনটি বলতেই পারেন। বলতে পারেন যে, এগুলো তার নারীত্বে একটি উপভোগ্য বিষয়। কিন্তু না; আপনার ধারণাটি সঠিক নয়। বরং তাদের অধিকাংশ সংখ্যকই অভিযোগ করছে না আতঙ্ক, ভীতি ও অপমানবোধ থেকে। এসবের শিকার হয়ে তারা নিজেদেরকে ছোট ভাবতে শুরু করে। তাদের মাঝে প্রতিশোধের স্পৃহা তৈরি হয়। ফলে তারা অভিযোগ না করে নিজেরা প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে। কখনো কখনো এসব থেকে মানসিক রোগও সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে বহু নারীকে পড়ালেখা ও কর্মসংস্থান ত্যাগ করতে হয়।

কিন্তু কেন তারা অভিযোগ করে না? এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। একটি কারণ হলো, ভয়। কারণ, অভিযোগ করলে তার প্রভাব তার বেতনের উপর পড়তে পারে। তাকে চাকরিও হারাতে হতে পারে। আরেকটি কারণ হলো লজ্জা ও অপমানবোধ। কখনো কখনো অভিযোগ প্রমাণ করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ তার হাতে থাকে না। হতে পারে, লোকটি তাকে অন্ধকার কোনো স্থানে একা পেয়ে হেনস্থা করেছে। তাই কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণের সুযোগও নেই। ফলে অপরাধকারী অপরাধ করে পার পেয়ে যায়। কেউ কেউ আবার হেনস্থাকারীর সামনে অবনত হয়ে যায়। কারণ তারা আশঙ্কা করে যে, বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তা হেনস্থা থেকে শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়েও পৌঁছে যেতে পারে। এভাবেই নারী নিজের ভেতর একের পর এক ক্ষত বহন করে চলছে।

কেউ বলতে পারেন, অপরাধ তো নারীরই? সে-ই তো এমন পোশাক পরিধান করেছে এবং এমন আচরণ করেছে যার ফলে পুরুষ তার প্রতি আকর্ষণবোধ করেছে। এই বক্তব্যটি মূলত অপরাধকে বৈধতা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। অপরাধ বিষয়ক সংস্থা এমনটিই বলছে। প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের সামনে পেশ করে। বরং প্রতিটি নারীই এমনটি করে থাকে। একদল নারী এখানে বসে লিঙ্গগত বৈষম্য তৈরি করে। যার ফলাফল সকল নারীর ভোগ করতে হয়। প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করতে করতে একসময় নারী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে মানসিক চিকিৎসা গ্রহণ করার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সেই ডাক্তারও তাকে যৌনহেনস্থা করছে। মি টু হ্যাশট্যাগে বহু নারী তাদের সেই অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। এই ট্যাগ ব্যবহার করে তারা পরস্পরকে সাহস জোগাতে চেয়েছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মানসিক হাসপাতালের স্টাফদের দ্বারা নারীদের যৌনহেনস্থা তুলনামূলক বেশি হয়েছে। যাদের দায়িত্ব ছিল মানুষকে রক্ষা করা তারাই তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তাহলে নারীরা কেন তাদের এই কথাগুলো পার্লামেন্টে তুলছে না? কেন তাদের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে এসে তাদের কথাগুলো তুলে ধরছে না? সেখান থেকে তো নীতিনির্ধারণ করা হয়। অপরাধ দমনে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেয়া হয়। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। আপনি পার্লামেন্টের কথা বলছেন তো? গত বছর সিএনএন একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, নারীর প্রতি যৌনহেনস্থা ও সহিংস আচরণ ইউরোপের পার্লামেন্টগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এতসব কিছুর পর নারী এখন কোথায় যাবে? কোথায় সে আশ্রয় গ্রহণ করবে? কে তাকে রক্ষা করবে? আমেরিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, সেখানের অধিকাংশ নারীই নিজের শরীর নিয়ে মানসিক পীড়ায় ভুগছে। তারা তাদের শরীরকে নিজেদের কাছেই আকর্ষণীয় করে রাখতে পারছে না। তাহলে অন্যরা তাদেরকে কীভাবে পছন্দ করবে? আর দৈহিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেললে মানুষের কাছে তার কোনো মূল্যায়নই থাকবে না। এ তথ্যটিও উপর্যুক্ত গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে।

নারীরা এবার নিজেদের মাঝেই একটি কঠিন প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ল। নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সকলেই উলঙ্গপনার আশ্রয় নিল। এভাবে যখন সমাজের অধিকাংশ নারী পুরুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য উলঙ্গপনা শুরু করল, তখন নারী তার সম্মান হারাল। সমাজ এখন তাকে শুধু যৌনতার দৃষ্টিতেই দেখতে লাগল। কেউ কেউ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নারীর দিকে হাত বাড়াল। ফলে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান ধুলোয় মিলিয়ে গেল। নিজের দোষেই নারী নিজেকে নষ্ট করল।

স্কুলে, কলেজে, বাসে, হাসপাতালে নারী যখন কোনো পুরুষ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তখন সেই পুরুষের উদ্দেশ্য শুধু তাকে একটি যৌনপুতুলের মতো ব্যবহার করা। এরচেয়ে বেশি কিছু সে ভাবছে না। তাই সে নারীর মন জয় করার পরিবর্তে তার শরীরকে লক্ষ্য বানাচ্ছে। নারীর প্রতি পুরুষের সেই দৃষ্টি নিছক লিঙ্গগত আকর্ষণের কারণে নয়; বরং সেই দৃষ্টি নারীর প্রতি অপমান ও অপদস্থতার। নারীর প্রতি তুচ্ছতার দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হচ্ছে শৈশব থেকেই। নারী স্বাধীনতা, সমতা, ইনসাফ এসব কোনো কিছুই পুরুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না। একটি গবেষণায় প্রশ্ন করা হয়েছে, নারীকে জবরদস্তি করে যৌনতায় বাধ্য করা কি বৈধ হতে পারে? ৩৬ শতাংশ মানুষ উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ; পুরুষ যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে সে তা করতে পারে। ৩৯ শতাংশ মানুষ মনে করে, যদি পুরুষ তার পেছনে অর্থ ব্যয় করে (যেমন : তাকে গিফট দেয়, তাকে ঘুরতে নিয়ে যায়), তবে সে তাকে বাধ্য করতে পারে। তার অধিকার আছে সেই নারীকে যৌনতার প্রতি বাধ্য করার। তাদের ভাষায়, forced sex was acceptable।

আপনি বলতে পারেন, একটু থামুন। আপনি নারীর প্রতি যৌন অবিচারের কথা বলছেন। সেখানে তো এমন মেয়েও আছে যারা স্বেচ্ছায় ও মনের আনন্দে প্রেমের সম্পর্কে জড়াচ্ছে। এটা ঠিক যে তা শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ। কিন্তু তারা তো এসব সম্পর্কে জড়িয়ে সুখী আছে? কারণ, তারা স্বেচ্ছায় সম্পর্ক করছে। আপনার উত্তরে আমি বলব, আপনি তাদেরকে সুখী বলছেন? পশ্চিমারা তাদের ফিল্মে আপনাকে এমনটিই ধারণা দিয়েছে। কিন্তু মূলত এটা শুধু কল্পনা। ঠিক যেমন তারা আপনাকে মহাশূন্যে প্রাণের অস্তিত্বের কথা বলে কল্পনার জগতে নিয়ে যাচ্ছে—এটাও ঠিক তেমনই। আসুন এর বাস্তব তথ্য জানতে আমরা হলিউড রেখে ইউরোপ ও আমেরিকার সরকারি সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যান দেখে আসি। যৌন-হয়রানি, হেনস্থা, সহিংস আচরণ ইত্যাদি বাদ দিয়ে তাদের ভাষায় বয়ফ্রেন্ডের আচরণ সম্পর্কে জেনে আসি। যারা ভবিষ্যতে হতে পারে নারীর স্বামী অথবা থেকে যেতে পারে শুধু প্রেমিক। আপনি আমেরিকার বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন। তারপর সার্চ করুন, নারীর প্রতি সহিংসতা (violence against women)। তারপর এই অপশনে প্রবেশ করুন (Battered women syndrom)। এই পরিভাষাটির অর্থ কী? Batter মানে হলো অনবরত জোরে আঘাত করা। যে আঘাতের কারণে শরীরের হাড় ভেঙে বা থ্যাঁতলে যেতে পারে। Battered women syndrom মানে হলো এভাবে মারার পর নারীর চেহারার যে অবস্থা হয় তা। ওয়েবসাইটে আপনি এমন বহু নারীর ছবিও দেখতে পাবেন, যে তার বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা চরম মারধরের শিকার হয়েছে। কেউ কেউ তাদের মারধর খাওয়ার পরের ছবি ইন্টারনেটে শেয়ার করেছে। এসব ছবি আমেরিকায় কোনো

দুর্লভ ছবি নয়। আপনি চাইলে পারিবারিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার জাতীয় ঐক্য পরিষদ NCADV ওয়েবসাইট ঘুরে আসতে পারেন। সেখানে আপনি তথ্য পেয়ে যাবেন যে, প্রতি চারজনের একজন নারী তাদের বয়ফ্রেন্ড দ্বারা চরম মারধরের শিকার হচ্ছে। এই পরিসংখ্যানটা অবশ্যই বাইরের যেকোনো পুরুষ দ্বারা নারীর আক্রান্ত হওয়ার পরিসংখ্যানের বাইরে। আর এখানে সেই মারের কথাও বাদ যাবে যা 'Battered women syndrom' এই সংজ্ঞার বাইরে যাবে। অর্থাৎ অল্পস্বল্প আঘাতের কথা এই পরিসংখ্যানে উল্লেখই করা হয়নি।

আমেরিকার অপরাধ বিষয়ক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নেয়া ব্যক্তিদের মাঝে ২২ থেকে ৩৫ শতাংশই পুরুষের আঘাতে আহত হওয়া নারী। কখনো কখনো তাদের হাড়ও ভেঙে যাচ্ছে। আপনি মনে করতে পারেন, সামগ্রিকভাবে হিসেব করলে হয়তো পুরুষের সংখ্যাই বেশি হবে। কিন্তু না। স্বামী, বয়ফ্রেন্ড বা অন্য কোনো পুরুষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যারা জরুরি বিভাগে ভর্তি হচ্ছে তাদের সংখ্যা সে বিভাগে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর ৯৩ শতাংশ। যেখানে পুরুষ রোগীর সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশ। নারীর প্রতি এই সহিংসতা কখনো কখনো হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সের রাজপথে একটি বড় মিছিল বের হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ২০১৯ সালে পারিবারিক সহিংসতায় নিহত ১১৬ জন নারীর মৃত্যুর প্রতিবাদ। ফ্রান্সের সংবাদ সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, ফ্রান্সে প্রতি তিন দিনে গড়ে একজন নারী স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড দ্বারা হত্যার শিকার হয়। ফ্রান্সের জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কিছুদিন পূর্বেই একটি মিছিলের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মিছিলটি ছিল নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে। সেখানে বলা হয়েছে, ফ্রান্সে প্রতি ৭ মিনিটে একজন নারীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা জাতিসংঘের কাছে এর বিচার চেয়েছে। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, বাড়িতে সঙ্গীর দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়ে গড়ে ৫০ জন নারীকেই হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। অর্থাৎ তারা একাধিকবার স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের হাতে মারধর ও অপমানের শিকার হয়।

আচ্ছা, তাহলে তারা কেন পালিয়ে যায় না? তারা আসলে কোথায় পালাবে? বাবার বাড়ি বা ভাইয়ের বাসায় চলে যাবে? আপনি কি ভুলে গেছেন, জীবনের শুরুতেই সে তার বাবাকে ফেলে এসেছে। হতে পারে সে তার বাবাকে চেনেই না। তার জন্মের আগেই তারা বাবা তার মাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। অথবা চেনে, কিন্তু তার প্রতি বাবার কোনো দায়িত্ববোধ নেই। সে তো স্বাধীন। সে তো স্বাবলম্বী। সে তো নিজের উপর কারও খবরদারি মেনে নেবে না। তাই তো সে পরিবারকে ত্যাগ করে চলে এসেছে। তাই

তো আপনি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে একটি ভিন্ন সেবাব্যবস্থা দেখতে পাবেন। যার নাম Women Shelter। অর্থাৎ অসহায় নারী আশ্রয়কেন্দ্র। এসব শেল্টারে তারা নারীকে সাময়িক আশ্রয় দিচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কিছু মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হচ্ছে।

যে নারী এভাবে অনবরত তার সঙ্গী ও বয়ফ্রেন্ড দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে সে তো চাইবেই তার সঙ্গী থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু তখনই তার সেই শুক্রাণুটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যা পুরুষ লোকটি তার জরায়ুতে প্রবেশ করিয়েছে। এ জন্য সে কাউকেই দায়ী করতে পারছে না। না সেই পুরুষটিকে। না সমাজকে। না রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। তাই বাধ্য হয়ে সে গর্ভপাত করছে। শুধু আমেরিকাতেই প্রতিবছর এক মিলিয়নের বেশি গর্ভপাত হচ্ছে। তার এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে ষষ্ঠ সপ্তাহের পর। অর্থাৎ সন্তানের দেহে প্রাণ আসার পর। এককথায় একে মানবহত্যা বলে আখ্যায়িত করা যায়। আমেরিকার রোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা Center for Disease Control এর তথ্য অনুযায়ী গর্ভপাত ঘটানো এসব নারীর ৮৬ শতাংশই অবিবাহিতা। অর্থাৎ একটি অবৈধ যৌন উত্তেজনার দ্বারা সূচনা হয়ে হত্যার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটছে। আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন, জীবিত সন্তানকে গর্ভপাত করে মেরে ফেলা কতটা জঘন্য কাজ? এর কোনো ছবি বা চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি না। কারণ, তা অনেক ভয়ংকর। আপনি যদি মানসিকভাবে শক্তিশালী হন, তবে আমি আপনাকে একটি পরিভাষা বলে দিচ্ছি। এটি লিখে গুগলে সার্চ করলে আপনি কিছু চিত্র পেয়ে যাবেন। পরিভাষাটি Dilation And Evacution Abortion।

গর্ভপাতের এই কাজে চিকিৎসকরা একাধিক ছুরি, ব্লেড ও কার্টার ব্যবহার করে গর্ভের শিশুটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। তারপর এক একটি অঙ্গ ভেতর থেকে বের করে আনে। হাত, পা, মাথা, পেট একের পর এক বেরিয়ে আসে। এই কাজটি পুরো বিশ্বে প্রতিদিনই অসংখ্যবার ঘটে থাকে। কিছু গর্ভপাতের চিত্র আরও ভয়ংকর। যদি কোনো নারী সন্তান প্রসব করে এবং তাকে জীবিত রাখতে না চায়, তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকায় একটি বাক্সের ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছে হলে সেই বক্সটিতে বাচ্চটি ভরে তাকে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়। পশ্চিমা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী নারীদের অনেকেই এমনটি করে থাকে। কখনো কখনো কয়েক মাস বয়সের নবজাতক শিশুকে মা রাখতে চায় না। তখন বিশেষ মেডিসিন প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। যেন কুরআনের এই আয়াতের বাস্তবতা :

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

'যখন পুঁতে ফেলা নারীশিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?'[১]

এর বাস্তবতা আমি আমার আরেকটি ভিডিওতে প্রকাশ করেছি। যার শিরোনাম, 'আবু জাহল যখন গাউন পরে'। এসব শিশুকে পুঁতে ফেলা হয় না। বরং তাকে হত্যার জন্য তুলে দেয়া হয় গাউন পরিহিত ডাক্তারদের হাতে। যাদের পোশাক থাকে শুভ্র। আর কাজটিও আইনত বৈধ। এভাবেই বহু নারীভ্রূণ পৃথিবীর মুখ দেখে না। অবশ্য সারা জীবন ধুঁকে ধুঁকে মরার হাত থেকেও তারা বেঁচে যায়।

এই হলো পশ্চিমা স্বাধীন নারীর অধিকাংশ চিত্র। যে নারী তার পিতা, ভাই, সন্তান ও স্বামীর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। আসলে তারা এসব দায়িত্বশীল ছায়া হারিয়েছে। ফলে নারী হয়ে গেছে একটি যৌনযন্ত্র। হয়ে যাচ্ছে একটি পুতুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ মেটাতে তাকে নিজের সম্ভ্রম তুলে দিতে হচ্ছে অচেনা পুরুষের হাতে। বরং তারা হয়ে গেছে সাদা চামড়ার ব্যবসায়ীদের পুতুল। পথে-ঘাটে তারা অনবরত আক্রান্ত হচ্ছে পুরুষের হাতে। এমনকি হাসপাতালের ডাক্তার পর্যন্ত তাদেরকে উত্ত্যক্ত করতে বাদ যাচ্ছে না। আর বয়ফ্রেন্ড বা স্বামীর কাছে প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছে চরম মারধরের।

প্রিয় সুধী, আপনি কি জানেন, আমি কেন এই বিষয়টি আলোচনায় তুলে আনলাম? কেন আমি এত এত তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম? কারণ, পশ্চিমা নারীর প্রতি আমার তীব্র মায়া অনুভূত হচ্ছে। আমি বারবার অনুভব করছি, মুসলিমদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো। আমরা এখানে প্রাচ্যের অমুসলিম সমাজের নারীকে নিয়ে কোনো কথা বলিনি। যেমন : চীনা নারী, জাপানী নারী ইত্যাদি। যাদের গল্প তাদের পশ্চিমা বোনদের চেয়ে কোনো অংশেই ভালো নয়। কোথাও নারীকে পুরুষের সমতুল্য পরিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে না। পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে তাকে ভাতা ও প্রমোশন দেয়া হচ্ছে না। এটি আরেকটি দীর্ঘ স্বতন্ত্র বিষয়। কেউ হয়তো বলতে পারে, আপনি শুধু পশ্চিমা নারীর অন্ধকারের বিষয়টিই তুলে আনলেন। তাদের আলোর বিষয়টি তো আলোচনায় আনলেন না। আলো? এই গভীর অন্ধকারের পর কি কোথাও আর আলো থাকতে পারে? যেখানে তাদের স্বাধীনতা আর সুরক্ষার দাবির আওয়াজই অত্যাচারের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে, যেখানে নারী তার আশ্রয়ের ঠিকানাটুকু পাচ্ছে না—সেখানে কোথায় আলো?

---

১. সূরা তাকবীর, ৮১ : ৯-১০

কিছু নারীর বৈশ্বিক প্রচার দেখে আপনি দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছেন? তাদের কিছু সফলতার গল্প আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে? কিন্তু কী মূল্য আছে এসব সফলতার? যদি সে বিজ্ঞানী হয় বা ডাক্তার হয়, তাহলেই বা কী লাভ? তারা তো তাদের আগামী প্রজন্মকে এই অপমান আর লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না। সমাজের অধোগতি থেকে বাঁচাতে পারছে না। কী লাভ সেই মাকে দিয়ে, যে তার নিজের সফলতার পেছনে ব্যস্ত আছে? আর তার ছেলেটা আরেকটি মেয়েকে যৌনহেনস্থা করে যাচ্ছে। তার সন্তান আরেকটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছে, মারছে, অপমান করছে। কী লাভ যদি অর্থের পাহাড় হয়ে যায় আর চরিত্র পশুর চেয়ে অধম হয়ে যায়? নারীর এই বিচ্ছিন্ন কিছু সফলতাকে কি কখনো পুরুষের সাথে সমতা বা স্বাবলম্বিতা বলা যায়? নারীর এই সফলতার পেছনে কি এসব লিঙ্গবৈষম্যের কোনো ভূমিকা আছে? নারী যদি পুরুষের সাথে নিরাপদে সহাবস্থান করতে পারত, তবে কি এরচেয়ে অনেক বেশি সফলতা আসত না? প্রত্যেকেই যদি অপরের অধিকার আদায় করত এবং অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ লালন করত, তবে কি আরও বেশি সফলতা আসত না? নারী ও পুরুষ মিলে যদি একটি শক্তিশালী পরিবারব্যবস্থা গড়ে তুলত, তবে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কি আরও উজ্জ্বল হতো না?

আলোচনার শুরুর দিকে গার্ডিয়ানের যে প্রতিবেদনটির কথা উল্লেখ করেছিলাম সেখানে আমি আবারও ফিরে যেতে চাই। সেই প্রতিবেদনে ন্যান্সি ফ্রেজারের লেখার সারাংশ আমি তুলে ধরতে চাই—যেখানে পশ্চিমা নারীবাদীদের আর্তচিৎকার ফুটে উঠছে। ন্যান্সি বলছেন, প্রথমে সাধারণ একজন নারীবাদী হিসেবে আমার কাছে মনে হতো, আমি নারীর স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। একটি নতুন পৃথিবীর জন্য লড়ছি। যেখানে আরও বেশি ইনসাফ, স্বাধীনতা আর সমতা থাকবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি সেসব ব্যক্তিদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম, নারীবাদীরা যাদের আইডল মনে করে। আমার মনে হলো, তারা নারীবাদী আন্দোলনের বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। আমার আশঙ্কা হলো, আমরা যাকে নারী স্বাধীনতা বলছি তা আমাদেরকে নতুন করে অসমতা ও অস্বাবলম্বিতার দিকে টেনে নিচ্ছে কি না। এই হলো নারীবাদী আন্দোলনের ফলাফল। যা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে পুরোপুরি বিপরীত। কখনো কখনো এই স্বাধীনতা আর স্বাবলম্বিতার আন্দোলনের ফল পুঁজিবাদীরা ঘরে তোলে। তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজে লাগায়। ইনসাফ, স্বাধীনতা আর সমতা কোনো কিছুর জন্যই নারীবাদী আন্দোলন কোনো কাজে আসে না।

এসব কিছু পড়ার পর আপনি আপনার রবের এই আয়াতটি পড়ে নিন :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ, আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এবং যেহেতু পুরুষরা নারীদের জন্য নিজেদের সম্পদ খরচ করে।'[২]

আরও পড়ুন :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।'[৩]

এসব পড়ুন আর পশ্চিমা নারীর পরিণতি নিয়ে ভাবুন। দেখুন আপনার রব কী বলছেন :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচার করো।'[৪]

আরও পড়ুন :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'নারীর যেমন সদাচার করা দায়িত্ব, ঠিক তেমনই সদাচার পাওয়া তার অধিকার।'[৫]

আপনার প্রিয় নবীর এই হাদিসটি পাঠ করুন,

خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى

'তোমাদের মাঝে সে উত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের সাথে উত্তম।'[৬]

---

২. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪

৩. সূরা তাওবা, ৯ : ৭১

৪. সূরা নিসা, ৪ : ১৯

৫. সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৮

৬. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৮৯৫; সহিহ।

পশ্চিমা নারীদের ভোগ্যপণ্য হওয়ার কথা ভাবুন আর এই আয়াত পাঠ করুন :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾

'বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করছেন ফিরাউনের স্ত্রীকে।'[৭]

না, সে কোনো বস্তু নয়। কোনো পণ্য নয়। নয় কোনো সাধারণ মানুষ। বরং নারী এখানে সকল বিশ্বাসী মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত। সকল মুমিনের জন্য আইডল। তিনি ছিলেন মুমিন নারী। তিনি ফিরাউনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। যে ফিরাউন মানুষের উপর দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানের ফিরাউনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে তিনি নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত। যারা আজ মানবতাকে দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে নারীরাও কথা বলবে। বিদ্রোহ করবে। ফিরাউনের স্ত্রী হলেন এ ক্ষেত্রে তাদের আইডল।

তার পরের আয়াতেই আল্লাহ বলছেন :

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ﴾

'আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম।'[৮]

অর্থাৎ আল্লাহ এসব নারীদেরকে মুমিনদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করছেন। তার কারণ হলো তাদের বিশ্বাস ও ঈমান। না, পশ্চিমাদের মতো বাহ্যিক বেশভূষা আর শারীরিক আকর্ষণের কারণে নয়।

যারা নারীকে ভোগ্যপণ্য মনে করে আপনি দেখবেন, আপনার রব নারীকে যে সম্মান দিয়েছেন তার কথা শুনলে তারা রেগে যাবে। তারা নারীর উপর বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়। আর আপনার রব নারীকে রাখতে চান পূতঃপবিত্র। আল্লাহ বলছেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

'যারা পবিত্র নিরীহ মুমিন নারীর নামে অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।'[৯]

---

৭. সূরা তাহরিম, ৬৬ : ১১
৮. সূরা তাহরিম, ৬৬ : ১২
৯. সূরা নূর, ২৪ : ২৩

পড়ুন, পুরুষ ও নারী উভয়েই পড়ুন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ﴾

'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের উপর তাদের আঁচলকে টেনে নেয়। এটাই তাদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। ফলে তাদেরকে কেউ কষ্ট দেবে না।'[১০]

আপনার নবীর এই হাদিস পড়ুন,

فاظفر بذات الدين تربت يداك

'তুমি ধার্মিক নারীকে প্রাধান্য দাও, যদিও তোমরা হাত ধূলিমলিন হয় না কেন।'[১১]

ধার্মিক নারীর কথা বলা হলো। কারণ নারীরা কোনো ভোগ্যপণ্য নয় যে, আপনি তাকে দেহকাঠামো দেখে বিয়ে করবেন। ইসলাম বলে, নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো তার চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতা।

আপনি যখন গর্ভপাত ও শিশুদের ফেলে দেয়ার বাক্সের কথা পড়েছেন, রাস্তা-ঘাটে তাদের নিগৃহীত হওয়ার কথা শুনেছেন তখন আপনার নবীর এই কথাও পড়ুন,

من كان له ثلاثُ بناتٍ يُؤويهنَّ ويرحمُهنَّ ويكفُلُهنَّ وجَبَت له الجنةُ البتةَ

'যার তিনটি কন্যা আছে আর সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের প্রতি দয়া করেছে এবং তাদের দেখভাল করেছে, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যার দুটি কন্যা রয়েছে? তিনি বললেন, দুটি কন্যার ব্যাপারেও একই কথা।'[১২]

আপনার মাথায় এখন আরও একটি প্রশ্ন আসছে। তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস পড়ুন,

النساء شقائق الرجال

'নিশ্চয় নারী পুরুষের সহোদরা।'[১৩]

---

১০. সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৯
১১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫০৯০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৪৬৬
১২. আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ৭৮; সহিহ।
১৩. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ১১৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ২৩৬। দঈফ।

সবশেষে আল্লাহর এই আয়াত পাঠ করুন :

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

'আল্লাহ তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে চান এবং তোমাদেরকে তাদের আদর্শে পথপ্রদর্শন করতে চান, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা অনেক বিচ্যুত হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে হালকা করতে চান। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে।'[১৪]

সবগুলো পড়ুন। তারপর আমাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করুন। আমাদের রবের দীনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পুরুষ ও নারীর অবস্থান উপলব্ধি করুন। এবার বলুন, নারীর মুক্তির জন্য আল্লাহ দীন ছাড়া কি অন্য কোনো সমাধান আছে? বরং মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহর দীনের বিকল্প নেই। যারা তার বিপরীত পথে চলছে তাদেরকে দেখুন। কীভাবে তাদের সমাজব্যবস্থা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ দীনকে না মানার কারণে আমাদের সমাজেও কীভাবে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন

প্রিয় ভাই ও বোন, আপনারা নিজেদেরকে স্বামী-স্ত্রী কল্পনা করুন। আপনাদের সম্পর্ক ভালো-মন্দ মিলিয়ে চলছে। কখনো ভালো। কখনো খারাপ। আপনাদের সামনে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। কিন্তু আপনারা কখনো তার নিকটে যাচ্ছেন। আবার কখনো তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আপনারা জানেন যে, আল্লাহর কিতাবের মাঝেই আপনাদের সব সমস্যার সমাধান বিদ্যমান আছে। কিন্তু কখনো অজ্ঞতা, কখনো প্রবৃত্তি আপনাদেরকে আল্লাহর কিতাব থেকে পরিপূর্ণ উপকারিতা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আপনাদের এক মাতাল প্রতিবেশী আছে। প্রায় সে তার স্ত্রীকে এমনভাবে

---

১৪. সূরা নিসা, ৪ : ২৬-২৮

প্রহার করে যে, তার চিৎকারের আওয়াজ আপনারা বাড়িতে বসে শুনতে পান। কখনো কখনো তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে মদ্যপান করে এবং মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। স্বামীর বন্ধুরা প্রায় প্রায় সেই নারীকে উপভোগ করে। কখনো তার ইচ্ছায়, আবার কখনো তার অনিচ্ছায়। আপনার মাতাল প্রতিবেশী তাতে কোনো বাধা দেয় না। আর যদি সে বাধা দেয়ার চেষ্টাও করে; তবু সে তা পারবে না। আপনাদের একজন দুষ্ট আত্মীয় আছে। তার কাজ হলো আপনাদের সেই মাতাল প্রতিবেশীর কথামতো কাজ করা।

একদিন আপনাদের সেই মাতাল প্রতিবেশী আপনাদের বাড়িতে চুরি করার উদ্দেশ্যে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছিল। তাকে সহায়তা করছিল সেই দুষ্ট আত্মীয়। ঘটনাক্রমে সেদিন আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া চলছিল এবং আপনাদের গলার আওয়াজ উঁচু হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় সেই মাতাল প্রতিবেশী আপনাদের বাড়িতে এল। তার এক হাতে মদের পেয়ালা, আরেক হাতে পানির গ্লাস। পানির গ্লাসটি সে আপনাদের বাড়ি থেকেই চুরি করেছে। সে এসে বলতে লাগল, হে প্রতিবেশিনী, আমি আপনার চিৎকার শুনেছি। আপনার আত্মীয় আমাকে খবর দিয়েছে যে, আপনার এখন আমাকে খুব প্রয়োজন। এই তো আপনাকে রক্ষা করতে এসে গেছি। অর্থাৎ সেই মাতাল প্রতিবেশী মুহূর্তের মধ্যেই 'রেম্বো'[১৫] হয়ে গেল। যারা রেম্বো কে চেনেন না তাদের জানার জন্য বলছি, রেম্বো হলো আমেরিকান নায়ক। আমাদের নতুন প্রজন্মের তরুণরা তাকে ভালো করেই চেনে।

সুধী, গত পর্বের আলোচনা যদি আপনারা পড়ে থাকেন তবে আপনারা বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও গবেষণার ফলাফলে দেখতে পেয়েছেন যে কীভাবে পশ্চিমা নারীর উপর নির্যাতন চলছে, কীভাবে তাকে দাসত্বের শেকল পরানো হয়েছে, পুঁজিবাদী ও রাজনীতিকদের ফায়দার জন্য কীভাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কীভাবে পশ্চিমা নারীকে লিঙ্গগত বিভেদের বলি বানানো হয়েছে। এবার আপনারা কল্পনা করুন, যারা তাদের দেশের নারীদেরকে অত্যাচারের স্টিমরোলারে পিষ্ট করছে এবং তাদেরকে শুধু একটি ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে তারাই আমাদের দেশে এসে রেম্বোর মতো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাচ্ছে। তাদের শিরোনামটি দেখুন কত দারুণ, 'মুসলিম নারীর মুক্তি'। কীভাবে? নারীর বিরুদ্ধে সকল বিভেদের পর্দা তুলে দিতে হবে। তার উপর কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের নিশানা মুছে দিতে হবে। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পুরুষের সাথে তার সমতা নিশ্চিত করতে হবে। তাকে যৌনস্বাধীনতা দিতে হবে।

---

১৫. রেম্বো ডেভিড মোরেলের উপন্যাস 'ফার্স্ট ব্লাড' অবলম্বনে নির্মিত একটি আমেরিকান অ্যাকশন চলচ্চিত্র সিরিজ।

মুসলিম বিশ্বে বহু নারী সত্যিকার অর্থেই অত্যাচারের শিকার হয়। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়াহর নিকট কি এই সমস্যার বাস্তবসম্মত কোনো সমাধান রয়েছে? নাকি রেম্বোর কাছেই সব সমস্যার সমাধান? এবারের আলোচনায় আমরা তুলে ধরব রেম্বো ও দুষ্ট আত্মীয়ের পেশ করা সকল সমাধানগুলো এবং নারীর সামনে পানির গ্লাস পেশ করার পেছনে তাদের কী কী উদ্দেশ্য রয়েছে ইত্যাদি। তারপর আমরা চারটি প্রশ্ন করব রেম্বোকে। আমরা দেখব, সে কি সত্যিই নারীর মুক্তি নিয়ে ভাবছে; নাকি তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে? যদি তা-ই হয়, তবে আমরা নারীর মুক্তির সঠিক সমাধানটি অনুসন্ধান করব ইনশাআল্লাহ।

১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ বৈঠকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়েছে এই শিরোনামের উপর—'নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করা হবে'। এ জন্য যে ধারাটি প্রণয়ন করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত নাম হলো CEDAW (সিডাও)। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সব রাষ্ট্রই এই ধারার অনুগত হয়ে গেছে। এসব রাষ্ট্রের মাঝে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধারাটি প্রণয়নে অগ্রসর ভূমিকা রেখেছে এবং মুসলিম বিশ্বসহ সকল রাষ্ট্রের উপর তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেছে, সেই যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এখনো তার রাষ্ট্রে এ বিষয়ক কোনো আইন প্রণয়ন করেনি। চল্লিশ বছর যাবৎ তারা তাদের রাষ্ট্রে এ বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রতিবছরই জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয় এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কোনোভাবেই তারা এটাকে আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে সম্মত হচ্ছে না। এ জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। কিন্তু কেন? কেন তারা সিডাও আইনটি বাস্তবায়ন বা প্রণয়ন করছে না? কারণ এর পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো আমেরিকার রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতারা। তারা বলছে, আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্র সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে সিডাও প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এভাবে আমেরিকা উভয়মুখী সংকটে পতিত হয়েছে। আমেরিকার রাজনীতিবিদ, নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রীসহ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতে আমেরিকার সাধারণ জনগণ এই আইনটি মেনে নিতে সম্মত নয়।

মার্কিন সিনেটর জেসি হেমজ 'সিডাও' সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, এটি একটি বাজে সিদ্ধান্ত। এর মাধ্যমে আমেরিকার রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ করার পথ বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমেরিকায় এখন যে আওয়াজটি সবচেয়ে উঁচু তা হলো, জাতিসংঘের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা আমেরিকার ভবিষ্যৎকে হুমকির সম্মুখীন হতে

দেবো না। অথচ এই আইনগুলোই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর বিভিন্নভাবে চাপিয়ে দেয়ার কসরত করছে জাতিসংঘ।

সিডাও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। প্রকারান্তরে তারা সিডাওকে একটি দীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে এবং সারা বিশ্বে—বিশেষত মুসলিম বিশ্বে—তা প্রতিষ্ঠা করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলিম বিশ্বের সবকিছুকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তারা মসজিদ ধ্বংস করেছে। মাদরাসা ও শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। মিডিয়া ধ্বংস করেছে। সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে। এখন শুধু একটিমাত্র দুর্গই অবশিষ্ট আছে। আর তা হলো পরিবার নামক দুর্গ। সিডাও হলো এই দুর্গটিকে ধ্বংস করার জন্য তাদের অন্যতম একটি হাতিয়ার।

সিডাও বা তার এজেন্ডাবাহীদের শব্দগুলো খুব চাতুর্যপূর্ণ। তাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিরোনাম হলো, 'নারীর ক্ষমতায়ন'। তাদের এজেন্ডার বিরুদ্ধে যারা কাজ করবে এবং তাদের চিন্তার বিপরীত চিন্তা যারা লালন করবে তারা তাদেরকে স্পষ্ট বলে দেবে, আমরা নারীর জন্য যা করতে চাই সে ক্ষেত্রে তুমি যদি আমাদের সমর্থন না করো তবে তুমি আমাদের বিরোধী। তুমি নারীর প্রতি অবিচার, মারধর, অপবাদ ও কর্তৃত্বকে সমর্থন করো। তুমি নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাও। কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে যার শিরোনাম, 'নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন'। প্রতিবেদনটিতে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। নারীর প্রতি অবিচারের চিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, তুলনামূলক খুব সামান্যসংখ্যক নারী বিবাহ-বর্হিভূত পন্থায় নিজেদের যৌনস্বাধীনতাকে উপভোগ করতে পারছে। অর্থাৎ অধিকাংশ নারীরই বিবাহ-বর্হিভূত পন্থায় যৌনস্বাধীনতা উপভোগ করার সুযোগ নেই।

তারা ভাবতে লাগল, কীভাবে সিডাওয়ের নাম উল্লেখ না করে আমরা মুসলিমদের মাঝে তার চিন্তাগুলো ছড়িয়ে দিতে পারি। তাই এবার তারা রেম্বোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। শিরোনাম তৈরি করল, নারীর ক্ষমতায়ন (Women Empowerment)। এ জন্য তারা নানা রকম পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করল। তাদের পদক্ষেপের ধাপগুলো ঠিক সিডাওয়ের মতোই রইল। শুধু সিডাওয়ের নামটি তারা আড়াল করে দিলো। অর্থাৎ তারা নীরব আন্দোলনের পন্থা ব্যবহার করতে শুরু করল। ক্রমাগত পতনের দিকে মুসলিম উম্মাহকে ধাবিত করতে লাগল। তারা ভাবতে শুরু করল, কীভাবে সুন্দর ভাষায় ও চমকপ্রদ স্লোগানে মুসলিম বিশ্বে আমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা যায়।

যাতে মুসলিমরা বুঝতেই না পারে যে, আমাদের লক্ষ্যটি তাদের ধর্ম ও চরিত্রের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

এ জন্য তারা ব্যবহার করতে শুরু করল, গল্পের দুষ্ট আত্মীয়কে। সে এসে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করবে। বলবে, রেম্বো! আসো!! আমাদের রক্ষা করো। আমাদের দেশে নারী নির্যাতিত। তার ডাক শুনে রেম্বো তার ডানায় চড়ে উড়ে আসবে। তার হাতে থাকবে সেই পানির গ্লাস। সে নির্যাতিতা মুসলিম নারীর সামনে পেশ করবে নিরাপত্তার পেয়ালা। আর দুষ্ট আত্মীয় প্রতি চার বছর পরপর জাতিসংঘের বৈঠকে অনুরোধ জানাবে, যাতে মুসলিম বিশ্বে দ্রুত সিডাও বাস্তবায়ন করা হয়। যদি জাতিসংঘ সিডাও পানে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম দেশের গতি দেখে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তখন তারা ধীরগতির দেশগুলোর কাছে জবাবদিহি চাইবে। তাদেরকে বলা হবে,

এখনো কি তোমরা বাস্তবে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য করো?

তোমাদের দেশে কি এখনো নারীর বিয়ে একজন অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল?

তোমরা কি এখনো নারীর স্বাধীনতাকে ব্যভিচার বলে আখ্যা দাও?

এর নাম হলো জবাবদিহি। যেন এগুলো হলো অপবাদ। যা থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রকে মুক্ত হতে হবে। জাতিসংঘ নারীর বিশ্বায়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা তৈরি করেছে। যার নাম ইউএন ওম্যান ওয়াচ। সংস্থাটির বিশেষ লক্ষ্য হলো মুসলিম নারী। যেন তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে, মুসলিম নারী তার খারাপ স্বামী ও পিতা থেকে মুক্তি পেতে রেম্বোর সহায়তা চাচ্ছে। লক্ষণীয় হলো, প্রতিটি মুসলিম দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে আঁচ করে এবং সমাজব্যবস্থা ও সমস্যাকে অনুমান করে দুষ্ট আত্মীয়ের সহায়তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হচ্ছে এই রেম্বোরা। যখন কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং অচেতনতার গভীরে তলিয়ে যায়, তখন রেম্বো স্পষ্টভাষায় সেখানে সিডাও বাস্তবায়নের স্লোগান তোলে। আর যদি কোনো রাষ্ট্রে কিছু মানুষ সজাগ থাকে, তবে রেম্বো দুষ্ট আত্মীয়কে ধীরে ধীরে তার জন্য পরিবেশ তৈরি করার নির্দেশ দেয়।

যেসব দেশ খুব দ্রুত রেম্বোর দিকে ছুটে যায় তার অধিকাংশের অবস্থা হলো, সেখানে সংস্কারকদের আওয়াজ দুষ্ট আত্মীয়ের চ্যাঁচামেচির নিচে চাপা পড়ে গেছে। আর সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা মানুষ ভুলে থাকার চেষ্টা করছে। রেম্বো ফিলিস্তিনের প্রতি তীব্র গুরুত্বারোপ করল। ফিলিস্তিনে জাতিসংঘ যাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন

করে থাকে তারা ২০১৪ সালে কোনো রকম লুকোচুরি ত্যাগ করেই ফিলিস্তিনে সিডাও বাস্তবায়নের দাবি করে বসল। ওদিকে পৃথিবীর একমাত্র যায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল পর্যন্ত সামাজিক, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বহু কারণে তাদের দেশে সিডাও বাস্তবায়ন করেনি—ঠিক যেমনটি আমেরিকা করেনি। ফিলিস্তিনকে যারা নারীর জন্য অসংরক্ষিত বলতে চায় এ সুযোগে তারা জেগে উঠল এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করল। এ কাণ্ড দেখে অন্য দেশের এজেন্ডাবাহীরাও কিছুটা সাহস পেল। তারা ধীরে ধীরে নিজেদের খোলস খুলে বাইরে বের হতে শুরু করল। তৈরি করতে লাগল বিভিন্ন এজেন্সি ও সংস্থা। এ রকম বহু সংস্থা ও এজেন্সি আপনি বিভিন্ন মুসলিম দেশে পেয়ে যাবেন। যারা আসলে নিজেদের পক্ষে পরিবেশ ও জনমত তৈরি হওয়া পর্যন্ত মুসলিমদের বিশ্বাসে আঘাত করতে চায় না।

গত বছর (২০১৮) ফিলিস্তিনের স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় কিছু সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে জাতিসংঘের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনে দ্রুত সিডাও বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে। সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের কিছু দাবির কথা বলা হয়েছে। চলুন দেখে আসি সেখানে কী রয়েছে।

* যিনার শাস্তি হিসেবে প্রণীত ২৮৪ নং দণ্ডবিধির ধারাকে বাতিল করতে হবে।

* গর্ভপাতকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা বন্ধ করতে হবে। যাতে নারীর যৌনস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

* সন্তান জন্মদানের সময় নারীকে তার পরিবারের পরিচয় উল্লেখ করাই যথেষ্ট হতে হবে। বৈবাহিক সম্পর্ক উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তাকে বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ বৈবাহিক প্রমাণ পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের ইচ্ছেমতো কোনো একটি পরিবারের পরিচয় দিলেই তা যথেষ্ট।

* পুরুষের সাথে সকল ক্ষেত্রে নারীর পারিবারিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

* বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স আঠারো নির্ধারণ করে দিতে হবে।

* উত্তরাধিকার সম্পত্তি, বিয়ে ও তালাকের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

* গণমাধ্যমে সিডাওয়ের ধারাগুলো প্রচার করতে হবে এবং এগুলোকে স্থানীয় আইন হিসেবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মোটকথা, সামগ্রিকভাবে হারামকে সহজকরণ ও হালালকে কঠিনকরণ এবং পরিবারব্যবস্থাকে বিলুপ্তকরণের স্পষ্ট রূপরেখা এটি। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিডাও বাস্তবায়নে ফিলিস্তিন কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার রিপোর্ট প্রতি দুই বছর অন্তর জাতিসংঘের সিডাও বাস্তবায়ন পরিষদের নিকট পাঠাতে হবে। অন্য দেশগুলোর মতো চার বছর অন্তর পাঠানো চলবে না।

ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর একটি সম্মিলিত সংস্থা Euromed Right প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে, ফিলিস্তিনে নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করার জন্য পুরুষ ও নারীকে বিবাহ-বর্হিভূতভাবে একসঙ্গে বসবাস করার সুযোগ করে দিতে হবে। যাকে তাদের ভাষায় বলা হয় লিভ টুগেদার। প্রতিবেদনটিতে আঠারোর কম বয়সে বিয়ের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর মাধ্যমেই নারী তার পরিবার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। বিস্ময়কর কথা হলো, প্রতিবেদনটিতে পতিতা বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দেয়ার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নারী যেন তার লিঙ্গগত সুবিধাকে সহজে ভোগ পারে তাই পতিতা বাণিজ্যকে বৈধতা দিয়ে সামাজিকভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অর্থাৎ তারা ফিলিস্তিনকে ঠিক জার্মানির মতো বানাতে চায়। ইকোনমিস্টের তথ্য অনুযায়ী জার্মানিতে চার লক্ষ নারী পতিতাবৃত্তির কাজ করে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এসব প্রতিবেদন ও আলোচনা তখনই আসছে যখন নারী প্রকৃতপক্ষেই সামাজিক কিংবা পারিবারিকভাবে অনাচারের শিকার হচ্ছে। এই অনাচারের সুযোগ নিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে চাইছে। তাদের এই পন্থাটিকে আপনি বলতে পারেন, সত্যের সাথে মিথ্যা সংমিশ্রণের পন্থা।

আমরা এখনো রেম্বোর হাতে থাকা গ্লাসটির বাস্তবতা তুলে ধরিনি। শুধু তার রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দার দিকটি আলোচনা করেছি। ফিলিস্তিনে নারী অধিকার সংরক্ষণকারী কিছু সংগঠন নারীর জন্য যেকোনো ধরনের কাজের বৈধতার জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করতে নেমেছে। ফিলিস্তিনের নারী অধিকার বিষয়ক মন্ত্রী রাবিয়া সাফির এ কাজটিকে বলছে, লিঙ্গগত বৈষম্য রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই মন্ত্রী বলছে, নারীর জন্য সকল কাজ বৈধ করতে গিয়ে যেসব কাজকে মানুষ অনৈতিকতা বলে ভাবে সেগুলোকে সরাসরি বৈধতা দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বৈধ কোনো কাজের লেভেল তার উপর লাগিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। এটাই হলো রেম্বোর পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়ার রহস্য। তার কর্মপন্থা হলো, চটকদার শিরোনামের আড়ালে নিজের কুৎসিত চেহারা লুকানো। এ জন্য তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো, 'নারীর ক্ষমতায়ন' এই শিরোনামটি। সে নারীকে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ জন্য সে তিনটি পরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও গবেষণালব্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সামাজিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে তারা বোঝায়, নারীকে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী হতে হবে। পরিবারের প্রতি নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। তাকে পুরুষের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় যেতে হবে। নিজের উপর যেকোনো পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি কোথাও তাদের এসব উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে বলার পরিবেশ না থাকে, তখন তারা নারীকে অন্যভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। নারীর সামনে স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে। যখন এই নারী তার পশ্চিমা বোনদের মতো স্বাধীন হয়ে যাবে—যে স্বাধীনতার নগ্নরূপ আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি—তখন তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজন হবে। কারণ, তাকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজেকে তার থেকে অমুখাপেক্ষী করতে হবে। যাতে পুরুষ তার কোনো বিষয়ে নাক গলাতে না পারে। তার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে না পারে। তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তার যৌনস্বাধীনতা, গর্ভপাতসহ কোনো বিষয়েই যেন পুরুষের কোনো কর্তৃত্ব না থাকে। এ জন্যই তাকে দ্বিতীয় ধাপটিতে পা দিতে হবে। আর তা হলো অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা।

এ জন্য তারা নারীকে ঋণ দিতে শুরু করল। যাতে তারা স্বাবলম্বিতার পথে আরেকধাপ অগ্রসর হতে পারে। তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে নিঃশর্ত কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিলো। শরয়ি বা সামাজিক কোনো আপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। তৃতীয় পদক্ষেপ হলো রাজনীতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন। যাতে নারী স্বাধীনতার এই চিন্তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা একটি সাধারণ চিন্তায় পরিণত হয়। তাদের মতে, প্রথম দুটি ধাপ হলো নারীর সুখের জন্য অবশ্যক। আর তৃতীয় ধাপটি হলো, অন্যসব নারীকে সচেতন করা ও তাদেরকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেয়ার লক্ষ্যে।

আপনি পুরুষ? কী সমস্যা আপনার? কেন আপনি নারীর ক্ষমতায়নের বিরোধিতা করেন? তার মানে আপনি নারীর শত্রু। নারীর প্রতিপক্ষ। নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারকে আপনি সমর্থন করেন। আপনি অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক ক্ষমতাবলে নারীকে পিষ্ট করতে চান। আপনার এসব চিন্তার কোনো ভিত্তি নেই। আমরা আপনাকে সে সুযোগ দিচ্ছি না। কোনোভাবেই আপনাদের চিন্তাকে মেনে নিচ্ছি না। আপনারা পুরুষেরা বহু অবিচার করেছেন আমাদের উপর।

কিন্তু যেসব নারীরা তাদের স্বামী, পিতা ও ভাইকে প্রতিপক্ষ বানাতে চায়, তাদের জন্য রেম্বোর হাতের পানির গ্লাসটি যথেষ্ট হয় না। নারীবাদীদের দেয়া অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের সুযোগ-সুবিধায় তার পোষায় না। এখন সে কী করবে? এ পরিস্থিতিতে দুষ্ট আত্মীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে সুদভিত্তিক কিছু ঋণ দেয়। এভাবে নারী এক খাঁচা থেকে বের হয়ে আরেক খাঁচায় বন্দী হয়। আর তাকে বলা হয়, তুমি তো পুরুষের সমান।

নারী যখন এই ঋণ শোধ করতে পারে না, তখন দুষ্ট আত্মীয়ের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে এসে তারা ব্যাপারটিকে ইসলামি পোশাকে মোড়াতে চায়। তখন তারা ইসলামকে টেনে আনে। বলে, এসে হে ইসলাম! ইতিপূর্বে যদিও সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আমরা তোমার কঠোর বিরোধিতা করেছি, তোমার প্রতি যারা আহ্বান করত তাদেরকে যদিও আমরা মানবতাবিরোধী ও নারীবিদ্বেষী ট্যাগ লাগিয়েছি—তুমি এসে এসব ঋণগ্রস্ত নারীর সমস্যা সমাধান করে দিয়ে যাও। মানুষকে তুমি বলে দাও, এসব নারীকে সুদসহ ঋণ থেকে মুক্ত করা যাকাত আদায়ের একটি ক্ষেত্র। তাই তুমি তোমার অনুসারীদের বলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা যেন দুষ্ট আত্মীয়কে যাকাতের অর্থ প্রদান করে। জেনে রাখার জন্য বলছি, মুসলিম বিশ্বের ছোট ছোট দেশে আপনি এমন অসংখ্য ঋণগ্রস্ত নারীর সন্ধান পেয়ে যাবেন। কিন্তু যাকাত গ্রহণের এই পন্থা খুব বেশি কাজে দেয় না। কারণ, মানুষ এখন দিনকে দিন দীন থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে যাকাত আদায় করা এবং ঋণগ্রস্তকে সহায়তা করার মতো মানসিকতা তাদের মাঝে কমে আসছে। কোনো উপায় না পেয়ে অবশেষে নারীকে বাধ্য করা হয়, সম্পদের জন্য যেকোনো পেশা ও যেকোনো কাজে নামতে। যেমনটি করা হয়েছিল পশ্চিমা নারীদেরকে। যার কিছু চিত্র আমরা গত পর্বে দেখে এসেছি।

এতক্ষণ আমরা রেম্বো, দুষ্ট আত্মীয় ও পানির গ্লাসের গল্প শুনলাম। আমরা এখনই তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে চাই না। বরং আরেকটু সুযোগ দিতে চাই এবং বলতে চাই, হে মাতাল প্রতিবেশী! হে তথাকথিত রেম্বো! মুসলিম নারীকে মুক্তির পথ দেখানোর আগে আমরা তোমাকে চারটি প্রশ্ন করতে চাই। যাতে আমরা বুঝতে পারি, নারীর মুক্তির জন্য তোমার কী কী করার সামর্থ্য রয়েছে।

❖ প্রথম প্রশ্ন : তোমরা কি তোমাদের নারীদেরকে মুক্ত করেছ? তোমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সেসব তরুণীদের মুক্ত করেছ, পড়ালেখার খরচ জোগাতে যারা নিজের দেহকে ভাড়ায় খাটাতে বাধ্য হয়? পথে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে যেসব নারী প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হচ্ছে, তাদের মুক্তিতে তোমরা কী ভূমিকা রেখেছ?

তোমরা কি তোমাদের নারীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস ও হাসপাতালসহ সব জায়গায় যৌনহেনস্থার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছ? সামাজিক নিরাপত্তাভাতা না পেয়ে যেসব পশ্চিমা নারীরা বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তি করছে, তোমরা কি তাদেরকে মুক্ত করেছ? অফিসের সহকর্মীদের চাপে তোমাদের দেশের যেসকল নারীকে বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরতে হচ্ছে, তোমরা কি তাদেরকে মুক্ত করেছ? বয়ফ্রেন্ড ও সঙ্গীর হাতে চরম মার খেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তোমাদের দেশের যত নারীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তোমরা কি তাদের মুক্ত করেছ? অনবরত হেনস্থার শিকার হতে থাকা তোমাদের দেশের প্রতি চারজনের একজন নারীকে কি তোমরা মুক্ত করেছ? এসব তথ্য তো তোমাদের সংস্থাগুলোই আমাদেরকে দিয়েছে। পরিবারহীন ও অভিভাবকহীন শিশুদেরকে কি তোমরা মুক্ত করেছ? যাদের সংখ্যা তোমাদের দেশে প্রতিবছর কয়েক মিলিয়নে পৌঁছে? যৌনব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়া নারীদেরকে কি তোমরা মুক্ত করেছ? জীবন্ত ভ্রূণ হত্যা ও বাক্সে ভরে শিশুকে ফেলে রাখার প্রথা কি তোমরা বন্ধ করতে পেরেছ? তোমাদের এই নারী স্বাধীনতার পদক্ষেপের ক্ষেত্রে তোমাদের দেশের নারীরাই কি অগ্রাধিকার রাখে না? তোমাদের সহায়তা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের পালাই কি আগে আসে না? এই হলো তোমাদের অবস্থা। যা আমরা তোমাদের তৈরি পরিসংখ্যান অনুযায়ী তুলে ধরলাম। এটাই কি তোমাদের সফলতার দৃষ্টান্ত? এই চিত্রই কি তোমরা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাও? আমরা কোনো কল্পনা বা ধারণা অনুসারে কথা বলছি না। আমরা কথা বলছি বিশ্বের সামনে উপস্থিত প্রমাণিত ও দৃশ্যমান চরম বাস্তবতার ভিত্তিতে। এই হলো তোমার প্রতি আমাদের প্রশ্ন হে রেম্বো মহোদয়! এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো সৎসাহস কি তোমাদের আছে?

❖ দ্বিতীয় প্রশ্ন : মুসলিম নারীর প্রতি যদি তোমাদের এতই দরদ হয় যে, তোমরা তাদের মুক্ত করতে আমাদের দেশে চলে এসেছ। তাহলে তো তোমাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। দাঁড়াও, কৃতজ্ঞতা আদায় করার আগে তোমাদের উদ্দেশ্যটা একটু যাচাই করে নিই। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিদান দিন। কিন্তু আমাদের দেশের মুসলিম নারীদের মুক্ত করার আগে আমরা তোমাকে অন্য কয়েকটি দেশের মুসলিম নারীর নিকট নিয়ে যেতে চাই। আসলে তাদেরই তোমাকে বেশি প্রয়োজন ছিল। তোমরা তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করো। যদি কোনো দিন সফল হও, তবে আমাদের দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে সেসব মুসলিম নারীর সন্ধান দিতে চাই, বিমানের হামলার ফলে বাড়ির ছাদ যাদের মাথায় ভেঙে পড়ছে। এসব নারীর তথ্য অনুসন্ধান করতে তোমাদেরকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। চেচনিয়া, বসনিয়া, স্লোভাকিয়ার নারীদের কথা না হয় আমরা না-ই বললাম।

জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় হায়নারা যাদেরকে তুলে নিয়ে গেছে। যেসব ঘটনা বহু বছর আগে ঘটে গেছে সেগুলো না হয় আমরা বাদই দিলাম। আমরা তোমাদেরকে অনর্থক বিব্রত করতে চাই না। তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই মুসলিম নারীকে মুক্ত করতে এসে থাকো, তবে তুর্কিস্তানে উইঘুরের বাসিন্দা লক্ষ লক্ষ নারীকে তোমরা মুক্ত করো। চীনা পুলিশ তাদের কাছ থেকে তাদের সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুদেরকে এতিমদের মতো লালনপালন করছে। তাদেরকে কুফর শিখাচ্ছে। আর মায়েদের ঠাঁই হচ্ছে জেলখানায়। এসো, তুমি এসব নারীর প্রয়োজন পূরণ করো হে রেম্বো! এসো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের মুসলিম উইঘুর বোনদের অবস্থা শোনাই। আমাদের বোন রুকাইয়া ফারহাত, যিনি বহু অর্থ খরচ করে চীনাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। এসো আমরা তার বক্তব্য শুনি।

তিনি তার বন্দীজীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন হাফিজা। তার কাছে অনেক মেয়ে কুরআন হিফজ করত। একরাতে তাকে এবং তার সকল ছাত্রীকে চীনা সেনারা তুলে নিয়ে যায়। সেনারা তাদের উপর প্রশিক্ষিত কুকুর লেলিয়ে দেয়। তাদের নখগুলো তুলে ফেলা হয়। হাতে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে পেরেক মেরে দেয়া হয়। যারা এটুকু সহ্য করতে না পেরে মরে যায়, তাদেরকে ময়লায় ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়। এসব কিছু কী জন্য? কারণ তারা বলত, আমাদের রব আল্লাহ।

নাকি তোমাদের তথাকথিত স্বাধীনতা ইসলামের জন্য নয় হে রেম্বো? ইন্ডিপেনডেন্ট নিউজ তথ্য প্রকাশ করেছে যে, চীনে মুসলিম নারীদের স্বামীদেরকে বন্দী করে ফেলা হয় এবং নারীদেরকে তাদের বাড়িতে সৈন্য দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর একজন সৈন্যের সাথে তাদেরকে রাত কাটাতে বাধ্য করা হয়। চীনা মুসলিম নারীদের নির্যাতনের এই চিত্র বহু পুরোনো। কিন্তু বর্তমান সময়ে তা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। আল জাজিরা বলছে, উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতন শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তুমি হয়তো বলবে, চীন অনেক বড় রাষ্ট্র। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের রেম্বোগিরি চলবে না। তাহলে ছোট একটি রাষ্ট্রেই আসো। চলে আসো মিয়ানমারে। এখানে মুসলিম নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। সন্তানকে জবাই করে মায়ের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। দুঃখিত যে, তার চিত্র আমরা তোমাকে দেখাতে পারছি না। কারণ, ইউটিউব এসব ভিডিও হাইড করে দিয়েছে। তুমি চাইলে আমাদের মিয়ানমারের বোন হাসিনার মুখের দিকে তাকাতে পারো। তার চোখের সামনে ৫০ জনেরও বেশি মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। আর সে নিজে কী পরিমাণ নির্যাতনের শিকার হয়েছে তা তার চোখ দেখলেই অনুমান করতে পারবে। তুমি চাইলে সংবাদ সংস্থা এপির পাতায় এমন আরও বহু মুসলিম নারীর চোখ দেখে নিতে পারো।

প্রিয় রেম্বো! তুমি চাইলে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত মুসলিমদের চিত্র দেখতে পারো। দেখতে পারো, কীভাবে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী দেশছাড়া হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে এবং মৃত্যুতাঁবুতে অবস্থান করছে। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা হে রেম্বো! তুমি সুদানে তোমার প্রভাব বিস্তার করেছ এবং সিডাও বাস্তবায়ন করেছ। যেহেতু সুদান তুমি চলে গিয়েছ, চাইলে তারই পাশে মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোও ঘুরে আসতে পারো। সেখানে শত শত মুসলিম নারী ও পুরুষকে জাতিসংঘের উপস্থিতিতে ফ্রান্সের সমর্থিত বাহিনী ছুরি দিয়ে জবাই করে দিচ্ছে। তুমি চাইলে এসব মুসলিম নারীর পাশে দাঁড়াতে পারো।

থামো, আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি। তুমি যদি কখনো এসব মুসলিম নারীকে মুক্ত করতে পারো, তাহলে আমাদের দেশ নিয়ে ভেবো। তুমি বলতে চাও, 'নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকারের বৈষম্য বন্ধ করতে হবে'। কিন্তু স্বয়ং নারীকেই যখন হত্যা করা হচ্ছে তখন তুমি মুখ বুজে আছো। অথচ তুমি চাইলে এসব মুসলিম নারীর হত্যা, অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারো। তুমি চাইলেই এসব বন্ধ করে দিতে পারো। কিন্তু এসবে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। তুমি চাও মুসলিম নারীর ব্যভিচার, গর্ভপাত আর লিভ টুগেদারের স্বাধীনতা। তুমি চাও মুসলিম নারীকে তার আপনজনের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে। শত ধিক তোমার তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকে।

❖ তৃতীয় প্রশ্ন : কীভাবে তোমরা নারীর সমস্যার সমাধান করবে? অথচ তোমরা নিজেরাই সমস্যার একটি অংশ। কারণ, তোমরা মুসলিম নারীর সামনে যে পানির গ্লাসটি পেশ করছে এটা তো সেই গ্লাস যা তোমরা দুষ্ট আত্মীয়ের সহায়তায় তাদের ঘর থেকেই চুরি করেছ। তোমার সমর্থিত এই দুষ্ট আত্মীয়ের কারণেই তো মুসলিম নারীরা শিক্ষা ও দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তারা অত্যাচারিত হচ্ছে এবং পুরুষের উপরও অত্যাচার করছে। তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা নৈতিক স্খলনের শিকার হচ্ছে। দুষ্ট আত্মীয় নানা রকম প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে মুসলিম সমাজকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে অন্যায় ও অবিচার হয়ে গেছে মুসলিম সমাজের নিত্যদিনের চিত্র। তুমি যদি সত্যিকার অর্থেই মুসলিম নারীর মুক্তি চাও, তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে দয়া করে তোমার হাত গুটিয়ে নাও।

❖ চতুর্থ প্রশ্ন : নারীর স্বাধীনতাকে সাব্যস্ত করতে তোমরা যে স্কেলটি ব্যবহার করতে চাও সেটা তোমরা কোত্থেকে পেয়েছ? কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে তোমরা আমাদের সমাজে নারীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চাও? আমরা মুসলিম নারী ও পুরুষ। আমাদের

একটি নৈতিক মানদণ্ড আছে। আমরা তাকে মেনে চলার চেষ্টা করি। একটি মূল্যবোধ দ্বারা আমাদের জীবন পরিচালিত হয়। আমাদের মানদণ্ড ও স্কেল হলো আমাদের রবের আনুগত্য। আমরা সত্য ও ইনসাফকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে আমাদের রবের পক্ষ থেকে মনোনীত প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট। আমাদের সকল কিছুর মানদণ্ড হলো আমাদের রবের সন্তুষ্টি। তাঁরই নিকট আমাদের শেষ ঠিকানা হবে। এই চিন্তাই আমাদের নারী ও পুরুষ উভয়কে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্ক হলো পরস্পর সহায়তা, সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতামূলক। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয়। প্রতিযোগিতা ও প্রতিপক্ষতামূলক নয়। এই পরিস্থিতিতে একজন নারী ইচ্ছে করলে তার বাড়িতে কাজ করতে পারে। ইচ্ছে করলে ডাক্তার বা গবেষক হতে পারে। ইচ্ছে করলে সে কষ্টসাধ্য কাজও করতে পারে। কিন্তু সকল কিছুর উপরই তার কাছে অগ্রাধিকার পায় আপন রবের আনুগত্য, সত্য ও ইনসাফ। তার জীবনের সম্মানের উৎস হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেই মানদণ্ড।

কিন্তু তোমাদের কাছে কী আছে হে রেস্বোর দল? আল্লাহর ওয়াহি থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর তোমরা আর কখনোই ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারোনি। বরং সমতা ও স্বাধীনতাকে ঢাল বানিয়ে তোমরা যা কিছু করেছ তা তোমাদের ব্যর্থতার তালিকাকে আরও দীর্ঘ করেছে। যা ইতিপূর্বে আমরা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি। তোমরা এখন আমাদের সামনে যা কিছু পেশ করতে চাও তার সবকিছু তোমরা নিজেদের মাঝে প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়েছ। তোমরা কি চাও যে, মুসলিম নারী পশ্চিমা নারীর মতো পরিণতি ভোগ করুক? তোমরা কি মুসলিম নারীকেও বিবস্ত্র করতে চাও? তাকেও তোমাদের ভোগের পণ্য বানাতে চাও? তাকেও তোমাদের হাতের পুতুল বানাতে চাও? পশ্চিমা নারীর মতো তোমরা কি তাকেও অপদস্থ করতে চাও?

আমরা যদিও তোমাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করি না কেন, তোমরা কীভাবে মুসলিম নারীকে মুক্ত করবে? তোমরা তো তাকে তুচ্ছ মনে করো। তোমরা তো তার সম্মান ও নৈতিকতার সবগুলো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করো। আমাদের ইসলামে নারী তার ঈমান, তাকওয়া, সচ্চরিত্র ও আগামী প্রজন্মকে প্রতিপালন করার কারণে সম্মানিত। তোমরা তো এগুলোর সবকিছুকেই ছোট মনে করো। বরং তোমরা এসব কিছুর সাথে শত্রুতা পোষণ করো। তোমরা তো ঈমান, তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের সাথে শত্রুতা পোষণ করো। তোমরা তাদেরকে কীভাবে মুক্ত করবে, যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা পোষণ করো এবং তুচ্ছ মনে করো?

আমাদের দীনে নারীকে তার রব বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

'হে মানবসম্প্রদায়, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী করে। আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে পরিচয় দিতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সে অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ।'[১৬]

অথচ তোমাদের কাছে তাকওয়ার কোনো মূল্যই নেই হে রেম্বোর দল! একজন তাকওয়াবান নারী তোমাদের কাছে মূল্যহীন।

আমাদের দীনে নারীকে এমন কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়, তোমাদের কাছে যার কোনো মূল্যই নেই। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনার এই আয়াতটি পাঠ করুন। তারপর বিবেচনা করুন জাতিসংঘ, সিডাও, ফেমিনিজম, নারী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এরা আসলে কী চায় :

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীরা, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীরা, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীরা, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারীরা, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারীরা, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীরা, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারিণী নারীরা, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারিণী নারীরা এবং অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও অধিক জিকিরকারিণী নারীরা—আল্লাহ তাদের সকলের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।'[১৭]

---

১৬. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩
১৭. সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫

এ সবকিছুই রেম্বোদের কাছে মূল্যহীন। মুসলিম নারী, মুমিন নারী, অনুগত নারী, সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীলা নারী, বিনয়ী নারী, দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারিণী নারী, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারিণী নারী, অধিক জিকিরকারিণী নারী—কারোরই কোনো মূল্য নেই রেম্বোদের কাছে। এসব গুণে গুণান্বিত নারী রেম্বোদের কাছে কোনো কাজেই আসবে না। বরং তাদের লক্ষ্য এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত। রেম্বোরা চায়, নারী তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ না করুক—যার বাস্তবতা আমরা পূর্বেই দেখে এসেছি। তাহলে রেম্বোদের কাছে নারীর কী কী বিষয় মূল্যায়নযোগ্য? বাস্তবতা অনুসারে নারীর শারীরিক কাঠামোই তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়নযোগ্য। যেমনটি আমরা আগেই বলে এসেছি। আর বাইরে যদি কিছু মূল্যায়নযোগ্য হয়ে থাকে তবে তা হলো নারীর বস্তুগত উন্নতি। তার কর্মসংস্থানের পারফর্মেন্স। পুরুষের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ জন্যই রেম্বোর দল দুষ্ট আত্মীয়দের দিয়ে বলাচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের যেসব নারী সংসার দেখাশোনা ও সন্তান প্রতিপালনে ব্যস্ত, তারা বেকার। এসব নারীকে তারা তাদের পরিসংখ্যানে বেকার হিসেবে উল্লেখ করে। বাড়িতে নারীর অবস্থানকে তারা পশ্চাৎপদ চিন্তা হিসেবে সাব্যস্ত করে। এ জন্যই তারা পেশাজীবী নারীর সফলতাকে ফোকাস করে বেড়ায়।

তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম থাকে—প্রথম নারী ড্রাইভার, প্রথম নারী পাইলট, প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, প্রথম নারী মেকানিক, প্রথম নারী প্রকৌশলী, প্রথম নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি। যে ধরনের কাজই হোক না কেন—চাই তা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা না হোক—এসবকে তারা গুরুত্বের সাথে প্রচার করে বেড়ায়। আর যে নারী ঘরের ভেতর তার সন্তানকে প্রতিপালন করে, তাকে শিক্ষা দেয়, তার চিন্তা ও বিশ্বাসকে গঠন করে, তাকে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শেখায়, স্বামীর জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে, পরিবারের সকল সদস্যের জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে—এই নারী তাদের কাছে বেকার। এই হলো তাদের বিবেচনাবোধ। যে নারী ঈমান, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে কাজ করে তার কোনো মূল্য নেই তাদের দৃষ্টিতে। কারণ ঈমান, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তাদের শত্রু। তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বড় বাধা। আর যেসকল মুমিন নারীরা তাদের নৈতিকতা ও আদর্শের মানদণ্ড বজায় রেখে ডাক্তার, শিক্ষিকা বা গবেষক হিসেবে কাজ করে—তুলনামূলক তাদেরও কোনো মূল্য নেই রেম্বোদের কাছে। কিন্তু সে যদি ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু করে, তাহলে সেটাই হয়ে যায় রেম্বো ও দুষ্ট আত্মীয়দের কাছে সাহসিকতা। বরং কিছুদিন যাবৎ তো তারা সরাসরি নারীর নেকাবকে নিষিদ্ধ করার কাজে নেমেছে। নেকাব পরার কারণে তারা বহু নারীকে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করেছে।

নারী যদি তাদের কথামতো কর্মক্ষেত্রে নামে, তাদের নির্দেশনা মেনে ইসলাম, শরিয়াহ, চরিত্র ও নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ করে (যেমন : যদি সে কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে) তারা প্রশ্ন করে, নারী কি এটা তার নিজের ইচ্ছেয় করেছে? যদি বলা হয়, হ্যাঁ। তাহলে তারা বলে, এতে কোনো সমস্যা দেখছি না। কারণ, সে স্বাধীন। সে পুরুষের সমান। আল্লাহর বিধান, হারাম, শরিয়াহ এগুলোর কোনো পরোয়া আমরা করি না। এ জন্য আপনি রেম্বোদের নারীঋণ তালিকায় 'বিবাহ সহজকরণ' শিরোনামে কোনো কিছু খুঁজে পাবেন না। তাদের কোথাও আপনি এই শিরোনাম খুঁজে পাবেন না, 'নারীর চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সন্তান লালনপালনের প্রশিক্ষণ'। তাদের কাছে এগুলো নারীর কোনো কাজই নয়। তাহলে তার কাজ কী? তার কাজ হলো সেই পরিবেশে প্রবেশ করা যাকে রেম্বোরা নষ্ট করে ফেলেছে। নিজের সংসার ও পরিবার সাজানোর জন্য নারীকে তারা কোনো ঋণ দেয় না। নারীর জন্য অনুকূল পরিবেশ কিংবা পুরুষের থেকে আলাদা কর্মক্ষেত্র তৈরির ক্ষেত্রেও তাদের কোনো পদক্ষেপ নেই। বরং কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর আলাদা ব্যবস্থাপনাকে তারা লিঙ্গবৈষম্যের একটি প্রকার হিসেবে বিবেচনা করে। যদি মুসলিম নারী তাদের তৈরি কর্মক্ষেত্রে গিয়ে যৌনহেনস্থা বা সহিংসতার শিকার হয়, তবে তাদের পক্ষ থেকে কী উত্তর দেয়া হবে? তারা বলে, এটা কোনো সমস্যাই নয়। আমাদের দেশের নারীরা অনবরত এগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে নারীর অগ্রযাত্রা থেমে যেতে পারে না। এসব কিছুকে পরোয়া করে নারী থেমে যেতে পারে না। এই হলো নারীকে কর্মক্ষেত্রে নামানোর পর রেম্বোদের অবস্থান।

কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে নারী যদি গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তাহলে কী সমাধান? রেম্বোরা বলবে, গর্ভপাত করে ফেলো। প্রথম সন্তানকে গর্ভপাত করা হলো। এবার দ্বিতীয় সন্তান? তাকে বাক্সে ভরে পথের ধারে ফেলে রেখে আসো। তারপর যদি আবারও সন্তান হয়? কিসের চিন্তা? আমাদের বানানো শিশু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ফেলে এসো। এই হলো নারীর মুক্তি হে রেম্বোর দল! থামো। বরং আমরাই নারীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে তোমাদের থেকে অধিক যোগ্যতা রাখি। এসো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের পরিচয় শুনিয়ে দিই :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

'তোমরা ছিলে মানবকল্যাণে সৃষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমরা সৎকাজের আদেশ করতে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে; আর তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতে। যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনে তবে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। তাদের মাঝে কেউ আছে বিশ্বাসী। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।'[১৮]

আমরা তোমাদেরকে আরও শুনিয়ে দিচ্ছি :

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ﴾

'যদি আল্লাহ মানুষের কতিপয়কে কতিপয় দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবী বিশৃঙ্খল হয়ে যেত।'[১৯]

আমরা দেখেছি, আমাদের পতনে পৃথিবী কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জগতের সকল নারীকে মুক্ত করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা আমাদের রবের আয়াত পাঠ করি :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

'আর আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি জগৎসমূহের উপর রহমতস্বরূপ।'[২০]

যদি আমরা পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে কোনো দিন সত্যিকারের পবিত্র ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সেদিন আমরা পশ্চিমা নারীকে আমাদের ভূখণ্ডে একবার ঘুরে যাওয়ার আহ্বান করব। তারপর দেখব, তোমরা কীভাবে তাদের তোমাদের ঘরে আটকে রাখো। আমরা সেদিন জানিয়ে দেবো, পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডের যেকোনো নারী যদি পশ্চিমাদের নোংরামি ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়—তার জন্য ইসলামি সমাজের দ্বার উন্মুক্ত। বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা ইনশাআল্লাহ সে দায়িত্ব থেকে পিছপা হব না।

আমেরিকায় প্রবাসীদের ইসলাম প্রচার বিষয়ক একটি সংগঠনে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি এখনো সেই স্মৃতি মনে করে সুখবোধ করি। এক বোন হিস্টন ইউনিভার্সিটিতে ইসলাম বিষয়ে আমার একটি লেকচার শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

---

১৮. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০
১৯. সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫১
২০. সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৭

রেম্বোর দল, তোমরা মুসলিম নারীকে মুক্ত করত চাও? আল্লাহর কসম! তোমাদের তেমন কোনো উদ্দেশ্যই নেই। বরং আমাদের দুর্বলতা আর পরস্পর বিবাদের সুযোগে তোমরা এসেছ আমাদের উপর বিচারক সেজে। যেন বানরের হাতে রুটি ভাগ করার তামাশা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তাই আসুন আমরা আমাদের রবের এই আয়াতকে আঁকড়ে ধরি :

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

'তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হোয়ো না। স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে সমন্বয় করে দিলেন। ফলে তোমরা তাঁর নিয়ামতে হয়ে গেলে পরস্পর ভাই। আর তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের কোণে। তখন আল্লাহ তোমাদেরকে মুক্ত করলেন জাহান্নাম থেকে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন তাঁর নিদর্শনসমূহ। যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও। তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর তারাই হলো সফলকাম।'[২১]

তারা আমাদেরকে মিথ্যার দিকে বহু দিন আহ্বান করেছে। এখন আমরা তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করব। আল্লাহ আমাদেরকে সে দায়িত্বই দিলেন :

'তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর তারাই হলো সফলকাম।'[২২]

এসব রেম্বোরা আমাদের মাঝে এসেছে ফয়সালা করার জন্য। এটা সত্যিই আমাদের জন্য লজ্জাজনক। তাই আসুন আমরা আমাদের সঠিক পথে ফিরে যাই। পরস্পরের প্রতি

---

২১. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৩-১০৪
২২. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৪

অবিচার বন্ধ করি। নারী ও পুরুষ সকলে একে অপরের সহযোগী হয়ে যাই। কারণ, আমরা পরস্পরের প্রতি অবিচার করলে রেম্বোর দল আমাদের মাঝে ফয়সালা করতে আসার সুযোগ পায়।

আবারও শুরুতে ফিরে যেতে চাই। প্রথম পর্বের শুরুর দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই। জাতিসংঘ যে সিডাও প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার সর্বপ্রথম ঠিকানা হয়েছে সেই ভূমিতে যা তারা ক্রয় করে নিয়েছে। এলাকাটির নাম নেলসন রকফেলার। এই ভূমিটি তারা পুঁজিবাদী রকফেলার পরিবার থেকে ক্রয় করেছে। এই পরিবারটি আমেরিকার রাজনীতিতে বেশ প্রভাবশালী। আলোচনার একেবারে শেষে এসে আমরা রেম্বোদের বলছি, ভালোয় ভালোই আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। আমাদের সমস্যা আমরাই সমাধান করব। আমাদের কাছে আমাদের রবের কিতাব আছে। আমাদের নবীর ফরমান আছে। তোমাদের ব্যর্থ থিউরি আর স্বার্থান্বেষী মতবাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের।

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

'তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম বিধানদাতা?'[২৩]

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

'আল্লাহ তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে চান এবং তোমাদেরকে তাদের আদর্শে পথপ্রদর্শন করতে চান, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা অনেক বিচ্যুত হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে হালকা করতে চান। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে।'[২৪]

---

২৩. সূরা মায়েদা, ৫ : ৫০
২৪. সূরা নিসা, ৪ : ২৬-২৮

উম্মুল মুমিনের সমীপে

নাদা। একজন মার্কিন নারী। আমেরিকান স্কুলে সে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করেছে। তারপর স্থানীয় একটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে। তার স্বামীর নাম শাদী। সে নাদার দুই বছর আগে একই বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার একটি মেডিকেল কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছে। নাদার সাথে যখন তার বিয়ে হয় তখন নাদার বয়স ২৬ বছর। বিয়ের পর কিছুদিন তাদের সংসারজীবন খুব সুন্দর কাটে। তারপর শুরু হয় কলহ আর দিনকে দিন তা চরম আকার ধারণ করতে থাকে। জীবনের বসন্তকাল খুব অল্প দিনেই কেটে যায়। তারপর আগমন করে সুদীর্ঘ শীত।

একদিন নাদা কাজ থেকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরল। শাদী এখনো বাড়িতে ফেরেনি। নাদা স্টাডিরুমে গিয়ে একটি ডায়েরি ও কলম হাতে নিল এবং লিখতে শুরু করল। তার লেখার শিরোনাম : শাদীর সাথে আমার কী কী সমস্যা চলছে?

১. শাদী নীরস। এখন সে আর আমার প্রতি তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে না। বরং দিনদিন আমি সংশয়ে পড়ে যাচ্ছি যে, সে আমাকে আসলেই ভালোবাসে কি না। একবার আমি অসুস্থ হলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি বিশেষ কোনো যত্ন বা গুরুত্ব দেখাল না। যখন আমি আমার নারীসুলভ অসুস্থতার দিনগুলো অতিবাহিত করি তখন আমার খুব অস্বস্তিতে দিন কাটে। তবুও শাদী আমার প্রতি বিশেষ কোনো যত্ন নেয় না। অথচ সে একজন মানসিক ডাক্তার। সে আমার মানসিক অবস্থা খুব ভালোভাবেই বোঝে। কখনো কখনো সে আমার নারীসুলভ স্বভাবগুলোকে তাচ্ছিল্য করে এবং আমাকে অপমান করতে চায়। আমার কোনো শখকে সে গুরুত্ব দেয় না। আমার দুই হাজার ডলার মূল্যের একটি চুড়ি ভেঙে গেছে। চুড়িটি আমার মা আমাকে গিফট করেছিলেন। আমি শাদীকে অনেকবার বলেছি চুড়িটি ঠিক করে দিতে। কয়েক মাস যাবৎ আমি এভাবে বলে যাচ্ছি। যখনই আমি বলছি তখনই সে আজ না কাল—এসব বলে এড়িয়ে যাচ্ছে।

২. সে একজন স্বার্থপর। সব সময় নিজেকে সে আমার উপর প্রাধান্য দিতে পছন্দ করে। কখনো কখনো দেখা যায় আমি ও শাদী একসাথে কাজ থেকে ফিরেছি, কিন্তু বাড়িতে কোনো খাবার নেই। এমন সময় তার এক বন্ধু তাকে ফোন করে খাবারের অফার করল, আর সে খেতে বেরিয়ে গেল। আমি কী খাব, একবার তা জিজ্ঞেসও করল না।

৩. শাদী আমার সাথে যে সময়টুকু কাটায় সেটা কোয়ালিটি টাইম নয়। পুরোটা সময় সে অন্যকিছু ভাবতে থাকে। দেখা যায়, আমরা শারীরিকভাবে একে অপরের কাছাকাছি; কিন্তু মানসিকভাবে অনেক দূরে। অফিসের সমস্যাগুলো সে ঘরের ভেতর নিয়ে আসে। তাই আমি তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে পারি না।

৪. সে তার আনন্দগুলো আমার সাথে ভাগাভাগি করে না। যখন আমি নিজ থেকে তার সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাই তখন সে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং সংক্ষেপে বলতে অনুরোধ করে। 'তুমি বেশি বেশি প্রশ্ন করো' এ কথা বলে আমাকে চুপ করিয়ে দেয়।

৫. দিনদিন আমার প্রতি তার বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হলো, সে আমার চেয়ে বেশি তার অফিসের নারী সহকর্মীদেরকে সময় দিচ্ছে। তাদের সাথে সানন্দে সময় কাটাচ্ছে। কোথাও কোনো কাজে যদি আমি দুই মিনিট দেরি করে ফেলি আর সে আমার জন্য বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, তাহলে সে খুব চটে যায়। অথচ তার এক নারী সহকর্মী একবার প্রায় পনেরো মিনিট বিলম্ব করল। আমি আর শাদী গাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে এসে যখন সরি বলল শাদী বলল, না, না, কোনো সমস্যা নেই। একবার আমি তার মোবাইল নিয়ে দুষ্টুমি করে তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে 'গুড মর্নিং' লিখে একটি ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলাম। বিষয়টি জানতে পেরে সে কয়েকদিন আমার সাথে কথা বলেনি এবং মোবাইলে পাসওয়ার্ড দিয়ে রেখেছে।

৬. আমি অনুভব করছি, তার সাথে থাকতে থাকতে আমার ব্যক্তিত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার সাথে থাকা অবস্থায় আমি নিজেকে দুর্বল ও অন্যদের চেয়ে অমূল্যায়িত অনুভব করছি। সে উল্টো আমার উপর অভিযোগ তুলছে যে, আমি ইচ্ছে করে আমার অফিসের সহকর্মীদের সাথে কথা বলি এবং তাদের কাছ থেকে সহমর্মিতা পাওয়ার চেষ্টা করি। যখন আমার কোনো ব্যস্ততা থাকে তখন সে আমাকে বাড়ির কাজে কোনো সহায়তা করে না। অথচ সে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'নারী অধিকার ও নারী নির্যাতন' বিষয়ে লেখালেখি করে। বাথরুমে গিয়ে কোনো কিছু ব্যবহার করলে তা সেভাবেই ফেলে রেখে আসে। নিজের ব্যবহারের জিনিসগুলো এদিকে-সেদিকে ফেলে রাখে। আর চায়, আমি তার সবকিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখি। কেন? সে তো নারী ও পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে।

৭. ইদানীং সে সিগারেট ধরেছে। তার সিগারেটের গন্ধে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু আমার সুবিধা-অসুবিধায় তার কোনো পরোয়া নেই। সে অন্যদের সাথে যেমন আচরণ করে আমার সাথে তেমন আচরণ কেন করে না। তাই এখন সে বাসায় না থাকলেই আমার ভালো লাগে। শাদীর বাজে স্বভাব হলো, সে বাইরের মানুষের কাছে অনেক ভালো

থাকার চেষ্টা করে। অথচ আমার কাছে ভালো থাকার জন্য তার কোনো চেষ্টাই নেই। সে আমাকে বোঝায়, সে বাধ্য হয়ে এগুলো করে। জীবনের প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়। কাজের প্রয়োজনে তাকে আরও অনেক কিছু করতে হতে পারে। তা ছাড়া সে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তাই তাকে মানুষের সাথে খুব ভালো আচরণ করা উচিত।

৮. এ ছাড়াও তার ব্যক্তিগত একটি দোষ আছে। যার কথা লিখতে আমার লজ্জা হয়। যা প্রকাশিত হয়ে গেলে শাদীর জন্য অনেক লজ্জার কারণ হবে। তার এসব আচরণের কারণে আমার এখন তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, আমি অনেক খারাপ একটি কাজ করেছি। উচিত ছিল সে তার দুর্বলতার কথা আমার কাছে স্বীকার করবে। কিন্তু সে তার পরিবর্তে আমার উপর দায় চাপিয়ে দিতে চায়। এখন আর তাকে নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগে না। আমি এখন চেষ্টা করি সবকিছুতেই তার বিরোধিতা করতে। কোনো ব্যাপারে তার সাথে মিল করতে আমার ভালো লাগে না। আমার আত্মা তার সাথে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। অথচ আমি একজন মানসিক ডাক্তার। আমি তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের সংসারে যা কিছু কেনা হয়েছে তার কোনোটিই সে আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আমি আমার কয়েকজন বান্ধবীর সাথে খোলামেলা কথা বলেছি। মনে হয়েছে, আমি তাদের কাছে কোনো সমাধান পেয়ে যাব। কিন্তু আমার কথা শুনে তারা যা বলল তাতে আমি আরও বেশি হতাশ হলাম। তাদের অবস্থাও আমার মতোই। কারও কারও অবস্থায় হয়তো কিছু তারতম্য রয়েছে; কিন্তু সবার পরিণতি একই।

অনেকদিন আগে আমি এক তরুণীর কথা শুনেছিলাম। তার নাম আয়েশা। তার সাথে তার স্বামী আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের গল্প কিছুটা শুনেছিলাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার সেই গল্পটি আমাদের এখানের সব গল্প থেকে ভিন্ন। আমার আয়েশার কথা মনে পড়ল। আমি সিরাতের পাতা উল্টাতে লাগলাম। আমি যেন তাকে আমার সামনে দেখতে পেলাম। তার সামনে আমি নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। আমার সাথে আমার স্বামীর যা কিছু ঘটছে তা প্রকাশ করতে আমার লজ্জা লাগল। কিন্তু আমি আমার সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী তাকে প্রশ্ন করতে চাই। তার সাথে আমি নিজেকে তুলনা করে মেলাতে চাই।

(এখান থেকে নাদা ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কল্পিত কথোপকথন শুরু হচ্ছে। এই কথোপকথনে আমরা আমাদের মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো তুলে ধরব। আর গল্পের প্রয়োজনে কিছু কিছু বিষয় সংযোজন করব। কিন্তু

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মাঝে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করব না। হাদিসকে তার হুবহু শব্দে রাখার চেষ্টা করব। আলোচনায় উল্লেখিত সকল হাদিস সহিহ। কোনো দঈফ হাদিস এখানে উল্লেখ করা হবে না। যাতে কেউ এ কথা বলার সুযোগ না পায়, আমরা সিরাতের নামে অন্যকিছু চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি।)

নাদা আয়েশাকে প্রশ্ন করল, আপনি কি আয়েশা? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী?

: হ্যাঁ।

: আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। উত্তর দেয়ার সুযোগ হবে?

: হ্যাঁ, অবশ্যই।

নাদা মনে মনে ভাবছিল তার সমস্যাগুলোর কথা। শাদী নীরস। সে আমার প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করে না। বরং আমার মনে হয় সে আমাকে ভালোবাসেই না। তাই নাদা এবার প্রশ্ন করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনো আপনার প্রতি তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতেন?

নাদার কথা শুনে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা মুচকি হাসলেন এবং বললেন, তিনি আমাকে সিয়াম পালনরত অবস্থায়ও শুকনো চুমু খেতেন। লোকেরা জিজ্ঞাস করল, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? তিনি বললেন, আয়েশা। তিনি এমন একটি সমাজে এই কথাটি বললেন, যে সমাজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশকে দূষণীয় মনে করত।

নাদা ভাবল, আমি একবার অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু শাদী আমার বিশেষ কোনো যত্ন নেয়নি। তাই সে প্রশ্ন করল, আপনি যখন অসুস্থ হতেন তখন রাসূল কি আপনাকে নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতেন?

: তখন তিনি আমার প্রতি বিশেষ মায়া প্রকাশ করতেন। ব্যথার জায়গায় হাত রেখে আমার জন্য দোয়া করতেন।

নাদা ভাবল, আমি যখন নারীসুলভ অসুস্থতার দিনগুলো অতিবাহিত করি তখন অনেক অস্বস্তি অনুভব করি। কিন্তু শাদী আমার কোনো খেয়াল রাখে না। অথচ সে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার মনের অবস্থা সে ভালোভাবেই জানে। তাই সে প্রশ্ন করল, আপনার বিশেষ সময়ে কি রাসূল আপনার দেখাশোনা করতেন?

: তিনি এ সময়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ালু থাকতেন। আমি হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় পানি পান করতাম। তারপর পানির পাত্রটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে বাড়িয়ে দিতাম। তিনি ইচ্ছে করেই সেই স্থানে মুখ দিয়ে পানি পান করতেন যেখান থেকে আমি পানি পান করেছি। কখনো গোস্তের একটি টুকরায় কামড় দিয়ে তা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিতাম। তিনি ইচ্ছে করেই তার মুখ আমার কামড় দেয়ার স্থানে রাখতেন। যাতে আমি খুশি হই এবং আমার মন ভালো হয়ে যায়। একবার হজ্জের সময় আমি হায়েজগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। হজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়ার দুঃখে আমার খুব কান্না পেল। তখন রাসূল আমাকে বললেন, এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ আদমের কন্যাদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দিয়েছেন। তারপর তিনি আমাকে আমার কর্তব্য বাতলে দিলেন।

নাদা ভাবল, শাদী আমার নারীসুলভ দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষ করে এবং আমাকে অপমান করে। তাই সে প্রশ্ন করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে গুরুত্ব দিতেন?

এ প্রশ্ন শুনে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা মুচকি হাসলেন এবং বললেন, একবার মসজিদে একদল হাবশী বর্শা নিয়ে খেলছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি দরজার সামনে দাঁড়ালেন আর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। আমি আমার থুতনি তাঁর কাঁধের উপর রাখলাম। আমার গাল তাঁর গালের সাথে মিলে গেল। তিনি আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আবৃত করে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মন ভরেছে? আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তাড়াহুড়ো করবেন না। তিনি আমার জন্য আরও কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আরও কিছুক্ষণ পর তিনি আবারও বললেন, তোমার মন ভরেছে? আমি এবারও বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তাড়াহুড়ো করবেন না। এভাবে যতক্ষণ না আমি নিজ থেকে সরে আসি ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সময় কতটুকু দীর্ঘ ছিল তা সবাইকে বোঝানোর জন্য আমি বলি, তোমরা অনুমান করার চেষ্টা করো যে, খেলাপ্রেমী একজন কমবয়স্ক বালিকা কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিশু অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। আমি তখন ছোট মেয়েদের মতো পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার সাথে আমার কিছু বান্ধবীও খেলত। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলে ভয়ে আড়ালে চলে যেত। কিন্তু রাসূল তাদেরকে ডেকে আবারও আমার কাছে নিয়ে আসতেন। তাদেরকে নিশ্চিন্তে খেলার ব্যবস্থা করে দিতেন। একবার তিনি আমার পুতুলগুলো দেখে

বললেন, এগুলো কী আয়েশা? আমি বললাম, আমার মেয়ে। সেখানে তিনি একটি ঘোড়া দেখতে পেলেন। যার দুটি ডানা রয়েছে। তিনি বললেন, এগুলোর মাঝখানে ওটা কী? আমি বললাম, ঘোড়া। তিনি বললেন, ঘোড়ার গায়ে ওগুলো কী? আমি বললাম, পাখা। তিনি বললেন, ঘোড়ার আবার পাখা? আমি বললাম, আপনি কি জানেন না, সুলাইমান আলাইহিস সালামের একটি দুই ডানা-বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। এমনকি আমি তাঁর মাড়ির দাঁত দেখতে পেলাম।

আমি আমার শৈশবের শেষ দিনগুলো তাঁর সাথে অতিবাহিত করেছি। আমি তাঁর থেকে শিখেছি। খেলেছি। ইবাদত করেছি। আমার মনে কোনো খটকা ছিল না। ছিল না কোনো সংশয়। তিনি আমার দেখভাল করেছেন। আমাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করেছেন।

নাদা মনে মনে বলল, শাদী আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব দেয় না। আমার মায়ের দেয়া দুই হাজার ডলার মূল্যের একটি চুড়ি ভেঙে গিয়েছে। আমি তাকে চুড়িটি ঠিক করে দিতে বলেছি। সে আজ না কাল এসব বলে গড়িমসি করছে। তাই নাদা এবার জিজ্ঞেস করল, রাসূল কি আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দিতেন?

নাদার প্রশ্ন শুনে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা মুচকি হেসে বললেন, একবার আমি তাঁর সাথে সফরে বের হলাম। পথিমধ্যে আমার একটি হার হারিয়ে গেল। যতক্ষণ না হারটি খুঁজে পাওয়া গেল ততক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলাসহ সেখানেই বিলম্ব করলেন। সাহাবীদের সাথে তখন পানি ছিল না। এমনকি অযু করার মতো পানিও বিদ্যমান ছিল না। এমন সময় আমার বাবা আবু বকর রাগান্বিত হয়ে আমার কাছে আসলেন। কারণ, আমি সকলের বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। তিনি আমার পার্শ্বদেশে ব্যথা পাওয়ার মতো একটি খোঁচা দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর আরাম নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি নড়াচড়া বা আওয়াজ করতে পারলাম না।

আরও একবার আমার হার হারিয়েছিল। যার কারণে আমি কাফেলা হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার উপর অপবাদ দেয়া হয়েছিল এবং মুনাফিকরা আমার নামে কুৎসা রটিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারের মতো হার হারানো সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ভর্ৎসনা করেননি।

নাদা মনে মনে বলল, শাদী স্বার্থপর। সব সময় সে নিজেকে আমার উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করে। কখনো কখনো আমরা দুজন একসাথে অফিস থেকে ফিরি। বাসায় এসে দেখি কোনো খাবার নেই। এমন সময় শাদীকে তার কোনো বন্ধু ফোন করে খাবারের অফার করলে সে আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়। আমি কী খাবো, তা জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজনবোধ করে না। তাই নাদা এবার প্রশ্ন করল, আল্লাহর রাসূল কি কখনো কখনো খাবার বা পানীয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রাধান্য দিতেন?

: সব সময়ই তিনি আমাকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করতেন। আমাদের একজন পারসিক প্রতিবেশী ছিল। তার খাবার ছিল ভালো মানের। সে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করল। তারপর তাঁকে দাওয়াত করতে এল। তিনি বললেন, সেও কি আমার সাথে যাবে? অর্থাৎ তিনি আমাকে বোঝালেন। লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, না। অর্থাৎ আয়েশা যদি আমার সাথে না যায় তবে আমি দাওয়াত গ্রহণ করতে পারব না। প্রতিবেশী লোকটি আবারও তাঁকে দাওয়াত দিতে এল। তিনি এবারও বললেন, সেও কি আমার সাথে যাবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, না। প্রতিবেশী লোকটি তৃতীয়বারের মতো দাওয়াত দিতে এল। এবারও তিনি বললেন, সেও কি আমার সাথে যাবে? এবার লোকটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে নিয়ে সেই প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলেন।

কিন্তু কেন তিনি একা দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন? কারণ তিনি জানতেন আমি সেই খাবার পছন্দ করি। আর আমাদের কাছে খাবারও ছিল খুব কম। তাই তিনি আমার সাথে একই অবস্থায় থাকতে চাইলেন। হয়তো উভয়েই একসাথে খাবো; নতুবা উভয়েই একসাথে ক্ষুধার্ত থাকব।

শেষ কথাটি নাদার মনে দাগ কাটল এবং সে একটি ধাক্কা অনুভব করল। সে বলল, আপনাদের কাছে খাবার কম ছিল কেন?

: সম্পদ, হাদিয়া ও খাবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসত। তিনি সেগুলো গরিব ও আহলুস সুফফার মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। আমিও তাঁর সাথে ধৈর্যধারণ করতাম। আর কীভাবেই বা আমি ধৈর্যধারণ না করে থাকব? অথচ আমি দেখছি যে, তিনি আমাকে ছাড়া খাচ্ছেন না।

নাদা বলল, কিছু মনে করবেন না। আপনি একজন মেধাবী, সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত নারী। আপনি কি কখনো একা একা ভালো থাকার ইচ্ছে করেছেন? অর্থাৎ আপনি কি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছেদের চিন্তা করেছেন?

নাদার প্রশ্ন শুনে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হেসে ফেললেন। বললেন, তোমাকে একটি গল্প বলি। আমি ও নবীর অন্যান্য স্ত্রীর সবাই মিলে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু পার্থিব উপভোগের বস্তু দাবি করে বসলাম। আমরা খুব জোর দিয়ে তাঁর কাছে দাবি করলাম। আমরা সবাই তাঁর উপর অভিমান করলাম। প্রত্যেকেই দাবি আদায়ের জন্য নিজেদের পন্থা ব্যবহার করতে লাগলাম। প্রত্যেকেই একে অপরের চেয়ে কীভাবে বেশি আদায় করা যায় সে জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বসল। আমাদের এসব কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পেলেন এবং আমাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। এক মাস তিনি আমাদের সাথে কথা বললেন না। তারপর আল্লাহ এই মর্মে আমাদেরকে ইচ্ছাধিকার দিয়ে ওয়াহি অবতীর্ণ করলেন যে, হয়তো পার্থিব এই অভাবকে মেনে নিয়ে নবীর সাথে থাকব; নতুবা আমাদেরকে সুন্দর পন্থায় তালাক দিয়ে দেয়া হবে এবং পার্থিব কিছু সম্পদের ব্যবস্থাও করে দেয়া হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি সর্বপ্রথম আমাকে দিয়ে শুরু করলেন। বললেন, হে আয়েশা, আমি তোমার নিকট একটি বিষয়কে উপস্থাপন করতে চাই। আমি চাই, বিষয়টি নিয়ে তুমি তাড়াহুড়ো করবে না; যতক্ষণ না তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিষয়টি কী হে আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি আমাকে এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্যকে কামনা করো, তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু উপভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং তোমাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের বাড়িকে পছন্দ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে সৎকর্মশীলাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন বিরাট প্রতিদান।'[২৫]

তিনি চাচ্ছিলেন, আমি আমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ না করে আমার সিদ্ধান্ত না জানাই। কিন্তু আমি তাকে বললাম, আপনার ব্যাপারে আমি আমার মা-বাবার সাথে

---

২৫. সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৮-২৯

পরামর্শ করব হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের বাড়িকে পছন্দ করলাম। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে গেলেন।

'আপনার ব্যাপারে আমি মা-বাবার সাথে পরামর্শ করব হে আল্লাহর রাসূল!' কথাটি নাদার কানে ঝংকার তুলল। ভালোবাসার কী অপূর্ব প্রকাশ! সে তাঁকে ছাড়া একাকী জীবন কল্পনাই করছে না। যেন একটি আত্মা দুটি দেহে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কখনোই তা আর বিচ্ছিন্ন হবে না। নাদার মনে পড়ল, সে শাদীর সাথে বিচ্ছেদ চেয়েছিল। কিন্তু বাসার আসবাবে ন্যায্য ভাগ না পাওয়ার আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে সে চিন্তাটি বাদ দিয়েছে। শুধু কিছু সুবিধার জন্য সে শাদীর সাথে থেকে গেছে। তাদের মাঝে এখন প্রেম ও ভালোবাসা বলতে কিছুই নেই। অথচ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিচ্ছেদের ইচ্ছাধিকার পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল, বিচ্ছেদ মেনে নিলে তাকে পার্থিব কিছু সুবিধাও দেয়া হবে। কিন্তু তিনি কোনোপ্রকার সংশয় ছাড়াই নিজের স্বামীকে বেছে নিলেন। বিচ্ছেদের কথা একবার ভেবেও দেখলেন না। নাদা মনে মনে বলল, শাদী আমার সাথে যে সময়টি অতিবাহিত করছে তা কোয়ালিটি টাইম নয়। এটাকে কোনোভাবেই ভালো সময় বলা চলে না। সে সব সময় বিচ্ছিন্ন মস্তিষ্ক নিয়ে থাকে। তাই সে এবার প্রশ্ন করল, আল্লাহর রাসূলের দায়িত্ব তো অনেক বড় ছিল। তাঁর ব্যস্ততাও অনেক বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও আপনি কি কখনো অনুভব করতে পারতেন যে, তিনি আপনার সাথে থাকা অবস্থায় অন্যমনস্ক?

: আমার সাথে থাকা অবস্থায় তিনি আমাকে আমার পরিপূর্ণ অধিকার দিতেন। তখন তাঁর শরীর ও মস্তিষ্ক একই সাথে থাকত। আমার কাছে আসার এবং আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার প্রতিটি উপলক্ষ্যকে তিনি গ্রহণ করতেন। একটি ছোট্ট আচরণের মাধ্যমে আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতেন। এ জন্য আমার থেকে বর্ণিত তাঁর অনেক হাদিস দেখতে পাবে। কারণ, আমি তাঁর জীবনের শুধু বাহ্যিক অনুষঙ্গ ছিলাম না। বরং আমি ছিলাম তাঁর জীবনের গভীরে। আমি হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি প্রায় সময়ই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কিন্তু যখন আমার কাছে আসতেন তখন আমার কোলে মাথা রেখেই তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন।

এই পবিত্র ও সুন্দর দৃশ্যটি কল্পনা করার চেষ্টা করল নাদা। সে কল্পনা করল, আল্লাহর রাসূল সুমিষ্ট সুরে কুরআন তিলাওয়াত করছেন। মাথা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার

কোলে। তিনি হাত দিয়ে তাঁর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন। তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলো সর্বোচ্চ মনোযোগ সহকারে শুনছেন।

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমরা সব সময় ভালো সময় কাটাতাম। এমনকি গোসলের সময়টিও ছিল আমাদের জন্য স্মরণীয়। আমরা উভয়ে এক পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। ঠাট্টার ছলে পানি নিয়ে প্রতিযোগিতা করতাম। আমি তাঁকে বলতাম, আমার জন্য একটু রাখুন। আমার জন্য একটু রাখুন। তিনি আমাকে বলতেন, আমার জন্য একটু রাখো। আমাদের ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতায় সময়টুকু হয়ে উঠত অন্যরকম। একবার আমি তাঁর সাথে সফরে বের হলাম। আমি তখন ছিলাম কমবয়স্কা ও হালকা। তিনি সফরসঙ্গীদের বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। তারপর আমাকে বললেন, এসো, তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি তাঁকে পেছনে ফেলে বিজয়ী হলাম। তারপর অনেকদিন কেটে গেল। আমার বয়স বাড়ল। ওজনেও কিছুটা ভারী হলাম। সেই প্রতিযোগিতার কথা আমার মনেই ছিল না। তারপর এক সফরে তিনি আগের মতোই সফরসঙ্গীদের বললেন, তোমরা অগ্রসর হও। যখন তারা অগ্রসর হয়ে গেলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, এসো, তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। আমি বললাম, কীভাবে আমি আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব হে আল্লাহর রাসূল? আমার অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। তিনি বললেন, একটু প্রতিযোগিতা করেই দেখো না। তখন আমি প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে পেছনে ফেলে দিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, ওটার বদলে আজকেরটা।

নাদা মনে মনে বলল, শাদী বাইরের সমস্যা ঘরে টেনে আনে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং নবীর বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র কি আপনাদের ব্যক্তিগত জীবন ও স্থিরতার মাঝে কোনো প্রভাব ফেলত?

: না। মনে হতো, তিনি ঘরে প্রবেশ করার আগে বাইরে কোথাও দুশ্চিন্তাগুলো ফেলে এসেছেন। আমি তাঁর মাঝে দেখতে পেতাম মানসিক স্থিরতা, ভালোবাসা, প্রশান্তি ও সুন্দর ব্যবহার।

: এতকিছু সত্ত্বেও কি আপনি তাঁর সাথে থাকতে কখনো অনিরাপদ বোধ করতেন?

: এরচেয়ে বড় নিরাপত্তা আর কী হতে পারে?

নাদা ভাবতে লাগল, শাদী নিজের আনন্দগুলো আমার সাথে ভাগাভাগি করে না। তাই সে জিজ্ঞেস করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার সাথে তাঁর আনন্দ ভাগাভাগি করতেন?

: প্রায়ই করতেন। যেমন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল। আমাকে বললেন, জানো, একটু আগে মুজাজ্জাজ যায়েদ ইবনু হারিসা ও উসামা ইবনু যায়েদের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, এই পাগুলো একটি আরেকটির অংশ। অর্থাৎ তিনি এ কারণে আনন্দিত ছিলেন যে, পা দেখে বংশ-পরিচয় বলে দিতে পারে এমন একজন লোক উসামা ইবনু যায়েদ ও যায়েদ ইবনু হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মুখ না দেখে শুধু পা দেখেই তাদের বংশ-পরিচয় বলে দিয়েছেন। অথচ উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পা তার মায়ের পায়ের মতো কালো ছিল। আর যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পা ছিল সাদা।

নাদা মনে মনে বলল, আমি যদি কোনো বিষয়ে শাদীর সাথে লম্বা আলাপ করতে চাই, তাহলে সে আমাকে থামিয়ে দেয় এবং সংক্ষেপ করতে বলে। আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন শুনে সে বিরক্ত হয়। তাই সে জিজ্ঞেস করল, রাসূল কি আপনার কথা গুরুত্ব-সহকারে শুনতেন?

: তিনি কখনোই কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিতেন না। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করতে বসলাম। আমরা এগারোজন মহিলা ও তাদের স্বামীর গল্পটি আলোচনা করছিলাম। গল্পটি অনেক বড়। এই এগারোজনের সর্বশেষ যে মহিলা ছিল সে হলো আবু যারআর স্ত্রী। তার স্বামীর কাছে সে ছিল অনেক সম্মানিতা। আল্লাহর রাসূল দীর্ঘ সময় যাবৎ মনোযোগ-সহকারে আমার গল্প শুনলেন। কথার মাঝখানে আমাকে থামালেন না। অবশেষে যখন গল্প শেষ হলো তখন তিনি আমাকে ভালোবেসে বললেন, আবু যারআ তার স্ত্রী উম্মে যারআর জন্য যেমন আমি তোমার জন্য তেমন। অর্থাৎ সম্মান করার ক্ষেত্রে। আমি তাঁকে যদি এমন কিছু বলতে শুনতাম যার সম্পর্কে আমি জানি না, তাহলে তাকে বারবার জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিতাম। যেমন : তিনি একবার বললেন, যে ব্যক্তি হিসেবের সম্মুখীন হবে সে আযাবগ্রস্ত হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তো বলছেন :

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

'অচিরেই তার থেকে গ্রহণ করা হবে সহজ হিসেব।'[২৬]

২৬. সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৮

তিনি বললেন, এখানে যা বলা হয়েছে তা হলো শুধু আমলনামা পেশ করা। কিন্তু হিসেবের জন্য যাকে জেরা করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। জ্ঞান অর্জনের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে তিনি খুশি হতেন। হাদিসের পাতায় পাতায় শত শত প্রশ্ন পেয়ে যাবে যা আমি তাকে করেছিলাম। তিনি গুরুত্বের সাথে আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন। অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। কখনো কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন না।

নাদা মনে মনে বলল, শাদী আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। খুব দ্রুতই আমি তার পক্ষপাতিত্বের শিকার হচ্ছি। সবচেয়ে পীড়াদায়ক হলো, সে তার অফিসের নারী সহকর্মীদের যতটা গুরুত্ব দিচ্ছে আমাকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার মন যেন সব সময় তাদের কাছে পড়ে থাকে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, যখন আপনি কোনো ভুল করতেন তখন কি রাসূলের কাছে পক্ষপাতিত্বের শিকার হতেন?

: না, তিনি কোমলতার সাথে আমাকে শেখাতেন। আমি একবার তাঁর আরেক স্ত্রী সফিয়্যাহর দোষচর্চা করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ যাকে সাগরের পানির সাথে মেশালেও তা পানিকে কালো বানিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ নোংরা করে ফেলবে। তিনি আমাকে আল্লাহর ভয় শেখালেন; কিন্তু কোনোভাবে ছোট করলেন না। যখন আমি নিজের অজান্তে কোনো ভুল করে ফেলতাম তখন তাঁর চেহারার দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারতাম। ফলে তিনি কিছু বলার আগেই আমি তা সংশোধন করে নিতাম।

নাদা বলল, তিনি কখনো চিৎকার করতেন না?

: কখনোই না। একবার তিনি আমাকে বললেন, তুমি কখন আমার উপর খুশি থাকো আর কখন আমার প্রতি রাগান্বিত থাকো তা আমি বুঝতে পারি। আমি বললাম, আপনি কীভাবে তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি যখন আমার প্রতি খুশি থাকো তখন এভাবে বলো, 'না, মুহাম্মাদের রবের কসম!' আর যখন আমার প্রতি রাগান্বিত থাকো তখন বলো, 'না, ইবরাহিমের রবের কসম!' আমি বললাম, আপনি সঠিক বলেছেন হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুধু আপনার নামটিই ত্যাগ করি। অর্থাৎ রাগের সময় আমি আপনার নাম মুখে উচ্চারণ করি না। তবে আমার হৃদয়ে আপনার ভালোবাসা সব সময় জাগ্রত থাকে। কখনোই তা বদলায় না।

: আপনি কেন রাসূলের প্রতি রাগ করতেন?

: আমার সেই রাগ ছিল অভিমান।

: কখনো কি আপনি তাঁর প্রতি অভিমান করে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন?

: একবার আমার নিকট তাঁর রাত্রিযাপন করার পালা এল। তিনি এসে আমার পাশে শুয়ে পড়লেন। যখন তাঁর ধারণা হলো যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখন তিনি ধীরপায়ে বিছানা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দ্রুত উঠে তাঁর পিছু নিলাম। আমার ধারণা ছিল, তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর নিকট যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বাকিউল গারকাদ কবরস্তানে গেলেন। সেখানে সাহাবীদের অনেকের কবর বিদ্যমান ছিল। আমি পেছনে পেছনে গেলাম। যখন তিনি ফিরে আসতে লাগলেন তখন আমি তাঁর আগেই ঘরে চলে এলাম। যাতে তিনি বুঝতে না পারেন যে, আমি তাঁর পিছু নিয়েছিলাম। তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন, আমার নিশ্বাস দ্রুত চলছে। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন। আমি প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তারপর সবকিছু বলে দিলাম। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে, জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে জানিয়েছেন, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল বাকীর বাসিন্দাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। তাই তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগাননি। কারণ, আমি একাকিত্ব বোধ করতে পারি। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবর যিয়ারতের সময় আমি কী পাঠ করব? তিনি আমাকে সবকিছু শিখিয়ে দিলেন।

নাদার জানতে ইচ্ছে হলো, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা তার সতিনদের প্রতি আত্মমর্যাদা প্রকাশ করলে রাসূল তার সাথে কেমন আচরণ করতেন? কারণ, তার সামনে নারী সহকর্মীদের সাথে শাদীর মাখামাখির চিত্র ফুটে উঠতে লাগল। যদিও সেই হারাম সম্পর্কের সাথে এই পবিত্র সম্পর্কের কোনো সাদৃশ্য নেই, তবুও সে জিজ্ঞেস করল, অন্য স্ত্রীদের প্রতি আত্মমর্যাদা প্রকাশ করলে তিনি আপনার সাথে কেমন আচরণ করতেন?

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা মুচকি হেসে বললেন, একবার তিনি সাহাবীদের আমার ঘরে ডাকলেন। তখন তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা একটি বড় পাত্র-সহকারে এলেন। নবী ও তাঁর মেহমানদের আপ্যায়ন করতে তিনি পাত্রটিতে খাবার নিয়ে এসেছিলেন। তার এই কাজটি আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানল। আমি তখন আমার হাতে থাকা একটি পাথর দিয়ে পাত্রটি ভেঙে ফেললাম।

এ কথা শুনে নাদা বিস্ময়ে হাঁ করে রইল। দুচোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে বলল, তারপর আল্লাহর রাসূল কী করলেন?

: তিনি পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলো একত্র করলেন। সেখান থেকে খাবারগুলো তুলে নিয়ে সাহাবীদের বললেন, খাও। তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে। অর্থাৎ তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করলেন। তারপর তিনি আমার ঘর থেকে একটি পাত্র নিয়ে উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

: বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেল?

: হ্যাঁ।

: তিনি আপনাকে মারলেন না?

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হেসে ফেললেন। বললেন, আমাকে মারবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কোনোদিন কোনো নারী, খাদেম বা কাউকে আঘাত করেননি। তবে আল্লাহর পথে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যতীত।

নাদা মনে মনে বলল, আমি অনুভব করছি, শাদীর সাথে থাকতে থাকতে আমার ব্যক্তিত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার সাথে থাকা অবস্থায় আমি নিজেকে অন্যদের তুলনায় দুর্বল ও তুচ্ছ বলে অনুভব করি। তাই সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি রাসূলের সামনে আপনার ব্যক্তিত্ব ও মানসিক শক্তি নিয়ে খোলামেলা আচরণ করতে পারতেন?

: একবার আমি খাবার পরিবেশন করলাম। আমার নিকট নবীর স্ত্রী সাউদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন। তিনি আমার ঘরে বসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, খাবার গ্রহণ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদের সামনেই ছিলেন। সাউদাহ বললেন, আমার আগ্রহ নেই। আমি খাবো না। আমি তাকে বললাম, হয়তো আপনি খাবেন; নতুবা খাবার আপনার মুখে মাখিয়ে দেবো। এ কথা শুনেও তিনি খেলেন না। তখন আমি তার মুখে খাবার মাখিয়ে দিলাম। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। তখন সাউদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাও কিছু খাবার নিয়ে আমার মুখে মেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও হেসে ফেললেন।

নাদা মনে মনে ভাবল, শাদী আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। সে বলতে চায়, আমি আমার সহকর্মীদের সাথে ইচ্ছে করে আগ বেড়ে কথা বলি। সব সময় আমি নাকি তাদের কাছ থেকে সহমর্মিতা পেতে চাই। তাই সে জিজ্ঞেস করল, রাসূল কি আপনার প্রতি সুধারণা পোষণ করতেন?

: হ্যাঁ। যখন মুনাফিকরা আমার নামে অপবাদ দিলো তখন তিনি আমার পক্ষ থেকে জবাব দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে ভালো বৈ অন্যকিছু জানি না। কিন্তু দীর্ঘ একমাস আমার ব্যাপারে কুরআনের কোনো নির্দেশনা এল না। তবুও তিনি আমাকে এমন কোনো প্রশ্ন করলেন না, যার কারণে আমি মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হই। যখন তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলেন তখন বললেন, হে আয়েশা, তোমার ব্যাপারে কিছু কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও তবে অচিরেই আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। আর যদি তুমি কোনো অপরাধ করে থাকো, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তাঁর নিকট তাওবা করে নাও। কারণ বান্দা যখন অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন। তারপর আল্লাহ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে দিলেন।

নাদা মনে মনে বলল, যখন কোনো বিশেষ ব্যস্ততা থাকে শাদী আমাকে ঘরের কাজে কোনো সহায়তাই করে না। অথচ সে পত্রপত্রিকা ও ইন্টারনেটে 'নারী অধিকার ও নারী নির্যাতন' বিষয়ে লেখালেখি করে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, আমি জানি রাসূল আপনাকে ঘরের কাজে সহায়তা করার সুযোগ পেতেন না। কারণ, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশি।

: না। তিনি আমাকে ঘরের কাজে সহায়তা করতেন। যখন সালাতের সময় হয়ে যেত তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন।

এ দৃশ্য কল্পনা করে নাদা চমকে উঠল। তার চোখে ভেসে উঠল, নবী তাঁর স্ত্রীকে ঘরের কাজে বিনয় ও ভালোবাসার সাথে সহায়তা করছেন।

নাদা মনে মনে ভাবল, শাদী ইদানীং ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার সিগারেটের গন্ধে আমার কষ্ট হয়। সে মানুষের সামনে যেমন সেজেগুজে বের হয়, অথচ আমার জন্য কেন তেমন সাজে না? তাই সে প্রশ্ন করল, রাসূল কি আপনার জন্য সাজতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন—যেমনটি মানুষ বাইরে যাওয়ার সময় করে থাকে?

: তিনি ঘরে প্রবেশ করেই প্রথম মিসওয়াক করতেন। যাতে আমি তার মুখ থেকে সুন্দর ঘ্রাণ উপভোগ করতে পারি।

এ দৃশ্য কল্পনা করে নাদা আরও বেশি অবাক হলো। একজন মানুষ ঘরে প্রবেশ করার সময় মিসওয়াক করছেন। অথচ এখনকার মানুষ কাজে যাওয়ার সময় বা কারও সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় মুখ পরিষ্কার করে।

নাদা মনে মনে ভাবল, দিনদিন শাদীর অনুপস্থিতিই আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে। তাই সে প্রশ্ন করল, আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনি সব সময় রাসূলের সাথে থাকতে পছন্দ করতেন। কখনো কি এমন হয়েছে যে, আপনি তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছেন না?

: কোনো একরাতে তিনি বললেন, আয়েশা, আজকের রাতটি তুমি আমাকে আমার রবের ইবাদত করার সুযোগ দাও। তখন আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি এবং যা আপনি পছন্দ করেন তাকেও পছন্দ করি। তখন তিনি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পবিত্র হয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

নাদা মনে মনে ভাবল, শাদী মানুষের সামনে ভালোমানুষি ও সহনশীলতা দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আমার সাথে তার এসব ভালোমানুষি ও সহনশীলতার ছিটেফোঁটাও থাকে না। সে আমাকে বলে, বাধ্য হয়ে সে মানুষের সামনে এমনটি করে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, রাসূল মানুষের সাথে যেমন আচরণ করতেন আপনার সাথেও কি তেমনই আচরণ করতেন?

: বরং তারচেয়ে সুন্দর আচরণ করতেন। কারণ তিনিই তো বলেছেন,

خيركم من كان خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى

'তোমাদের মাঝে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের সাথে উত্তম।'[২৭] স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ করাকে তিনি উত্তমতার মানদণ্ড নির্ধারণ করলেন।

নাদা মনে মনে ভাবল, শাদীর ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু দিক আছে যার ব্যাপারে কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। কারণ তা অনেক বাজে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, কিছু মনে করবেন না, রাসূলের জীবনে কি এমন কোনো দিক রয়েছে যা আপনি মানুষকে জানাতে চান না?

: না। তাঁর পুরোটা জীবন ছিল উন্মুক্ত পাতার মতো। আমি মানুষের সামনে খুঁটিনাটি সব বিশ্লেষণ করে দিই। এমনকি দাম্পত্যজীবনের যেসব গোপনীয় বিষয় মানুষের জন্য শিক্ষণীয়, তা-ও আমি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিই। আমি তাঁর জীবন থেকে কীই-বা গোপন করব? তাঁর চরিত্রের নমুনা তো স্বয়ং কুরআন। কুরআনে যত উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ রয়েছে আমি তার প্রতিটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

২৭. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৮৯৫; সহিহ।

ওয়াসাল্লামের মাঝে দেখতে পেয়েছি। তাঁর ভেতর ও বাহির একই রকম ছিল। তিনি মানুষের সাথে যেমন আচরণ করতেন আমার সাথেও তেমনই আচরণ করতেন। এমনকি তাঁকে আমি কখনো বিকট হাসি দিতেও দেখিনি। তিনি সাধারণত মুচকি হাসতেন।

নাদা মনে মনে ভাবল, শাদীর কিছু আচরণের কারণে আমি আর তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রাখতে পারছি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি কোনো দূষণীয় কাজ করছি। তাই সে জিজ্ঞেস করল, এই প্রশ্নটির জন্য অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনি বললেন যে, দাম্পত্যজীবনের গোপনীয় বিষয়ের মাঝে যা কিছু শিক্ষণীয় আপনি তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন। আপনি কি আপনাদের বিশেষ সম্পর্কের মাঝে কোনো কারণে কখনো অপরাধবোধ করতেন?

: না। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তার বিনিময়ে প্রতিদান লাভ করবে। এ বিষয়টি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামই শিক্ষা দিয়েছেন। তুমি কি জানো, যখন মুনাফিকরা আমার নামে অপবাদ রটাল তখন সূরা নূরে আল্লাহ আমি ও আমার মতো নারীদের ব্যাপারে কী বললেন? আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষণ দিলেন, আমরা হলাম 'বেখবর'। তুমি কি জানো, বেখবর বলতে কী বোঝায়? বেখবর বলতে বোঝায়, আমরা কোনো হারাম সম্পর্ক ও অবৈধ কাজের ব্যাপারে ধারণাই রাখি না। আমাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি এসব থেকে পবিত্র। এমনকি আমার যেই ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমার পিতা আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কবর দেয়া হয়েছে সেই ঘরে প্রবেশ করে আমি আমার পর্দার আবরণ ত্যাগ করে বলতাম, এখানে তো শুধু আমার স্বামী ও বাবা রয়েছেন। তারপর যখন সেখানে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কবরস্থ করা হলো তখন আমি সেখানে পর্দাবৃত হয়ে অনেক সতর্কতার সাথে প্রবেশ করতাম। কারণ, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কবরের কারণে আমার সেখানে প্রবেশ করতে লজ্জা হতো।

নাদা অনুভব করল, সে এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলছে যিনি সকলের জন্য মানদণ্ড হতে পারেন। তিনি এক বিস্ময়কর শিষ্টাচার শিখেছেন। সে বুঝতে পারল, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের লিঙ্গবিভেদের চিন্তা সমকালীন সকল চিন্তা থেকে ভিন্ন। নাদার নীরবতা দেখে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আবারও বলতে লাগলেন

: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিষ্টাচারের সাথে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের কথা বলতেন। কোনো হালাল বিষয় প্রকাশ করতে তিনি লজ্জা পেতেন না। কিন্তু

দাম্পত্য বিষয়ক বিস্তারিত কথা কোনো নারীর সামনে প্রকাশ করতে তিনি লজ্জা পেয়ে যেতেন। একদিন আমার সামনে একজন নারী তাঁকে হায়েজ থেকে পবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে গোসলের পদ্ধতি বলে দিলেন। তারপর বললেন, তুমি সুগন্ধিযুক্ত একটি টুকরো নেবে এবং তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। সেই নারী প্রশ্ন করল, কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, পবিত্রতা অর্জন করবে। সে আবারও বলল, কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! পবিত্রতা অর্জন করবে। তিনি লজ্জায় এ কথা বলতে পারছিলেন না যে, তুমি টুকরোটি রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে রাখবে। আমি তখন সেই নারীকে টেনে নিয়ে আসলাম এবং বললাম, টুকরোটি দিয়ে তুমি রক্তের চিহ্নগুলো মুছে ফেলবে।

নাদা মনে মনে বলল, শাদী আমার সামনে তার দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে অহংবোধ করে। বরং তার দুর্বলতাকে সে আমার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, রাসূল কি তাঁর কোনো দুর্বলতা আপনার সামনে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেন?

: না। বরং যখন তিনি মৃত্যুর আগে অসুস্থ হলেন তখন অন্য স্ত্রীদের থেকে অনুমতি নিয়ে আমার বাড়িতে সেবা গ্রহণ করতে চলে এলেন।

এখানে এসে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। তিনি কিছুক্ষণ থেমে থেকে নিজেকে সংবরণ করে আবারও বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে আমার বুক ও কণ্ঠনালির মাঝে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। তার একটু আগেই আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর মিসওয়াক হাতে আমাদের ঘরে প্রবেশ করল। তার দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি মিসওয়াক ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। তাই আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। তখন তিনি সেটি দিয়ে সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন। তারপর মিসওয়াকটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সেটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। তখন আমি তাঁর জন্য সেই দোয়াটি করতে লাগলাম যা জিবরিল তাঁর জন্য করেছিলেন। তিনিও অসুস্থ হলে সেই দোয়াটি পাঠ করতেন। কিন্তু সেবার অসুস্থ হয়ে তিনি সেই দোয়াটি পাঠ করেননি। আমার মুখে দোয়াটি শুনে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গীদের সান্নিধ্য চাই। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার লালা ও তাঁর লালা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও একত্র করে দিয়েছেন।

: আপনি কি নিজেকে তাঁর পাশে দাফন করার অসিয়ত করেছিলেন?

: এমনটি আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রাধান্য দিয়েছি। যখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আক্রান্ত হলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। লোকেরা এসে আমাকে বলল, উমার ইবনুল খাত্তাব তার দুই সঙ্গীর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। অর্থাৎ আমার স্বামী ও পিতার সাথে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! এটা আমি নিজের জন্য চাইতাম। কিন্তু আজ আমি নিজের উপর তাকে প্রাধান্য দিচ্ছি।

নাদা মনে মনে বলল, আমি এখন শাদীকে নিয়ে ভাবি না। ইচ্ছে করেই আমি সব বিষয়ে তার বিরোধিতা করি। কোনো কিছুতেই আমি তার সাদৃশ্য গ্রহণ করতে চাই না। তাই সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আপনার স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহ অনুভব করেন?

: তিনি আমার মাঝে জীবিত আছেন। তাঁর ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে তিনি যেন আমার সামনে জীবিত হয়ে ওঠেন। তাঁর কথা, নড়াচড়া, স্থিরতা, চেহারার উজ্জ্বলতা আমার সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আমি নিজের মাঝে ধারণ করেছি। যখনই আমি তা চর্চা করি তখনই যেন আমার কোলের মাঝে তাঁর নিশ্বাস অনুভব করতে পারি। তাঁর সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে আমি মুমিনদের মা হয়ে গেছি; যদিও আমি তাদের কাউকেই গর্ভে ধারণ করিনি। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আগত সকল মুসলিম আমাকে ভালোবাসবে। আমাকে সম্মান করবে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যে আলো আমি জ্বেলে গেছি তা থেকে তারা আলোকিত হবে। এখন আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা হলো, আমি কীভাবে আমার প্রিয়তমের সাথে জান্নাতে মিলিত হব। তাই আমি তেমনই করার চেষ্টা করি যেমনটি তিনি করতেন।

তিনি ছিলেন সবচেয়ে মহানুভব মানুষ। আমি তাঁর ও আমার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি। এই আমি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খরচ বাড়িয়ে চেয়েছিলাম। সেই আমিই এখন এমনভাবে দান করি যে, নিজের জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই আমল যা ধারাবাহিক হয়, যদিও তা পরিমাণে সামান্য হয় না কেন। তাই আমি এখন যে আমল করি তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করি।

নাদা মনে মনে বলল, শাদীর সাথে থাকতে থাকতে আমার আত্মা ক্লান্ত। অথচ আমি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। নিজের অবস্থাকে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার অবস্থার সাথে মিলাতে গিয়ে সে লজ্জাই পেল। ভাবল, এই মহীয়সী নারীর সাথে

আমি যদি নিজেকে তুলনা করতে যাই তাহলে তা হবে হাস্যকর। তার সম্পর্কে তার ভাগিনা উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর বলেন, আমি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সংস্পর্শে থেকেছি। কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি অবগত কাউকে আমি দেখিনি। এমনকি কোনো ফরজ, সুন্নাত ও কবিতার ব্যাপারেও তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। তার জানার বাইরে কোনো কবিতা আমি আবৃত্তি করতে পারিনি। আরব জাতির ইতিহাস, বংশপরম্পরা, বিচারকার্য, এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও তার চেয়ে জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। আমি তাকে বললাম, খালা! আপনি চিকিৎসাশাস্ত্র কোত্থেকে শিখলেন? তিনি বললেন, আমি অসুস্থ হতাম। তখন আমার চিকিৎসার জন্য আমার সামনে বিভিন্ন জিনিসের গুণাগুণ বর্ণনা করা হতো। পরিবারের আরেকজন অসুস্থ হলো। তার চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জিনিস আনা হতো ও তার গুণাগুণ বর্ণনা করা হতো। এ ছাড়া আমি মানুষকে বিভিন্ন বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করতে শুনতাম। সেগুলোকে আমি মনে রাখতাম।

কথোপকথন শেষ হয়ে গেল। নাদা চোখ তুলে দেখল, ঘড়িতে সময় রাত একটা। সিরাতের পাতা উল্টাতে উল্টাতে সে কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে ফেলেছে। অথচ সে অনুভবই করেনি। এক পৃথিবী বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে নাদা বইটি বন্ধ করে রাখল। কে এই নবী? যিনি এই ছোট্ট রুমটির মাঝেই নাদার সামনে একটি আলোকিত পৃথিবী উপস্থাপন করে ফেললেন। কে এই নবী? যিনি তাঁর শক্তিশালী, সুন্দর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে একজন তরুণীর মাঝে প্রতিস্থাপন করে গিয়েছেন। স্টাডিরুম থেকে বের হয়ে নাদা তার বাড়ির প্রশস্ত একটি কামরায় প্রবেশ করল। পর্যাপ্ত গরম কাপড় গায়ে থাকা সত্ত্বেও সে শীত অনুভব করল। কারণ, হিটার জ্বালানো হয়নি। সোলার শেষ হওয়ার পরও শাদী তা কিনে আনেনি। তার আশা, নাদা নিজের পয়সা দিয়ে সোলার কিনে আনুক। নাদাও ইচ্ছে করে সোলার কিনছে না। কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে, শাদী চায় সে সোলার কিনুক।

নাদা রান্নাঘরে এল। টেবিলের উপর চোখ বুলাল। সেখানে কয়েকটি খাবারের প্যাকেট পড়ে আছে। শাদী খাবার খেয়ে এগুলো ফেলে রেখে গেছে। নাদার জন্য কিছুই আনেনি। হাঁটতে হাঁটতে সে তার বেডরুমে চলে এল। ভেঙে যাওয়া চুড়িগুলো এখনো টেবিলের উপর পড়ে আছে। যেন শাদী কবে তাদের স্পর্শ করবে সে অপেক্ষায় আছে তারা। শাদী বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। তার হাতে মোবাইল ফোন। নাদা খাটের উপর শরীর এলিয়ে দিলো। তার মনে হতে লাগল, আজকের এই কথোপকথন যদি শেষ না হতো! সে যদি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার মতো জীবনযাপন করতে পারত!

এই হলো নাদার গল্প। যে গল্প বর্তমান বিশ্বের বহু নারীর। গল্পটি আমি একদল নারী ও পুরুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। তখন একজন নারী বলে উঠলেন, আমি বহু দিন যাবৎ পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কাজ করছি। আমি বলতে পরি, আপনি যে তেইশটি সমস্যা উপস্থাপন করেছেন তা বর্তমানে বিদ্যমান সকল পারিবারিক সমস্যার সারাংশ। বিস্ময়কর হলো, আজকের যে বস্তুবাদী জাহিলিয়াত নারীর সুখ-শান্তি ও সম্মানকে বিনষ্ট করে দিয়েছে, সে-ই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে নিয়ে সংশয় তৈরি করতে চাচ্ছে। কারণ বিয়ের সময় তার বয়স ছিল অল্প। অল্প বয়সে বিয়ে করাকে তারা নারীর সফলতার অন্তরায় ও বাধা বলে সাব্যস্ত করতে চাচ্ছে। বিস্ময়কর হলো, আমরা মুসলিমরাও তাদের তৈরিকৃত সেই সংশয়ের মাঝে পড়ে যাচ্ছি। প্রথমে আমাদের ভেতর সংশয় প্রবেশ করছে। তারপর বিরোধিতা শুরু হচ্ছে। আমাদের উচিত ছিল একেবারে শুরু থেকে প্রশ্ন করা। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বিয়েতে কী এমন সমস্যা, যার জবাব আমাদেরকে দিতে হবে? আর কোন অধিকারেই বা তোমরা এই পবিত্র বিয়ের উপর প্রশ্ন তুলবে? তোমাদের কি সেই নৈতিক অধিকারটুকু আছে?

যে শত্রুরা আমাদেরকে সামরিকভাবে সকল পন্থায় দমন করতে চাচ্ছে—আমরা তাদেরকে মানসিকভাবে দমন করারও সুযোগ করে দিচ্ছি। আমাদের মস্তিষ্ককে তাদের হাতের মুঠোয় তুলে নেয়ার সুযোগ দিচ্ছি। বোকার মতো শত্রুদের নির্ধারণকৃত মানদণ্ডে আমরা আমাদের দীন ও নবীর সুন্নাহকে মাপার চেষ্টা করছি। আপনি যখন আপনার দীনের কোনো বিষয়ে সংশয়ে পড়ে গেলেন, তখন আপনি যুদ্ধে অর্ধেক হেরে গেলেন। আর যখন শত্রুদের নির্ধারণকৃত মানদণ্ডে আপনি আপনার দীনকে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করলেন, তখন আপনি বাকি অর্ধেকও হেরে গেলেন।

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছোট বয়সে বিয়ে করেছিলেন। তাকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন, তিনি সকল নারীর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে গেছেন। দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, আস্থা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি জগতের সকল নারীর জন্য উপমা হয়ে গেছেন। ঈমান ও হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে গেছেন। শৈশব থেকেই ইলম ও ব্যক্তিত্বের উপর তিনি বেড়ে উঠেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর দীর্ঘদিন তিনি জীবিত ছিলেন। ছিলেন ইলমের মিনার। জগতের সকল মানুষকে আলো বিলিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সেই আলো বিচ্ছুরিত হতেই থাকবে। আজকের আলোচনায় আমরা ছোট মেয়েদের বিয়ে নিয়ে কোনো আলোকপাত করছি না। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে নিয়েও এখানে কোনো কথা

বলছি না। আমরা শুধু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনের সেই অংশে কিছুটা আলো ফেলতে চেয়েছি, যা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে অতিবাহিত করেছেন। তার দাম্পত্যজীবনের কিছু অংশকে তুলে ধরতে চেয়েছি। যাতে আজকের নব্য জাহিলিয়াতের মাঝে বসবাস করা নারীরা কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারে—কেমন ছিল রাসূলের ঘরে আয়েশার জীবন, আর কেমন কাটছে তাদের দিনকাল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে আমাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার উৎস। এই বিয়েকে আমরা সকল দিগ্‌ভ্রান্ত জাতির সামনে উপস্থাপন করতে চাই। তাদেরকে মানবতার শিক্ষা দিতে চাই। ভ্রান্তির পথ থেকে আলোর পৃথিবীতে তুলে আনতে চাই। এই বিয়ে থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সমাজ ও পরিবার থেকে সকল অবিচার দূর করতে চাই। আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদের পারিবারিক জীবনকে ততটা সুন্দর করে দেন যতটা সুন্দর ছিল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন। আমিন।

সুপারওম্যান

পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ ইলাহ হতে চায়। তারা এমন আচরণ করে, যেন নিজেকে ইলাহ মনে করছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই আহলে কিতাবের অনুকরণ করবে। তিনি বলেন,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ من كانَ قبلَكُم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ حتَّى لَو دخلوا جُحرَ ضبٍّ لسلكتموه. قالوا : يا رسولَ اللهِ مَن اليَهودُ والنَّصارى؟ قالَ فمَن إذًا؟

‘তোমরা প্রতিটি বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা কোনো ‘দব্ব’ এর গুহায় প্রবেশ করে, তাহলে তোমরা সে ক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করবে।’ এ কথা শুনে সাহাবীরা বললেন, ‘আপনি কি ইহুদি ও নাসারাদের কথা বলছেন?’ তিনি বললেন, ‘তাহলে কার কথা বলছি?’ অর্থাৎ তারা ছাড়া আর কারা আছে?[২৮]

২৮. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৭৩২০

যদি তারা 'দব্ব'[২৯] এর গুহার মতো সংকীর্ণ ও নির্জন স্থানেও প্রবেশ করে আমরা সে ক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করব। কোনো প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক আমরা তাদের পিছু পিছু ছুটব। বর্তমানে আমরা তাদের পিছু পিছু যে গুহায় প্রবেশ করছি তা হলো, নিজেকে ইলাহ বা উপাস্য মনে করার গুহা। অর্থাৎ মানুষ তার নিজ সত্তাকে ও নিজ প্রবৃত্তিকে উপাসনার বস্তুতে পরিণত করছে। সত্য ইলাহের সামনে অবনত হতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আমাদের সমাজে বর্তমানে বিদ্যমান অধিকাংশ সমস্যার কারণ এটিই। যেহেতু আমরা এই সিরিজে নারীকে নিয়ে কথা বলছি তাই আমরা আজ কথা বলব নারীকে উপাস্য বানানোর বিষয়টি নিয়ে। তার সাথে শুনব পশ্চিমা নারীর উপাস্য হওয়ার গল্প, তার কারণ ও প্রেক্ষাপট, তার বাস্তবতা ও ফলাফল। তারপর আলোচনা করব, কীভাবে মুসলিম নারীদের একটি অংশ একই পথে চলছে এবং একই গুহায় প্রবেশ করছে। কখনো ইচ্ছায় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় প্রতিটি বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে কীভাবে তারা পশ্চিমা নারীর পিছু পিছু ছুটছে। তারপর আমরা মুসলিম নারীদের এই পথে ঝোঁকার কারণ ও ফলাফলের কথা উল্লেখ করব। নিজেকে উপাস্য বানানোর পরিণতির কথা তুলে ধরব। অবশেষে মুসলিম নারীদেরকে সতর্ক করব।

কীভাবে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ নিজেকে ইলাহ বা উপাস্য বানাচ্ছে? প্রকারান্তরে সে নিজের উপাসনা করছে এবং নিজেকে ইলাহ বলেও দাবি করছে? আপনি যখন জানতে পারবেন, 'নিজেকে উপাস্য বানানো' এ কথা বলে আমি মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দাসত্বের কথা বোঝাচ্ছি, তখন হয়তো ধারণা করবেন যে, এটা হয়তো আমি রূপক অর্থে বলছি। কিন্তু না। আপনি একটু আল্লাহর এই বক্তব্যের দিকে লক্ষ করুন :

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾

'আপনি কি তাকে দেখেননি, যে আপন প্রবৃত্তিকে ইলাহ বলে সাব্যস্ত করেছে? আপনি কি তাদের দায়িত্বশীল হবেন?'[৩০]

২৯.দব্ব : ইংরেজি নাম Uromastyx সরীসৃপ-জাতীয় মরুপ্রাণী বিশেষ। দেখতে কুমির আকৃতির। বড় আকৃতির একটি দব্ব লম্বায় সর্বোচ্চ ৮৫ সেন্টিমিটার হয়। প্রাণীটি খুবই কম পানি পান করে। এর রক্ত চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ভক্ষণযোগ্য প্রাণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে তাঁর উপস্থিতিতে খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা খেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তা খাননি এবং খেতে নিষেধও করেননি। দেখতে গুইসাপ আকৃতির হওয়ায় অনেকে দব্ব শব্দের অনুবাদ গুইসাপ করে থাকেন। আসলে প্রাণী দুটি এক নয়। সূত্র : উইকিপিডিয়া।-অনুবাদক।

৩০. সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৩

আল্লাহ আরও বলেন :

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾

'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে একটি ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি? তারপর হঠাৎ সে স্পষ্ট প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।'[৩১]

অর্থাৎ সে নিজেকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে। স্পষ্টভাবে সে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ ও অংশীদার প্রমাণ করতে চায়।

কিন্তু পশ্চিমাদের এভাবে নিজেকে উপাস্য বানানোর কারণ কী? তার কারণ হলো ধর্ম ও ধর্মত্যাগ। এ কথার ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যা হলো, আহলে কিতাবদের নিকট বর্তমানে বিদ্যমান বিকৃত ধর্মীয় গ্রন্থই কিছু মানুষকে উপাস্যে পরিণত করেছে। আল্লাহর সাথে বান্দার পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তাই মানুষই এখন তাদের কাছে ইলাহ বা উপাস্যে রূপ নিয়েছে। কখনো তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে উপাস্য বলছে। এতে তাদের কোনো সমস্যাও হচ্ছে না। কারণ তাদের ধারণামতে উপাস্য যিনি তিনি ঘুমান, খাবার গ্রহণ করেন এবং ক্লান্ত হন। তাদের ধর্ম তাদেরকে উপাস্য সম্পর্কে এমনই ধারণা দিয়েছে। বলেছে, মানবিকতার সাথে উপাস্য হওয়ার কোনো সংঘর্ষ নেই। এভাবে তারা মানুষকে অজ্ঞ করে রাখতে চায়। যাতে তারা ধর্মের উদ্ভট কথাগুলোর উপর প্রশ্ন না তোলে। তাই তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থের বুক অফ জেনেসিস অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর আদমকে এই বলে অসিয়ত করলেন, স্বর্গের সব গাছ থেকে তুমি আহার করবে। কিন্তু কল্যাণ ও অকল্যাণকে জানার গাছটি থেকে তুমি কখনো আহার করবে না। কারণ যেদিন তুমি তা থেকে আহার করবে সেদিন তুমি মরে যাবে।'[৩২] অর্থাৎ ঈশ্বর আদমকে অজ্ঞ রাখতে চাইলেন। তাই বললেন, জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করলে তিনি মরে যাবেন। যাতে তিনি সেখান থেকে আহার না করেন এবং আজীবন অজ্ঞই রয়ে যান। আদম যখন ঈশ্বরের আদেশ না মেনে জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করলেন, তখন ঈশ্বর ভয় পেয়ে গেলেন। বুক অফ জেনেসিসের আদিগ্রন্থে এমনটিই বলা হয়েছে। আদম জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করার পর ঈশ্বর বললেন, 'সে এই বৃক্ষ থেকে আহার করার পর আমার মতোই একজন হয়ে গেল। আমার মতোই সে কল্যাণ ও অকল্যাণকে চিনতে পারে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে তার হাত বাড়িয়ে জীবনের বৃক্ষ থেকেও আহার করে নেবে। ফলে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।'[৩৩] অর্থাৎ ঈশ্বর আশঙ্কা করলেন যে, আদম

---

৩১. সূরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৭৭

৩২. বুক অফ জেনেসিস : ১৬/২-১৭

৩৩. বুক অফ জেনেসিস : ২২/৩

আরেকটি গাছ থেকে আহার করে নেবে। ফলে সেও চিরঞ্জীব হয়ে যাবে। কখনোই আর মারা যাবে না। এভাবে সে উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাদের এসব অসার বক্তব্য থেকে বহুগুণে ঊর্ধ্বে।

মানুষ নিজেকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ ও উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করার চিন্তাটি পশ্চিমাদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থেই বিদ্যমান রয়েছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে সেই চিন্তাটি আরও বিস্তার লাভ করছে। তারা ভাবছে, আল্লাহ মানুষের নিকট যা কিছু গোপন রাখতে চেয়েছেন এবং তাকে যা সম্পর্কে অজ্ঞ রাখতে চেয়েছেন বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে মানুষ তা জেনে ফেলছে। তাদের এসব বিকৃত চিন্তার ফিরিস্তি আমি এখানে টানতে চাই না। শুধু বলতে চাই, একটু অনুভব করার চেষ্টা করুন যে, আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম নামক দীন দান করে কতই-না অনুগ্রহ করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আল্লাহর অস্তিত্বকেই বরং প্রমাণ করছে। আল্লাহর মহত্ত্বকে প্রকাশ করছে। তাঁর কুদরতকে আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টির সামনে তুলে ধরছে। তাই বিজ্ঞানের কোনো নব্য আবিষ্কার আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি আরও বিশ্বাসী করে তোলে। আমরা আরও বেশি তাঁর প্রতি অবনত হতে থাকি। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যখনই আপনি কোনো সৃষ্টির দিকে তাকাবেন তখনই আপনার ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে। আপনি আল্লাহর প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে যাবেন। যার বর্ণনা আমি আমার 'রিহলাতুল ইয়াকিন' সিরিজে দিয়েছি।

আমরা আবারও পেছনের আলোচনায় ফিরে যেতে চাই। বলতে চাই, পশ্চিমাদের বিকৃত দীন মানুষকে উপাস্য বানানোর ধারণাকে তাদের মস্তিষ্কে স্থান দিয়েছে। ধর্মই যদি তাদেরকে এই ধারণা দেয়, তাহলে ধর্মত্যাগ কীভাবে তাদেরকে এই পথে আরও অগ্রসর করছে? পশ্চিমা সমাজে যারা ধর্মত্যাগ করছে তাদের সুযোগ হচ্ছে না যে, তারা এসব অমূলক কথা থেকে মুক্ত সত্য কোনো ধর্মের অনুসন্ধান করবে। ফলে স্বভাবতই তারা নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ মানুষ হিসেবে তার স্বভাবের মাঝে মানবীয় দুর্বলতা বিদ্যমান রয়েছে। তাকে তাই কোনো পূর্ণতার অধিকারী রবের উপাসনা ও তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। যদি সে এই উপাসনাকে প্রকৃত উপাস্যের জন্য সাব্যস্ত না করতে পারে, তখন তাকে বাধ্য হয়েই নিজের প্রবৃত্তির উপাসনা করতে হয়। এভাবেই পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ নিজেকে নিজের উপাস্যে পরিণত করে।

নিজেকে উপাস্য জ্ঞান করার চিন্তা থেকেই তারা ভাবে, জগতের প্রতিটি বস্তুকে মানুষের অনুগত ও অবনত করতে হবে। মানুষ কারও সামনে অবনত হবে না। এমনকি তার সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার সামনেও নয়। এ জন্য তাদের মানদণ্ড, চিন্তা ও পরিশ্রম সবকিছুই জগতের সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার পেছনে ব্যয় হয়। তারা বলতে চায়,

মানুষই সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। সকল পবিত্রতা মানুষের জন্যই সাব্যস্ত। মানুষের প্রবৃত্তি ও আগ্রহ পবিত্র। তাই ধর্মকেও মানুষের সামনে অবনত হতে হবে। তা থেকে যা মানুষের ভালো লাগবে, সে তা গ্রহণ করবে। যা তাকে মানসিকভাবে শান্তি দেবে, তা সে পালন করবে। আর ধর্মের যা কিছু মানুষের ইচ্ছে, আগ্রহ ও প্রবৃত্তির সাথে সাংঘর্ষিক হবে তাকে সে নিজের ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে নেবে। নিজেকে উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাওয়া এই মানুষের জন্য কোনো কিছুই নিষিদ্ধ নয়। তার উপাস্য হওয়ার মোকাবেলায় কোনো বাধাই বিবেচ্য নয়। তবে যদি তা তার আশপাশে অবস্থানকারী উপাস্য হতে চাওয়া কোনো মানুষের জন্য বাধা সৃষ্টি করে, তবে ভিন্ন কথা। 'আল্লাহর হক' শব্দটি তাদের অভিধানে সবচেয়ে অসম্মানজনক শব্দ।

নিজেকে উপাস্য বানানোর এই চিন্তা পশ্চিমা বিশ্বে নারী-পুরুষ সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। নারীকে এই চিন্তায় আরও বেশি বেগবান করে তুলেছে বিকৃত ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা বাণীগুলো। যেখানে নারীকে সকল অপরাধের উৎস বলা হচ্ছে। কারণ, তার প্ররোচনায় আদম জ্ঞানের বৃক্ষ থেকে আহার করেছেন। আর তাই ঈশ্বর ভীত ও রাগান্বিত হয়ে তার উপর মাসিক, সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের মতো কষ্টকর কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন। পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন।[৩৪] তাই পশ্চিমা নারীরা ঈশ্বর ও তার ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করতে চায় এবং তার মোকাবেলায় নিজেকে নিজের উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই উপাস্য হওয়ার চিন্তা অর্থাৎ নারী নিজেকে নিজের উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করার চিন্তাটি একাধিক রূপ ও আকৃতি ধারণ করেছে। এমনকি এই চিন্তা থেকে সেসব নারীরাও মুক্তি পায়নি যারা নিজেদেরকে ধার্মিক নারী হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে।

তাই আপনি 'খ্রিষ্ট নারীবাদ' এই শিরোনামেও লেখা পেয়ে যাবেন। সেখানে উপাস্যের জন্য স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম She ব্যবহৃত হয়েছে। উপাস্যকে পুংলিঙ্গ সাব্যস্ত করার বিষয়টিক কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কোথাও কোথাও হিন্দুত্ববাদ ও মূর্তিপূজার প্রসার ঘটছে। কারণ, হিন্দুধর্মে নারী উপাস্যের অস্তিত্ব রয়েছে। তারা ভাবছে, এর মাধ্যমে নারীরা পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এসবের প্রচারণা যারা করছে তাদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিতা নারী, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ও বহু ডিগ্রিধারী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনকারী নারীবাদী ডক্টর রোলি ক্রাইস্ট একটি মতবাদ প্রণয়ন করেছে। তার সেই আন্দোলনের নাম উপাস্যবাদ বা Goddess Movement। নিজেকে উপাস্য বানানোর চিন্তাকে প্রসারিত করার জন্য একাধিক বইও লেখা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বহু

৩৪. সেন্ট টিমোথি : ১৪/২, বুক অফ জেনেসিস : ৩/১৬

সেমিনারের আয়োজনও করা হয়েছে। তার মাঝে একটি সেমিনারের শিরোনাম ছিল : মহান নারী উপাস্য পুনর্জন্ম লাভ করছে। যা ১৯৮৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মতবাদে বিশ্বাসী অনেকে নিজেকে খ্রিষ্টবাদের অনুসারী হিসেবে দাবি করে ঈশ্বরকে নারী বলে সাব্যস্ত করে। আর অনেকে হিন্দুত্ববাদের অনুসরণ করে। তাদের শেষ কথা হলো, আমি নারী। আমি সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। যেকোনো উপাস্যকে আমি আমার মর্জিমতো পরিবর্তন করে নেব। আমি তাকে নারী বলে সাব্যস্ত করব এবং এ জন্য তার উপাসনা করব যে, সে একজন নারী। ঠিক যেমন জাহিলিয়াতের যুগের মানুষেরা আজওয়া খেজুর গলিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো একটি মূর্তি তৈরি করত। তারপর সেটির উপাসনা করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রার্থনা করত। অবশেষে ক্ষুধার্ত হলে তাকে খেয়ে ফেলত। এসব নারীরাও ভাবে, উপাস্য তাদের ইচ্ছেমতো রূপ ধারণ করবেন। তারা যা করবে তা-ই তিনি মেনে নেবেন।

আরেকদল পশ্চিমা নারী তাদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যগুলোকে অস্বীকার করে এবং মূর্তিপূজার মতবাদকেও অস্বীকার করে। কিন্তু মানবীয় স্বভাবের বাইরে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সঠিক দীনের সন্ধানও তারা পায় না। তখন তারা নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং মৌলিকভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসে। আর কেউ কেউ আবার নিজের সত্তাকে উপাস্যের বিকল্প মনে করে। তারা ভাবে, লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা নিজের ভেতরেই একজন সৃষ্টিকর্তা বা উপাস্যকে ধারণ করে। সে উপাস্যের উপাসনার বাইরে কখনোই তারা যেতে পারবে না। এসব চিন্তার প্রসার ঘটাতে মিলিয়ন মিলিয়ন গান প্রকাশিত হয়েছে এবং অসংখ্য চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। আমরা সেগুলোর বিবরণের দিকে যাব না এবং সেগুলোর নামও উল্লেখ করব না। কারণ, সেগুলোর মাঝে চরিত্র হননের বহু উপকরণ রয়েছে এবং মানবীয় প্রবৃত্তিকে পবিত্র বলে সাব্যস্ত করার অপচেষ্টাও করা হয়েছে। কোনো কোনো গানে ধর্মীয় বাণীয়ও যুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে নারী উপাস্যের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এসব গানের সারকথা হলো, আপনি কি নিজের ভেতর নারীর প্রতি আগ্রহ ও দুর্বলতা অনুভব করতে পারছেন না? তাহলে স্বীকার করে নিন যে, ঈশ্বর হলেন নারী। এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই আপনি নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করে নিন। যেসব যুবক ও যুবতিরা বারবার এসব গান শুনছে তারা পাপাচার, অবৈধ প্রেম, সুরের তালে তালে নিজেদের মাঝে এই চিন্তাকে ধারণ করে নিচ্ছে যে, মানব একটি উপাস্য আর মানবী আরেকটি উপাস্য। প্রবৃত্তি একটি উপাসনার বস্তু। বিশেষত সেই সমাজে এসব চিন্তা বেশি প্রসারিত হচ্ছে যেখানে প্রতিটি স্থানে যৌনতার প্রলেপ তৈরি করে দেয়া হয়েছে। এসব গান সেখানে মানুষের বিবেক, জ্ঞান ও অনুভূতিকে অন্ধ করে দিচ্ছে। নতুন করে একটি উদ্ভট চিন্তার প্রসার ঘটাচ্ছে।

অনেক পশ্চিমা নারী ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞানকে উপেক্ষা করে চলছে। তার মাথায় সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। সে শুধু বেঁচে আছে নিজের জন্য। নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য। নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে পূরণ করার জন্য। কেউ কেউ আবার সুবিধাবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করছে। ধর্ম ও বিকৃত ধর্মগ্রন্থ থেকে পছন্দমতো কথা গ্রহণ করছে। বাকিটুকু ত্যাগ করছে। আবার নিজেকে ধার্মিকও ভাবছে। কেউ কেউ আবার ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছে। ধর্মের বক্তব্যগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থের বিপরীতে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে নিচ্ছে। যেসব ধর্মীয় বাণী তাদের ভালো লাগছে না বা তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতা মনে হচ্ছে, সেগুলোকে নিজেদের মনমতো ব্যাখ্যা করে নিচ্ছে। এই ধরনের সুবিধাবাদী ও ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণকারী নারীরা মিলে নিজেদের জন্য আলাদা মন্দির নির্মাণ করেছে এবং সেখানে পতিতাব্যবসা খুলে বসেছে। অথচ তাদের দীনে ব্যভিচার ও বিবাহ-বর্হিভূত যৌনাচারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলা আছে।

উপরে উল্লেখিত চিত্রগুলো নিজেকে উপাস্য মনে করার বিভিন্ন রূপ। কারণ, সকল পূর্ণতার অধিকারী আল্লাহর উপাসনা করা ও তাঁর সামনে অবনত হওয়ার বিষয়টি পশ্চিমা নারীর সামনে কখনো পেশ করাই হয়নি। এই বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে নিজেদের গতিপথ নির্ধারণে ভুল করার ফলে। বিশেষত মানুষ যখন নিজেকে উপাস্য ভাবতে শুরু করে তখন তার সামনে সত্য ও মিথ্যার কোনো বিভাজন থাকে না। কারণ, তার কাছে এমন কোনো রবের সন্ধান নেই যিনি তাকে সত্য ও মিথ্যার বিভাজন শেখাবেন। ফলে মানুষ হয়ে গেছে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। তাই মানুষের সংখ্যা ও শক্তির দ্বারা সত্য ও মিথ্যা নির্ধারিত হচ্ছে। নৈতিকতার কোনো মানদণ্ড তার সামনে থাকছে না।

নারী নিজেকে উপাস্য মনে করার সাথে সাথে বিকৃত প্রবৃত্তিকেও পবিত্র সাব্যস্ত করছে। যেমন : সমকামিতা, ব্যভিচার ইত্যাদিকে স্বাধীনতা বলে নামকরণ করা হচ্ছে। যার ফলে বহু ভ্রূণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। বহু শিশুকে জন্মের পরপরই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আর এ সবকিছুই হচ্ছে নারী স্বাধীনতার নামে। তাই আপনি পশ্চিমা নারীবাদের প্যাকেজে বহু জিনিসের অস্তিত্ব একসাথে পেয়ে যাবেন। আপনি দেখবেন নারীবাদের সাথে রয়েছে সমকামিতা, ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার বৈধতার দাবি। পশ্চিমা নারী এই গর্তে প্রবেশ করেছে। গর্তের নাম : মানুষ ও তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানানো। এই গর্তে সে নিজে প্রবেশ করেছে বা তাকে প্রবেশ করানো হয়েছে। তারপর এই গর্তের গায়ে নানা রকম আকর্ষণীয় রং চড়ানো হয়েছে। যার বিবরণ আমরা পূর্বে পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা শিরোনামের আলোচনায় দেখতে পেয়েছি।

এই নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল একটি সংরক্ষিত আসমানি নির্দেশনা অনুসন্ধান করা। একটি নির্ভরযোগ্য ধর্মকে খুঁজে বের করা। যে ধর্ম তার সাথে তার রবের সম্পর্কের কথা বলবে। সমাজে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলবে। তার সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাবে। কিন্তু পশ্চিমা নারী সেই ধর্মকে অনুসন্ধান করেনি। তাই সে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ধর্মকে হারিয়েছে। প্রবৃত্তিপূজার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। এক ভ্রষ্টতা থেকে আরেক ভ্রষ্টতায় পালাক্রমে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই হলো পশ্চিমা নারীর গল্প।

এবার আসুন, আমরা মুসলিমদের নিয়ে কথা বলি। আমাদের এই সিরিজটি যেহেতু মুসলিম নারীকে লক্ষ্য করেই নির্মিত হয়েছে সেহেতু আসুন আমরা মুসলিম নারীকে নিয়ে ভাবি। এখানে আমি আপনাদেরকে সেই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই— حتّٰى لَو دخلوا جُحرَ ضبٍّ لسلكتموه 'এমনকি যদি তারা কোনো দব্বের গর্তেও প্রবেশ করে সে ক্ষেত্রেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে'। অনেক মুসলিম নারী পশ্চিমা নারীর পিছু পিছু নিজেদেরকে উপাস্য বানানোর গর্তে প্রবেশ করেছে। আপনি ভাবছেন, একজন মুসলিম নারী কীভাবে নিজেকে উপাস্য বানানোর গর্তে প্রবেশ করতে পারে? হ্যাঁ, এটাই হলো পশ্চিমা দেশগুলোকে অনুকরণ করার ফলাফল। বরং ফলাফলের একটি অংশ মাত্র। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা চিন্তা, অনুভূতি, মানদণ্ড ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের অনুকরণ করছে। ফলে পশ্চিমাদের সকল দুর্দশাতেই তারা ভাগ বসাচ্ছে। তাদের সাথে প্রতিটি গর্তেই প্রবেশ করছে। স্বভাবতই ইসলামের প্রতি মুসলিম নারীদের সকলের অবস্থান এক রকম নয়। তাদের মাঝে অনেকে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী। ইলম ও তাকওয়ার ধারক। দেহ-মন উভয়টি দিয়েই তারা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। অনেক মুসলিম নারী রয়েছে যারা এসব ক্ষেত্রে দুর্বল। ইসলামের আদশে ও নিষেধসমূহ মানার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা রয়েছে। বাহ্যিক ক্ষেত্রেও তারা কখনো কখনো আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করছে। কিন্তু তারা তাদের অপরাধের কথা আল্লাহর সামনে স্বীকার করে। আল্লাহর দাসত্বকে নিজের জন্য অবধারিত মনে করে। আরেকদল মুসলিম নারী আছে, যারা আল্লাহর বিধান ও পশ্চিমাদের নারী স্বাধীনতার বুলির বাস্তবতা ভালো করে জানে। তারা আল্লাহর বিধানকে সম্মান করে এবং তার মাঝেই প্রজ্ঞা ও রহমত বিদ্যমান আছে বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু কিছু বিষয় তাদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। যেমন : পুরুষের কর্তৃত্ব ও একাধিক স্ত্রী ইত্যাদি। আরেকদল মুসলিম নারী আল্লাহর বিধান থেকে পালিয়ে বেড়ায়। হয়তো কঠোর বাবা বা তাকওয়াহীন স্বামীর আচরণের প্রভাবে সে প্রভাবিত। অথবা মিডিয়ার প্রচার ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। তাই সে আল্লাহর দীনের কিছু বিধান থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তার এই পালিয়ে বেড়ানোর সমাধান খুবই সহজ। কারণ, সে আল্লাহকে মহান মনে করে এবং তাঁর দাসত্বকে স্বীকার করে।

সে নিজেকে অপরাধী মনে করে এবং যারা তাকে সহায়তা করে তারা তার দীনকে ভালোবাসুক, এমনটি সে কামনা করে। তার রবের একটি বাণী ও রাসূলের একটি হাদিসই তার মন থেকে সকল সংশয় দূর করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

আরেকদল মুসলিম নারী নিজেকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ সে নিজেই তা জানে না। হে মুসলিম নারী, আপনি এর মাঝে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত? এই আলোচনায় আমি আপনাকে আপনার অবস্থান নির্ধারণ করতে সহায়তা করব। এই আলোচনা আপনার জন্য; আপনার সম্পর্কে নয়। এখানে আমি কারও নাম উল্লেখ করব না। তাহলে কারও মন খারাপ করা বা প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার পথে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই হে প্রিয় বোন, আপনি স্থিরতার সাথে চিন্তা করার চেষ্টা করুন। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার উপর কোনো বিধান আরোপ করতে চাই না। আমি আপনাকে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন করতে চাই না। আপনি নিজেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিন।

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾

'আর সফলকাম সে-ই, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।'[৩৫]

আশা করি আপনি এই সুযোগটি হাতছাড়া করবেন না।

মুসলিম নারীদের মাঝে কিছু ভয়ংকর দৃষ্টান্তও রয়েছে। কিছু মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করছে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমাদের অনুসরণ করছে। তাই আপনি মুসলিম বিশ্বে 'মুসলিম গে, লেসবিয়ান, ও হিজরা ইউনিয়ন' নামে সংগঠনের সন্ধানও পেয়ে যাবেন। অনেকে আবার স্পষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চেতনায় বিশ্বাস করছে। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিশদ ব্যাখ্যাই হলো মানুষ নিজেকে নিজের উপাস্য বানাবে। আপনি দেখবেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী নারীরা বলছে—ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করতে হবে, ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবন ও বিশেষ কিছু আচারের মাঝে সীমাবদ্ধ করতে হবে। এভাবে দীনের ব্যাপকতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করছে। প্রকারান্তরে সে বিশ্বাস করছে যে, মানুষের অধিকার রয়েছে আল্লাহর বিধানের মাঝে সংযোজন ও বিয়োজন করার। সে ইচ্ছে করলে ধর্মের জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতে পারে। ধর্মকে একটি গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ করে দিতে পারে। এটাই হলো নিজেকে উপাস্য বানানো ও আল্লাহর উপর সীমালঙ্ঘনের স্পষ্ট রূপ।

---

৩৫. সূরা শামস, ৯১ : ৯

যেসব নারীরা গভীরভাবে এই গর্তে প্রবেশ করে ফেলেছে তাদের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি না। আমরা শুধু কথা বলছি সেসব মুসলিম নারীর ব্যাপারে, যারা নিজের অজান্তেই গোপনে সেই গর্তে প্রবেশ করে ফেলেছে। মুসলিম বিশ্বে অবস্থান করেও তারা পশ্চিমাদের প্রচারণা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের স্লোগানে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু এখনো ইসলামের সাথে তাদের কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের উপাস্যবাদের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর বিষয় হলো, তা খুবই ক্ষীণ ও গোপন। তা সত্ত্বেও এটি খুব ভয়াবহ। কারণ, পশ্চিমা নারীদের মাঝে উপাস্যবাদের সূচনা এই ধরনের ক্ষীণ ও গোপন কারণ থেকেই হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা আজকের রূপ ধারণ করেছে। পার্থক্য শুধু সময় ও স্তরের। হতে পারে কোনো একদিন মুসলিম নারীও সে পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। এমন জায়গায় গিয়ে সে উপনীত হবে, যা সে কোনো দিন কল্পনাও করেনি। আজকের প্রজন্ম যদি সেখানে গিয়ে উপনীত হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কী হবে?

আমরা যে মুসলিম নারীকে নিয়ে এখন কথা বলছি, হয়তো সে কোনো দিন পশ্চিমাদের অনুকরণ করবে বলে কল্পনাও করেনি। এক সময় হয়তো সে আমাদের উপস্থাপিত সকল দৃষ্টান্তগুলোকে মনেপ্রাণে ঘৃণাও করত। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের অজান্তে সে সেদিকে ঝুঁকে পড়েছে। নিজের চরিত্র ও নৈতিকতাকে হয়তো সে বিসর্জন দিয়েছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। হতে পারে এই মুসলিম নারী পশ্চিমা নারীর পিছু পিছু গিয়ে তার মতো একই পরিণতি বরণ করবে। অথচ সে বুঝতেও পারবে না। তাই আসুন হে মুসলিম বোন, একটু নির্ণয় করার চেষ্টা করুন যে, আপনার অজান্তেই আপনার মাঝে নিজেকে উপাস্য বানানোর এই বীজ জায়গা করে নিয়েছে কি না।

মুসলিম বিশ্বের বহু নারী আজ সংশয় নিয়ে জীবনযাপন করছে। তবুও ইসলামের প্রতি তারা ভালোবাসা লালন করে। সামগ্রিকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তারা ভালোবাসে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের সামনে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করতে পারে না। সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি ইনসাফ করেছেন। সুস্পষ্টভাবে সে ইসলামকে ত্যাগ করতে চায় না। কারণ, তাতে তার ব্যক্তি-নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। তাই সে যে সমাধানে উপনীত হয় তা হলো, নিজেকে ও নিজের প্রবৃত্তিকে সে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেয়। এই চিন্তাকে সে প্রবৃত্তির অনুসরণ বলে নামকরণ করে না। নামকরণ করে বিবেকের দাবি বলে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে, তার ক্ষুদ্র বিবেক দিয়ে সে ইসলামের শাশ্বত বিধানকে বিচার করার চেষ্টা করছে। সে ভাবে, নিজেকে সে বিবেকের অনুগত করে পরিচালনা করছে। তার মতে,

সবকিছুকে বিচার করার জন্য সে যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে তা শতভাগ সঠিক। এতে প্রবৃত্তির কোনো প্রভাব বা ভুলের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে সে মনে করে না। মিডিয়া, ফিল্ম, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও পশ্চিমা চেতনার শিক্ষাব্যবস্থা যে তাকে এভাবে ভাবতে বাধ্য করছে—তা সে কল্পনাও করতে পারছে না। নিজের অজান্তেই যে সে রোগ্নো ও দুষ্ট আত্মীয়ের ফাঁদে পা দিয়েছে তা সে জানে না। নিজেকে সে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু মনে করে। তারপর সে নিজের উপাস্য বনে যাওয়া প্রবৃত্তি ও রবের বিধানের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করে। আসুন আমরা এ ধরনের উপাস্যবাদের কিছু চিত্র দেখে আসি। এই হাদিসের বাস্তবতা অনুধাবন করে আসি,

حتّٰى لَو دخلوا جُحرَ ضبٍّ لسلكتموه

'এমনকি যদি তারা কোনো দব্বের গর্তে প্রবেশ করে, তোমরা সে ক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করবে।'

উপাস্যবাদের এসব চিত্রের সারাংশ আমরা চারটি কথায় তুলে ধরতে পারি।

১. উপেক্ষা।

২. আপত্তি।

৩. সুবিধাবাদ।

৪. ব্যাখ্যার আশ্রয়।

প্রথম ধরন হলো, নারী তার স্রষ্টার আদেশকৃত বিষয়ের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

'আমি জ্বীন ও মানবকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।'[৩৬]

ইবাদতের সারকথা হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সামনে অবনত হওয়া ও তাঁর আনুগত্যকে স্বীকার করে নেয়া। শুধু সালাত আদায় করার নাম ইবাদত নয়। ইবাদত হলো সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের সম্মুখে অবনত হওয়া। কিন্তু এসকল নারী নিজেকে ও নিজের প্রবৃত্তিকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু মনে করতে থাকে। তার আশঙ্কা হয়, যদি সে আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়গুলো শিখতে যায় তাহলে তা প্রবৃত্তির চাহিদার সাথে

৩৬.৩৬. সূরা জারিয়াত, ৫১ : ৫৬

সাংঘর্ষিক হতে পারে। তাই সে সেই শিক্ষাকে এড়িয়ে চলে। প্রশ্ন হলো, কীভাবে সে এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসে যে, সে তার ধর্মের প্রতি অবিচার করছে না? এ ক্ষেত্রে সে একটি মানসিক কৌশল অবলম্বন করে। সে ভাবে, আমি অনাগ্রহী। কিসের প্রতি অনাগ্রহী? যেসব চিন্তা-ভাবনা নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে আমি তার প্রতি অনাগ্রহী। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার প্রতি আমি অনাগ্রহী। কারণ, আমি নিজেকে পুরুষের সমতুল্য প্রমাণ করার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করছি। নিজেকে প্রমাণ করার এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গিয়ে সে আল্লাহর দীনকে উপেক্ষা করে বেড়ায়। তার জন্য আর আল্লাহর আনুগত্যের সুযোগ মেলে না। এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধান তার জীবন ও চিন্তাধারার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। সে মনে করে, কিছু ফতোয়াবাজ লোক ধর্মের ব্যাপারে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলে। নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোনো বিধান সামনে এলেই সে ভাবে, এটা হয়তো ধর্মবেত্তারা নিজেদের কঠোর মানসিকতা থেকে বলেছে। হতে পারে এটা তাদের ভুল উপলব্ধি। ধর্মের বাণীকে তারা হয়তো ভুলভাবে উপস্থাপন করছে। হতে পারে ধর্মে আসলে পর্দা ফরজ নয়। হতে পারে ফ্রি মিক্সিং আসলে বৈধ। কিন্তু আসল সত্যকে অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করা আর তার হয়ে ওঠে না। 'আমি আলিমা নই', 'আমি ধর্ম বিশেষজ্ঞ নই' এসব কথা বলে সে বেঁচে যেতে চায়। অথচ ধর্ম বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যও সে মানতে রাজি নয়। সে বলে, আমার ভেতর কিছু প্রশ্ন আছে, যার উত্তর আমার কাছে নেই। কিন্তু তারা ইসলামকে যেভাবে উপস্থাপন করছে ইসলাম তেমন নয়; এটা আমি নিশ্চিত। আল্লাহ্ আমাকে বিবেক দিয়েছেন। আমি সেই বিবেক দিয়ে চিন্তা করব। শুধু শুধু এদের কথায় কেন কান দেবো? আমি শুধু এখানে সেসব বক্তব্য তুলে ধরলাম যা আজ কিছু মুসলিম নারীর মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে। নিজের থেকে কিছু বাড়িয়ে বলিনি। বিষয়বস্তুকে আপনাদের সামনে খোলাসা করাই আমার মূল লক্ষ্য।

এসব কিছুর পর কী হয়? কী হয় পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা, কট্টরপন্থীদের কঠোরতা ও পশ্চাদ্‌গামীদের ফতোয়ার বিরোধিতা করার পর? একজন মুসলিম নারী তাদের চিন্তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, যারা মুসলিমদের চিরশত্রু ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি। কল্পনাপ্রসূত কিছু চিন্তা ও চলচ্চিত্রে তুলে ধরা কিছু মতবাদের প্রতি মুসলিম নারী দুর্বল হয়ে পড়ে। এসবের পেছনে পড়ে নিজের চরিত্র ও শিষ্টাচারের সবকিছুকে খুইয়ে ফেলে। চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা ও নারীর সফলতার চিত্র দেখে সে মনে আনন্দ পায়। অথচ এসবের বাস্তবতা সম্পর্কে সে ওয়াকিফহাল নয়। যদি তাকে কেউ বলে, এগুলো হারাম। তাহলে সে চটে যায়। তাকে নিয়ে উপহাস শুরু করে। তাকে সে কট্টরপন্থী, সংকীর্ণ চিন্তার অধিকারী ও বিবেকের বিরুদ্ধাচরণকারী ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে দেয়। আবারও বলছি, এগুলো আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। যা আমি অনেক মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে দেখেছি।

আচ্ছা, যে সময় ব্যয় করে সে এসব ফিল্ম ও চলচ্চিত্র দেখছে এই সময়টুকু ব্যয় করে কি সে তার রবের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারত না? তার মতে যেহেতু ধর্ম বিশেষজ্ঞরা ভুল ব্যাখ্যা করছে এবং কঠোর মানসিকতা থেকে ফতোয়া দিচ্ছে, সেহেতু সে নিজেই তো ইসলাম শিখতে পারত। নিজেই প্রকৃত ইসলামের অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করতে পারত। তার মতে পুরুষতান্ত্রিকতা, কট্টরপন্থা ও সংকীর্ণ মানসিকতা যেহেতু সঠিক নয়, তাহলে সে তো চাইলে সঠিক বিষয়টি খুঁজে বের করতে পারত। এসব বলতে গেলেই দেখবেন সে আপনাকে বলছে, আল্লাহ আমাকে বিবেক দিয়েছেন। আমি সেই বিবেক দিয়ে চিন্তা করে সমাধান বের করব। তোমাদের কথা আমি মানতে বাধ্য নই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, এই যার মেধা ও চিন্তাধারার অবস্থা, সে পুরুষতন্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত করবে কীভাবে? কীভাবেই বা সে তার রবের বাণী পাঠ করে আমাদের সামনে প্রমাণ করবে, ইসলাম আসলে কী? আমরা দেখছি, এ ধরনের চিন্তার অধিকারী নারীরা শুধু সমালোচনা করতে পারে। কোনো কিছু গড়তে পারে না। তারা শুধু দাবি করে যে, আলিমরা দীনকে বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু নিজেরা সঠিক দীনের সন্ধান কোনো কালেই দিতে পারবে না। এভাবে কোনো দিন বলতে পারবে না যে, ইসলামে এই বিষয়টি হারাম। আর তার দলিল হলো এই। যারা আলিমদের উপর অভিযোগ করতে চান, আমি তাদেরকে বলব, সামর্থ্য থাকলে আপনি তাদেরকে শাস্ত্রীয় জবাব দিন। দলিলের পরিবর্তে দলিলের ভাষায় কথা বলুন। নাকি 'তোমরা কট্টরপন্থী! তোমরা পুরুষতান্ত্রিক!' এসব কথাই সকল কিছুর জবাব? নিজেকে উপাস্য বানাতে চাওয়া মুসলিম নারীরা এটাকে তাদের প্রথম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তারা স্পষ্টভাষায় নিজের ধর্মকে অস্বীকার করার সাহস করে না। কিন্তু নিজেকে উপাস্য বানানো এবং আল্লাহকে উপাস্য বানানোর মাঝে সমন্বয় করতে চায়। প্রবৃত্তির অনুসরণ করা ও দীনি শিক্ষাকে উপেক্ষা করাই তাদের প্রথম কাজ।

দ্বিতীয় পন্থা হলো, আল্লাহর বিধানের উপর আপত্তি। যেমন : আপনি অনেক মুসলিম নারীকে বলতে শুনবেন, কেন পুরুষের জন্য চারটি বিয়ে করা বৈধ? অথচ নারী ইচ্ছে করলে চারটি বিয়ে করতে পারবে না? কোন বিধানের পেছনে কী হিকমত রয়েছে তা জানতে চাওয়া অপরাধ নয়। আপনি যদি মানার জন্য জানতে চান, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি আপনার জানার উদ্দেশ্য হয় নিছক বিরোধিতা, তাহলে আপনার এই প্রশ্ন আপত্তিকর। এ ধরনের প্রশ্নকারী নারীর কাছে আমরা বিনয়ের সাথে জানতে চাইব, আপনি কি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানতে চান? নাকি তাকে আপনার মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করতে চান? যদি তা-ই হয় তবে আপনার মানদণ্ড কতটুকু সঠিক? আপনি কি তাকে পবিত্র ও নির্ভুল প্রমাণ করতে পারবেন? আপনি ধরে নিয়েছেন,

আল্লাহর বিধানের মাঝে পুরুষ ও নারীর সমতা নেই। অথচ আপনি জানেন না যে, আল্লাহর বিধান সমতা করে না। বরং ইনসাফ করে। সমতা কখনো কখনো ভুল ও অবিচারে পরিণত হয়। এরপরও যদি আপনি বলেন, আমাদের বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ নয়, তাহলে আপনাকে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটিকে স্বীকার করতে হবে। আপনাকে হয়তো স্বীকার করতে হবে যে, এটা আল্লাহর বিধান। তবুও আপনি তার উপর আপত্তি তুলছেন। এটিও নিজেকে উপাস্য বানানোর একটি পন্থা। আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রসর হোয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'[৩৭]

আপনি আপনার তথাকথিত সমতার মানদণ্ড দিয়ে আল্লাহ বিধানকে বিচার করতে চাচ্ছেন। আর আপনার প্রবৃত্তিপ্রসূত এই ভুল মানদণ্ডকেই বিবেকের দাবি বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। অথচ এই বিশ্বাসকে আল্লাহ অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াত বলেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

'তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে সুন্দর বিধান আর কে দিতে পারে?'[৩৮]

যদি আপনি এই পথে এগুতে না চান তবে আপনাকে বলতে হবে, এটা আল্লাহর বিধান নয়। বলতে হবে, এটা কিছুতেই আল্লাহর বিধান হতে পারে না। এ কথা বলার পর আমি আপনাকে প্রশ্ন করব, কেন? আপনি বলবেন, এটা আমার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হচ্ছে না। কিন্তু আপনি কেন এটা বিশ্বাস করেন যে, আপনার কল্পিত মানদণ্ডটিই সঠিক? তাতে কোনো ভুল হতে পারে না? তার বিপরীতে যা কিছু আসবে তা ভুল? কিছুতেই আপনার কল্পিত সেই মানদণ্ডকে লঙ্ঘন করা যাবে না? এভাবেই যে আপনি নিজেকে উপাস্যে পরিণত করতে চাচ্ছেন, তা কি আপনি বুঝতে পারছেন?

নিজেকে উপাস্য বানানোর তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহর বিধানকে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে নেয়া। ওয়াহির সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করা। নিজের মেজাজ অনুযায়ী

৩৭. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১
৩৮. সূরা মায়েদা, ৫ : ৫০

তাকে যেকোনো আকার ও রূপ দান করা। এভাবে অনেক মুসলিম নারী নিজের প্রবৃত্তির পিছু ছুটছে। ভাবছেও না যে, এটা তার অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। কিন্তু যদি সে নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করত, তাহলে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পেয়ে যেত। সে আল্লাহর এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত :

﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

'আরেকদল রয়েছে যারা তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। তারা কিছু নেককাজ ও বদকাজকে গুলিয়ে ফেলেছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'[৩৯]

কিন্তু সে কখনোই তার অপরাধের স্বীকারোক্তি দেবে না। বরং প্রকারান্তরে অপরাধকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করবে। এ ধরনের নারীদের কাছে মাদান ইবরাহিম, মুহাম্মাদ শাহরুর ও আলি মানসুর কাইয়ালি প্রমুখ লোকের কথা খুব ভালো লাগবে। কারণ, তারা আল্লাহর বাণীকে তার প্রকৃত অর্থ থেকে বিকৃত করে দেয়। সময়ের দাবি, ইসলামের নতুন পাঠ এসব শিরোনাম দিয়ে তারা উম্মাহর বহু ইজমাকে অস্বীকার করে বসে।

এবার একটু চিন্তা করুন। আসলে এই নারীর কী অর্জিত হলো? সে কি সত্য অনুসন্ধান করার জন্য এসব লোকের বক্তব্যের প্রতি আগ্রহী হলো? নাকি আল্লাহর কিছু বিধান থেকে পালানোর জন্য তাদের পিছু ছুটল? মানুষ হিসেবে তার প্রবৃত্তি রয়েছে। প্রবৃত্তির চাহিদাও রয়েছে। যা চাইলেই সে ত্যাগ করতে পারে না। তাই সে তার প্রবৃত্তিকে বৈধতা দেয়ার পথ খোঁজে। সে এমন কাউকে অনুসন্ধান করে, যে ইসলামের পোশাক পরে এসে তাকে বলবে, তুমি ভুল করছ না। আপনি পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন, উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অনেক নারীভক্ত রয়েছে। বরং তাদের ভক্তদের অধিকাংশই নারী। মুহাম্মাদ শাহরুরের তো নারীবাদী ভক্তের অভাব নেই। বস্তুত নারীবাদ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা। শাহরুর ও তার মতো লোকদের মাঝে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের রসদ খুঁজে পেয়েছে। আর তাদেরকে আরও বেশি সুবিধা করে দিয়েছে শাহরুরদের আলিম ও সংস্কারক ইত্যাদি উপাধি।

---

৩৯. সূরা তাওবা, ৯ : ১০২

নিজের উপাস্য বানানোর চতুর্থ পন্থা হলো সুবিধাবাদ। নারী আল্লাহর ওয়াহি থেকে তার পছন্দমতো বিষয়গুলোকে গ্রহণ করছে। যখন সে এমন কোনো আয়াত শুনতে পাবে, যে আয়াতে নারীদের প্রতি সদাচারের আদেশ করা হয়েছে, তখন সে সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করবে। আর যখন নিজের প্রবৃত্তির বিরোধী কোনো বিধান তার কানে আসবে—তখন হয়তো উপেক্ষা করবে, নতুবা আপত্তি তুলবে, অথবা নিজের ইচ্ছেমতো যেকোনো একটি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালাবে। এ ধরনের আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾

'যখন নিজেদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে দিকে ডাকা হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল উপেক্ষা করে। আর যদি সত্য তাদের পক্ষ হয়, তখন অবনত হয়ে তার দিকে ফিরে আসে।'[৪০]

কী কারণে তারা এমনটি করে? কেন তারা নিজেদের সুবিধামতো আল্লাহর আয়াতকে গ্রহণ করে? আল্লাহ বলেন :

﴿أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

'তাদের অন্তরে কি ব্যাধি রয়েছে? নাকি তারা সন্দেহগ্রস্ত? নাকি তারা আশঙ্কা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবেন? বরং তারাই হলো অবিচারকারী।'[৪১]

তাদের অন্তরের ব্যাধি হলো, এই পরিমাণ প্রবৃত্তির অনুসরণ যে, তা ইবাদত বা উপাসনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আরেকটি ব্যাধি হলো, আল্লাহর ইনসাফ ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা। আল্লাহ তাদের প্রতি ইনসাফ করেননি, এই অনুভূতি ভেতরে ধারণ করা। আয়াত কী বলছে শুনুন :

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

৪০. সূরা নূর, ২৪ : ৪৮-৪৯
৪১. সূরা নূর, ২৪ : ৫০

'মুমিনদের যখন নিজেদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের বক্তব্য থাকে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই হলো সফলকাম।'[৪২]

প্রাসঙ্গিক কারণে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলাইবিব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে এক আনসারী নারীকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিতে পাঠালেন। জুলাইবিব ছিলেন এমন যুবক যার কাছে কেউ কন্যা বিয়ে দিতে আগ্রহী হয় না। ফলে সেই নারীর বাবা-মা অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু মেয়ে তার বাবা-মাকে বলল, তোমরা আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছ? তোমরা আমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে সোপর্দ করে দাও। নিশ্চয় তিনি আমার ক্ষতি করবেন না। এই ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রতি তার ভালোবাসা, সম্মান ও আত্মবিশ্বাস। তখন জুলাইবিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার বিয়ে হলো এবং তার পরিণতিও অনেক সুন্দর হলো।

মুসলিম নারীসমাজে ছড়িয়ে পড়া সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সুবিধাবাদ হলো, মানবতার ধর্ম অনুসরণ করা। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা তাদের চিন্তা, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানের মানদণ্ড নির্ধারণ করে মানবতার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে। যেমন : দয়া ও অন্যের প্রতি সদাচার ইত্যাদি। তাদের মতে, আপনি যখন কোনো মানুষকে মূল্যায়ন করবেন তখন তাকে শুধু মানুষ হিসেবেই মূল্যায়ন করবেন। সে কাফির না মুসলিম তা দেখার বিষয় নয়। বরং ব্যাপারটি আরও বিপরীতমুখী। যদি কারও ব্যাপারে এ কথা জানা যায় যে, সে ধর্মদ্রোহী। অনবরত সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে কটূক্তি করছে। তবুও তাকে কোনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর অধিকার খুবই তুচ্ছ। মানুষের অধিকারই সবচেয়ে বড়। এর মাধ্যমেই তাদের মানুষকে উপাস্য বানানোর মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য তারা দাবি করে যে, তাদের এই চিন্তা কখনোই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। এ জন্য তারা নিজেদের সুবিধামতো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পরস্পরের প্রতি সদাচার ও দয়া প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনামূলক বাণীগুলোকে ব্যবহার করে থাকে। আর ঈমান ও শিরকের সকল বাণীগুলোকে তারা পুরোপুরি এড়িয়ে যায়।

আপনি কি লক্ষ করেছেন, নিজেকে উপাস্য বানানোর এই চিত্রগুলো অনেকাংশেই পশ্চিমা নারীদের সাথে মিলে গেছে? ধারাও সেই চারটি। উপেক্ষা, আপত্তি, ব্যাখ্যা ও

---

৪২. সূরা নূর, ২৪ : ৫১

সুবিধাবাদ। আপনি লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, পশ্চিমা নারী ও মুসলিম নারীর এই কাজের পেছনে মূল কারণ একই। তা হলো, নৈতিক স্খলন ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। একজন মুসলিম নারী যখন তার দীনের শিক্ষাকে উপেক্ষা করছে এবং দীনকে কট্টরপন্থীদের চিন্তা বলে সাব্যস্ত করছে, তখনই সে প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে শুরু করেছে। যখন সে তার দীনের কোনো বিধানের উপর আপত্তি তোলে, দীনকে তার মনমতো ব্যাখ্যা করে এবং দীন থেকে নিজের সুবিধামতো যা খুশি গ্রহণ করে, তখন সে ওয়াহির সুদৃঢ় রজ্জু থেকে নিজের হাত শিথিল করে ফেলে। ফলে সে বাঁধনমুক্ত হয়ে নৈতিকতা হারিয়ে প্রবৃত্তির পিছু ছুটতে থাকে। হয়তো সে আল্লাহর এই আয়াতও শ্রবণ করেছে :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

'হে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৪৩]

অর্থাৎ তোমরা ইসলামের সকল আনুষঙ্গিক বিধিবিধান মেনে নিয়ে তাতে প্রবেশ করো। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। তাহলে সে তোমাদেরকে দব্বের গর্তে নিয়ে ঢুকাবে। ঠিক যেমন তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবরা সেখানে প্রবেশ করেছিল। সে তোমাদেরকে দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নেবে, সারা জীবন তোমাদের বাধ্য হয়ে তার গ্লানি টানতে হবে।

হে মুসলিম নারী, পশ্চিমা নারীরা তো এসবের পেছনে পড়ে নিজের নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু আপনি কেন তা বিসর্জন দেবেন? আপনার ধর্ম তো তার ধর্ম থেকে সুন্দর। আপনার ধর্ম তো তার ধর্ম থেকে অধিক বাস্তবমুখী। তাদের ধর্ম বলে, ঈশ্বর মানুষকে অজ্ঞ রাখতে চান। আর আপনার দীন বলে :

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

'আর তিনি শেখালেন আদমকে সকল কিছুর নাম।'[৪৪]

তাদের ধর্ম বলে, ঈশ্বর হলেন অক্ষম ও ত্রুটিপূর্ণ। অথচ আপনার দীন বলে, আপনার রব পূর্ণতার অধিকারী। তিনি সকল ক্ষমতা, সম্মান, মর্যাদার অধিকারী এবং সৃষ্টিজগতের

---

৪৩. সূরা বাকারাহ, ২ : ২০৮
৪৪. সূরা বাকারাহ, ২ : ৩১

সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। তাদের ধর্ম বলে, ঈশ্বর নারীর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। তাই তাকে সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ আপনার ধর্ম বলে, এসব হলো আপনার মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক। আপনি তার বিনিময়ে আপনার সন্তানদের থেকে এমন মর্যাদা লাভ করবেন, আপনার পায়ের তলায় তাদের জান্নাত থাকবে। পশ্চিমা নারীরা তাদের বিকৃত ধর্মকে বিশ্বাস করে পথভ্রষ্ট হয়। আবার সেই ধর্মকে ত্যাগ করেও পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু আপনি কেন পথভ্রষ্ট হবেন? পশ্চিমা নারীরা যখন আপনার ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে, তখন তারা অভিভূত হয়ে যায়। তারা আপনার ধর্মকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয়। তাহলে আপনি কেন এই মহান আলো থেকে বঞ্চিত হবেন? কেন আপনি আপনার হাতের কাছে আলো থাকতে আঁধারের ধারকদের কাছে আলো সন্ধান করবেন?

আপনি তো মুসলিম নারী। বিশ্বাসী রমণী। আপনার আদর্শ আছে। ব্যক্তিত্ব আছে। আপনি কেন তাদের পিছু পিছু দব্বের গর্তে ঢুকতে যাবেন? আপনি তো সন্তুষ্টচিত্তে আপনার রবের এই আয়াতের সামনে অবনত হবেন :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

'কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য বৈধ নয় যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন তখন সে বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল, সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হলো।'[৪৫]

এবার বলুন, আপনি কি আপনার সত্তা ও চাহিদাকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানাতে চান? নাকি আপনার রবের বিধানকেই সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে চান? আপনি যখন আপনার রবের বিধান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইবেন, তখন জগতের সকল কর্তৃত্ববানরা আপনাকে তাদের কর্তৃত্বের অধীনে আনার চেষ্টায় লিপ্ত হবে। আপনি তখন মহান রবের একজন সম্মানিতা দাসী থেকে হীন চরিত্রের অধিকারিণী মানুষের খেলনা পুতুলে পরিণত হবেন। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার ভেতরে কি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার আদর্শ বিদ্যমান আছে?

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

---

৪৫. সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬

‘আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।’[৪৬]

আপনি কি আপনার ভেতর এই বিনয় ও নিষ্ঠাকে ধারণ করেন? কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে তা স্বীকার করেন? নাকি নিজেকে উপাস্য বানানো সেই মানসিকতা আপনার ভেতর কাজ করে? নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণের কর্তৃত্ব ও পরিবর্তিত ইসলাম কি আপনার পছন্দ?

আমরা যখন বলি, মুসলিম নারী নিজেকে নিজের উপাস্য বানিয়েছে—কথাটি তখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। কারণ, ইসলাম মানেই হলো আল্লাহ ব্যতীত জগতের সকল উপাস্যকে পরিত্যাগ করা। ইসলাম মানেই তো আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর সামনে অবনত হওয়া। নিজের সবটুকু সঁপে দিয়ে তাঁর দাসত্ব করা। যখন আমরা বলি, মুসলিম নারী তার প্রবৃত্তির পিছু ছুটছে—কথাটি তখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। কারণ, ইসলাম মানেই তো প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা।

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

‘আর যে তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করে, জান্নাতই হলো তার ঠিকানা।’[৪৭]

সবশেষে বলতে চাই, নিজেকে উপাস্য বানানোর এই মনোভাব আপনাকে কোন পরিণতির দিকে টেনে নেবে জানেন? এটি কি আপনাকে সুখী করতে পারবে? সম্মান দিতে পারবে? আপনার প্রতি অবিচারকে দূর করতে পারবে? এসব প্রশ্নের উত্তর আপনি তাদের দিকে তাকালেই পেয়ে যাবেন, যারা ইতিমধ্যে নিজেকে উপাস্য বানানোর গর্তে প্রবেশ করেছে। সেই পশ্চিমা নারীকে দেখলেই আপনি তার পরিণতি উপলব্ধি করতে পারবেন। যেসব পশ্চিমা নারী নিজেকে উপাস্যে পরিণত করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে? সে কি আসলেই উপাস্যের মতো সম্মান পেয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব আপনি আমাদের ‘পশ্চিমা নারীর গল্প’ শিরোনামের আলোচনায়ই পেয়ে যাবেন। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন, নিজেকে উপাস্য বানানোর এই চিন্তা কীভাবে তাদেরকে অপদস্থ করেছে। কীভাবে তারা আরও বেশি অপমানের শিকার হয়েছে। যেন আল্লাহর এই আয়াতেরই বাস্তবতা :

---

৪৬. সূরা আনআম, ৬ : ১৬২
৪৭. সূরা নাজিয়াত, ৭৯ : ৪০-৪১

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾

'যে ব্যক্তি আমার স্মরণকে উপেক্ষা করে, তার জন্য রয়েছে সংকটময় জীবন।'[৪৮]

যে আল্লাহর দাসত্বকে উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাতে চায় তার পরিণতি হলো অপদস্থতা। সে পুরুষ হোক, চাই নারী। আল্লাহ বলেন :

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

'আপনি কি দেখেন না, আল্লাহকে সিজদা করে আসমানসমূহে যারা আছে এবং জমিনে যারা আছে তারা সবাই। (সিজদা করে তাকে) সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়, গাছ, প্রাণী ও মানুষের মাঝে অনেকে। আর অনেকের উপর আবশ্যক হয়ে গেছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে অপদস্থ করেন তাকে সম্মানিত করার কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা করেন, যা তিনি ইচ্ছে করেন।'[৪৯]

পশ্চিমা নারী নিজেকে নিজের উপাস্য বানিয়েছে। আল্লাহ দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। ফলাফলস্বরূপ তাকে মানুষেরই দাসত্ব করতে হচ্ছে।

আমাদের এই আলোচনা নারীর আত্মকথা সিরিজেরই একটি অংশ। আমরা চাই নারীর সাথে তার রবের সম্পর্ক আরও সুবিন্যস্ত হোক। সে তার আত্মমর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারুক। চারপাশের মানুষের প্রতি নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হোক। আজকের আলোচনার সারাংশ হলো, কিছুতেই আপনি ওয়াহির বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন না। আল্লাহর রজ্জু থেকে নিজেকে কখনোই শিথিল করবেন না। আল্লাহর বিধানের বাইরে কোথাও সমাধান তালাশ করবেন না। আল্লাহর দাসত্বের মাঝেই আপনি আপনার সম্মান খুঁজে নিন। আল্লাহ বলেন :

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

'যে ব্যক্তি সম্মান চায় সে জেনে রাখুক যে, সকল সম্মান শুধু আল্লাহর জন্য।'[৫০]

---

৪৮. সূরা ত্বহা, ২০ : ১২৪
৪৯. সূরা হজ্জ, ২২ : ১৮
৫০. সূরা ফাতির, ৩৫ : ১০

যারা আপনাকে বলে, আপনি অপদস্থতার মাঝে আছেন; তাদের কথায় কান দেবেন না। যারা আপনাকে বলে, ইসলামের বাইরে আপনার সম্মান রয়েছে; তাদের কথায়ও কান দেবেন না। আপনি আপনার দীন নিয়ে সম্মানের সাথে বাঁচুন। কিন্তু কখনো কখনো আপনি দেখবেন, আপনার মন আল্লাহর কিছু বিধান থেকে পলায়ন করে বেড়াচ্ছে। আপনার মাঝে সেই বিধানগুলোর ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। আপনি অনুভব করবেন যে, নিজের সাথে আপনার বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। আপনি সামগ্রিকভাবে আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের উপর বিশ্বাস রাখেন এবং তাঁর দাসত্ব করেন। কিন্তু তাঁর কিছু বিধানের ব্যাপারে মনের মাঝে খটকা রয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমরা আপনাকে সামনের আলোচনাগুলোতে সহায়তা করার চেষ্টা করব। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের হৃদয় তখন পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। সকল সংশয় ও সন্দেহের চিহ্ন দূর হয়ে বিশ্বাস ও আস্থার স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হবে।

শেষ কথা, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বিধানমতো চলতে বলেছেন। আমাদেরকে তিনি স্বতন্ত্র জীবনবিধান দান করেছেন এবং আহলে কিতাবদের সাথে দবের গর্তে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। তাই তো আমরা প্রতিদিন সালাতে পাঠ করি :

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

'আপনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিশা দিন। তাদের পথের দিশা দিন, যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দান করেছেন। যারা গজবগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথ নয়।'[৫১]

ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা

'পিটার ও জুলি। সুখী দম্পতি। বেশ সুখেই কাটছিল তাদের জীবন। কিন্তু হঠাৎ জুলি বদলে যেতে শুরু করল। পিটারের সাথে সে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করতে লাগল। তার আচরণে পক্ষপাতিত্বের ছাপ ফুটে উঠল। প্রথম প্রথম পিটার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলো না। ভাবল, সাময়িক কোনো কারণে হয়তো জুলির মনমানসিকতা ভালো নেই। কিন্তু জুলির এসব আচরণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল। পিটারের সাথে সে অসম্মানজনক আচরণ করতে শুরু করল। কোনো কারণ ছাড়াই তাদের সম্পর্কে সে তিক্ত করে তুলছিল। বিষয়টি নিয়ে পিটার তার সাথে আন্তরিকতার সাথে আলাপ করল। তাকে তাদের জীবনের সেই সুন্দর

৫১. সূরা ফাতিহা, ১ : ৬,৭

সময়গুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না। জুলির রুক্ষ আচরণ যেন দিনদিন আরও বাড়তে লাগল।

এবার বাধ্য হয়ে পিটার জুলিকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল। তার সাথে নীরস আচরণ করতে লাগল। যাতে জুলি ব্যাপারটি বুঝতে পারে এবং সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। জুলির আচরণ আরও নিচের দিকে নামতে লাগল। পিটারকে একদিন সে মুখের উপর বলে দিলো, আই হেট ইউ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমার ছায়া মাড়াতেও ইচ্ছে হয় না আমার। জুলির আচরণগুলোকে এবার পিটার আর মেনে নিতে পারল না। তাদের দাম্পত্যজীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলল। কারণ, মন থেকে সে জুলির সাথে খারাপ ব্যবহার করতে চায় না। সে তাকে ভালোবাসে। সে চায় না, এখানেই তাদের সম্পর্কের ইতি ঘটুক। তার মনে হয়, জুলি কোনো ঘোরের মাঝে আছে। যেকোনো মূল্যে তাকে এই ঘোর থেকে বের করে আনতে হবে।

একদিন জুলি তার সাথে অনবরত খারাপ ব্যবহার করে যাচ্ছিল। পিটারের পক্ষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সে উঠে জুলির দুই বাহু চেপে ধরে তাকে ঝাঁকুনি দিলো। বলল, থামো জুলি। অনেক হয়েছে। এবার জুলি কেঁদে ফেলল। নিজেকে সে পিটারের বুকে এলিয়ে দিলো। পিটার তাকে সান্ত্বনা দিলো এবং চোখের জল মুছে দিলো। এ ঘটনার পর থেকে জুলি স্থির হয়ে গেল। আবারও তাদের জীবনে সুখের রং ফিরে এল। বাগানে বসন্তের ফুল ফুটল।'

এতক্ষণ আমরা পিটার ও জুলির যে প্রেমময় গল্প শুনছিলাম তা মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ দাম্পত্যজীবনেরই একটি চিত্র্র। নিজেদের মাঝে টুকটাক ঝামেলা মিটিয়ে নেয়ার জন্য ইসলাম এই পন্থাটিই নির্দেশ করেছে। পশ্চিমাদের চিত্রিত আবু জাবাল ও ফাতহিয়ার গল্পটি বস্তুত হলিউডের দেয়ালের আড়ালে তাদের সমাজেরই বাস্তব গল্প। এসব হলো হারাম প্রেমের সম্পর্কের শেষ পরিণতি। মুসলিম বিশ্বের বা মুসলিম সমাজের সামগ্রিক চিত্র কখনোই এমনটি নয়। তবুও মানুষ ও জ্বীন শয়তানের দল রাতদিন ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ ও নব্য জাহিলিয়াতকে সুশোভিত করার কাজে ব্যস্ত। বাস্তবতা অনুসন্ধান করলে যেকোনো বিবেকবান মানুষই বুঝতে পারবেন যে, তারা ইসলামকে যেভাবে উপস্থাপন করছে বাস্তবতা তার পুরো উল্টো এবং তাদের তৈরি করা চিত্র পুরোপুরি বিপরীত। তাই আমরা আজ মুসলিম স্বামী-স্ত্রীদেরকে সজাগ করতে চাই। পশ্চিমাদের বিকৃত অপপ্রচারের জবাব দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের চরিত্র ও শিষ্টাচারকে

অন্য কোনো জাতির সাথে তুলনা দেয়াও আমাদের লক্ষ্য নয়। তবে আমরা যদি তুলনা করার কাজটি শুরু করি, তবে আজকের পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে উত্তম ও চরিত্রবান কোনো জাতির সন্ধান পাওয়া যাবে কি না আমার জানা নেই। আজকের আলোচনায় আমরা শুধু সঠিক ইসলামি মানদণ্ড নির্ধারণ করার চেষ্টা করব। তাহলে আমাদের দীনের সৌন্দর্য আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। তার আলোকে আমরা আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারব। পশ্চিম বা পূর্বের কারও অনুকরণ আমাদের করতে হবে না। দিনশেষে আমরা আমাদের রবের কিতাব ও নবীর সুন্নাহয় সকল সমাধান পেয়ে যাব।

তাই আসুন আমরা নিজেদের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করি। মিডিয়া ও অপসংস্কৃতির সয়লাবে আমাদের মাঝে যে অধঃপতন শুরু হয়েছে তাকে বন্ধ করি। বিভিন্ন অবাস্তব ফিল্ম আর মিউজিক আমাদের মাঝে জীবন নিয়ে যে অবাস্তর ধারণ তৈরি করেছে তাকে দূর করি। আসুন আমরা জানতে চেষ্টা করি, ইসলাম কী? আর জাহিলিয়াত কী? তাই আমাদের আজকের শিরোনাম 'নারীর প্রতি সহিংসতা'।

ইসলামের মানদণ্ড কুরআনের আয়াত আর রাসূলের সুন্নাহর মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা সেটি নিয়েই কথা বলব। আজকের পৃথিবীতে বসবাসরত সেসব মুসলিমকে নিয়ে আমরা কথা বলব না, যারা সেই মানদণ্ড থেকে দূরে সরে গেছে। ইসলাম বলছে :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচার করো।'[৫২]

আপনার রব আপনাকে স্ত্রীর সাথে সদাচারের আদেশ করছেন। তার সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। সদাচার বলতে কী বোঝায়? আসুন আমাদের মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করি। যিনি তার মহান স্বামী সম্পর্কে বলেছিলেন, তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন। আসুন সেই মহান নারী থেকেই উত্তর জেনে নিই, যাঁর জীবন ছিল সদাচারে পরিপূর্ণ। যার কিছু অংশ আমরা গত পর্বে উল্লেখ করেছি।

আপনি স্ত্রীকে নিজ হাতে খাইয়ে দেবেন। এটা সুন্নাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلى فى امْرَأَتِكَ

৫২. সূরা নিসা, ৪ : ১৯

'তুমি যা কিছু খরচ করবে তার প্রতিদান লাভ করবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও তার প্রতিদানও তুমি লাভ করবে।'[৫৩]

একই গ্লাস থেকে আপনি ও আপনার স্ত্রী পাইপ দিয়ে জুস পান করেছেন? আপনার নবীও এমন কিছু করতেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় যখন কোনো পাত্র থেকে পানি পান করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে পাত্রটি নিয়ে পানি পান করতেন এবং পাত্রের যে অংশে তিনি মুখ লাগিয়ে পান করেছেন সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। নীরস ও শুষ্ক পারিবারিক সম্পর্ক ইসলামের দাবি নয়। অনেক স্বামী-স্ত্রী যেমন দায়সারা পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করেন, তা ইসলামের চাহিদা-বর্হিভূত। তাই যখন আপনি ইসলামকে বিবেচনা করবেন, তখন কুরআন ও সুন্নাহয় যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সে হিসেবে বিবেচনা করুন। মুসলিমদের অবস্থা দেখে নয়। ইসলাম বলে :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'স্ত্রীদের উপর যেমন সদাচার করা কর্তব্য ঠিক তেমনই সদাচার তাদের প্রাপ্য।'[৫৪]

আপনার যেমন আপনার স্ত্রীর কাছে সচাদার পাওয়ার অধিকার আছে, তেমনিভাবে তারও আপনার কাছে সদাচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তিনি যেমন আপনার জন্য সাজেন, আপনার পছন্দ ও অপছন্দ বিবেচনা করেন—আপনাকেও তেমনটি তার জন্য করতে হবে। এটাই হলো দাম্পত্যজীবনের মূলনীতি।

কোনো একজন স্ত্রী স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করল। ইসলাম তখন স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে সে ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করে এবং তার হৃদয়কে প্রশস্ত করে। কুরআন বলছে :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সচাদার করো। যদি তাদের কোনো কিছু তোমাদের অপছন্দ হয়, তাহলে মনে রেখো, হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করো, অথচ তার মাঝে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।'[৫৫]

---

৫৩. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৭৩৩
৫৪. সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৮
৫৫. সূরা নিসা, ৪ : ১৯

কিন্তু না, এই নারী তার স্বামীকে মেনে নিচ্ছে না। সে চাচ্ছে তার ঘর ভেঙে দিতে। স্বামী বলল, তুমি কী চাও? সে বলল, আমি তোমাকেই চাই না। ইসলাম বলে, তবে তুমি তার থেকে মুক্ত হয়ে যাও। স্বামী স্ত্রীকে তার মোহর বা মোহরের কিছু অংশ ফিরিয়ে দিক। তারপর বিচ্ছেদ হয়ে যাক। বিয়ে তো কোনো জেলখানা নয় যে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কিন্তু একজন নারী স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ চায় না। তবে জীবনকে সে দিনদিন কঠিন করে তুলছে। স্বামী এখন ইচ্ছে করলে তার হাতে নিজেকে তালাক দেওয়ার অধিকার অর্পণ করতে পারে। স্ত্রী চাইলে এই তালাকটি নিজের উপর প্রয়োগ করতে পারে। তবে এর জন্য আরও বিস্তারিত কিছু শর্ত রয়েছে। যা মূলত সমাধানের উদ্দেশ্যে; প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়।

কেউ যদি তালাক দিতে চায়, ইসলাম বলে, তার তালাকটিও ইনসাফের সাথে হতে হবে। কুরআন বলছে :

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

'তালাক দুইবার। তারপর হয়তো সদাচারের সহিত সংরক্ষণ করা বা ইনসাফের সহিত ত্যাগ করা।'[৫৬]

অর্থাৎ নারীর সাথে আচরণ হয়তো সদাচার হবে; নতুবা হবে ইনসাফ। যেমনটি আরেক আয়াতে বলা হয়েছে :

﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

'তাদেরকে মুতআ দাও ও সুন্দরভাবে বিচ্ছেদ করে দাও।'[৫৭]

ইসলাম সকল ক্ষেত্রেই সুন্দর। এমনকি বিবাদের সময়ও ইসলাম সুন্দর। স্ত্রী যদি আপনার প্রতি জুলুম করে বা অসদাচরণ করে তবুও এই সম্পর্কের মাঝে আপনাকে ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। সুন্দরভাবে আপনাকে সম্পর্কটির সমাপ্তি ঘটাতে হবে। দুঃখজনক হলো, মুসলিমদের মাঝে এখন অসুন্দর তালাকের চিত্র অনেক বেড়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী বা উভয়ের পরিবার, কেউই সদাচার ও ইনসাফের ব্যাপারটি তোয়াক্কা করছে না। হতে পারে যেকোনো কারণে আপনারা সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছেন না। কিন্তু আপনাদেরকে আল্লাহর এই আয়াত স্মরণ রাখতে হবে :

---

৫৬. সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৯
৫৭. সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৯

﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾

'তোমরা নিজেদের মাঝে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেয়ো না।'[৫৮]

অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে কাটানো সুন্দর স্মৃতিগুলো স্মরণ করুন। আপনার সন্তানদের প্রতি তার ইহসানের কথা স্মরণ করুন। ভেবে দেখুন, তার বিদায়ের পর আপনার সংসার কেমন মৃত্যুপুরী হয়ে উঠবে। সন্তানরা ঘরছাড়া হয়ে যাবে। তারা মাতৃস্নেহ হারাবে। ধীরে ধীরে খারাপ পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে। এমনকি ঘরকে বিরান করে দেয়ার পর আপনি নিজেও আফসোস করতে থাকবেন। তাহলে ইসলাম এখানে কী সমাধান দিয়েছে?

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

'সৎকর্মশীলা রমণী সে, যে অনুগত এবং আল্লাহ যে গোপন বিষয় সংরক্ষণ করতে বলেছেন তার ব্যাপারে যত্নবান। আর যাদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো—তাদেরকে উপদেশ দাও, বিছানায় পরিত্যাগ করো এবং প্রহার করো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের উপর বাড়াবাড়ির কোনো রাস্তা তালাশ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সুউচ্চ ও মহান।'[৫৯]

এটাই মূলনীতি। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন এমনই। নারী যখন নিজেকে ও ঘরকে সংরক্ষণ করবে তখন সে সম্মানিতা। কিন্তু কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাও ঘটবে। তাই পরবর্তী কথাটুকু বলা হলো, 'আর যাদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো'। এই অবাধ্যতা এমনও হতে পারে, যার পরিণাম ভয়ংকর। যার ফলে গুঁড়িয়ে যেতে পরিবারের ভিত্তি। আর পরস্পর অসম্মানবোধ ও অসহযোগিতা তো রয়েছেই। তাহলে সমাধান কী? 'তাদেরকে উপদেশ দাও।' শুরুর গল্পে আপনারা দেখেছেন, পিটার জুলিকে কীভাবে বুঝিয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে উপদেশ দেবে এবং তাকে আল্লাহর অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় পন্থাটি কাজে নাও দিতে পারে। তাই পরবর্তী সমাধান, 'তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ করো'। এতে স্ত্রী নিঃসঙ্গবোধ করবে। তার মানসিকতায় প্রভাব পড়বে। হতে পারে এতটুকুতেই

৫৮. সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৭
৫৯. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪

সে তার ভুল বুঝতে পারবে এবং শুধরে যাবে। কিন্তু এতেও যদি কোনো কাজ না হয়, তাহলে কী সমাধান? 'তাদেরকে প্রহার করো।' প্রতিশোধের জন্য? না। এ জন্য প্রহার করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এই প্রহারেরও অনেক নিয়ম, আদব, ইনসাফ ও সৌন্দর্য আছে। ঠিক যেমনটি তালাকের ক্ষেত্রে আছে। এ ক্ষেত্রে আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি জানা থাকতে হবে,

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

'নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপর ইহসান আবশ্যক করে দিয়েছেন।'[৬০]

সকল কিছুর উপর যেহেতু ইহসান আবশ্যক সুতরাং বাধ্য হয়ে যে প্রহার আপনি করবেন তাতেও ইহসান থাকতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

ما كان الرِّفْقُ فِى شَىْءٍ إِلَّا زانَه، ولا نُزِعَ من شَىْءٍ إِلَّا شانَه

'যে বস্তুর মাঝে নম্রতা থাকে সে তাকে দামি বানিয়ে দেয়। আর যে বস্তু থেকে নম্রতা ছিনিয়ে নেয়া হয় তা নিকৃষ্ট হয়ে যায়।'[৬১]

তাই বাধ্য হয়ে করা আপনার এই প্রহার অবশ্যই নম্রতার সাথে হতে হবে। তাহলে এই প্রহারের আদব কী? কী তার বাস্তবতা? সদাচারপূর্ণ ও নম্র প্রহারের চিত্রই বা কেমন? প্রথমত আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের মাঝে স্ত্রীর সাথে সদাচার করার বহু দৃষ্টান্ত পেয়ে যাবেন। কিন্তু স্ত্রীকে প্রহার করার কোনো দৃষ্টান্ত পাবেন না। কারণ, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনামতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় নিজের হাত দিয়ে কোনো স্ত্রীকে কখনো আঘাত করেননি। এমনকি কোনো খাদিমকেও তিনি আঘাত করেননি এবং কোনো কিছুকেই তিনি প্রহার করেননি। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় ভিন্ন কথা। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রহারের জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে সীমারেখাগুলোকে লঙ্ঘন করা হারাম। কিন্তু হলিউডের দেয়ালের আড়ালে গিয়ে আপনি যদি পশ্চিমাদের বাস্তব জীবনের চিত্র দেখেন, বাস্তব পিটার আর জুলিদের দেখেন এবং মুসলিম বিশ্বের দীনবিমুখ আবু জাবালদের জীবনাচার দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি হলেই তারা তার চেহারার উপর চড় বসিয়ে দেয়। চড়ের আঘাতে স্ত্রীর কান তব্দ হয়ে যায়। অথচ ইসলামে যেকোনো ব্যক্তিকে চেহারা ও তার আশেপাশে

---

৬০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৯৫৫

৬১. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ২৪৭৮

আঘাত করা নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ولا تضربِ الوجهَ، ولا تُقبِّحْ، ولا تهجُرْ إلا في البيت

'আর তোমরা চেহারায় আঘাত কোরো না। গালমন্দ কোরো না। আর ঘরের বাইরে কোথাও পরিত্যাগ কোরো না।'[৬২]

চেহারা সম্মানিত স্থান। তোমার প্রহারের উদ্দেশ্য তো তাকে অপমান করা নয়। বরং তুমি তাকে প্রহার করবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে। তাকে তার ভুল থেকে সংবিৎ ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। ولا تُقبِّحْ, 'গালমন্দ কোরো না'। বোলো না যে, আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করে দিন। এটাও নিষিদ্ধ। আপনি তাকে গালমন্দ বা অভিশাপ দিতে পারবেন না। ইসলাম যদি এতটুকুই নিষিদ্ধ করে দেয় তবে যারা স্ত্রীকে তার মা-বাবার দিকে সম্পৃক্ত করে গালমন্দ করে, বিশ্রী ভাষায় যাচ্ছেতাই বলে যায়—তার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? এ ধরনের আচরণ থেকে ইসলাম পবিত্র।

আয়াতের যে প্রহারের কথা বলা হলো তা কোনো নিয়ন্ত্রণহীন মানুষের প্রহার নয়। বরং তা একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিভিন্ন সীমারেখা মেনে নম্রতা ও সদাচারের সহিত প্রহার। তারপর হাদিসে বলা হলো, 'বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও পরিত্যাগ কোরো না'। অর্থাৎ আপনার জন্য তাকে বাড়ি ছাড়ার শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। সে আপনার সাথে যতই বাজে ব্যবহার করুক না কেন আপনি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারেন না। এ ছাড়াও এখানে আরও কিছু কল্যাণ রয়েছে যা আপনাদের সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখবে। আপনি যদি তাকে ঘর থেকে বের করে দেন, তবে তার মাঝে একাকিত্ব তৈরি হবে এবং বিবাদ আর বেশি দূরে গড়াবে। আচ্ছা, তাহলে তাকে সংশোধনের জন্য কোনো কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা প্রহার করা যাবে? না। কখনোই না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

'তবে যদি তারা স্পষ্ট কোনো অশ্লীল কাজ করে তাহলে তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ করো এবং অযন্ত্রণাদায়ক প্রহার করো। তারপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কোনো রাস্তা তালাশ কোরো না।'[৬৩]

---

৬২. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ২১২৪

৬৩. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ৩০৮৭

মোটকথা, চেহারায় প্রহার করা নিষিদ্ধ। গালমন্দ ও অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ। যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করা নিষিদ্ধ। উত্তেজিত অবস্থায় ও নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় প্রহার করা নিষিদ্ধ। তাহলে আর কী অবশিষ্ট রইল? অবশিষ্ট রইল, এটি প্রতিশোধের জন্য নয়। কষ্ট দেয়ার জন্যও নয়। তাহলে কিসের জন্য? উদ্দেশ্য একটাই। যাতে স্ত্রী সঠিক অবস্থানে ফিরে আসে এবং নিজের অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করে। যদি এই উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়ে যায়, তবে কি স্বামীর জন্য এ ধরনের আচরণ অব্যাহত রাখা বৈধ? সে কি চাইলে পিটার যেমন জুলির বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল তেমনটি করতে পারে? না। তার জন্য সেই বৈধতা নেই। কারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। কুরআন বলছে :

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

'যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তোমরা তাদের ব্যাপারে আর কোনো রাস্তা তালাশ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সুউচ্চ ও মহান।'[৬৪]

যখনই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেল তখন থেকেই আপনার আর তার গায়ে হাত তোলার অধিকার নেই। আপনি স্মরণ রাখুন, আল্লাহ সুউচ্চ ও মহান। তিনি আপনার কাছ থেকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। দিনশেষে সদাচার, ইনসাফ, উত্তম আচরণ ও কোমল ব্যবহারই অবশিষ্ট রইল। যেমনটি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কোমলতার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো কুরআন ও সুন্নাহর দলিল-নিঃসৃত। প্রশ্ন হলো, পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণ কি বিষয়গুলোকে এমনই বুঝেছিলেন? আমার পক্ষে সম্ভব আপনাদের সামনে এমন বহু গ্রহণযোগ্য আলিমের মতামতকে তুলে আনা, যারা স্ত্রীকে প্রহার করাকে হারাম বলেছেন। তবে তা সকল আলিমের মতামত ছিল না। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে ইসলামের একপেশে ব্যাখ্যা দেয়া আমাদের মানহাজ নয়। ইসলামের একটি দিককে সামনে তুলে এনে অপর দিকটিকে এড়িয়ে যাওয়া আমরা বৈধ মনে করি না। তাই এখানে আমরা এমন কিছু আলিমের মতামতকে পেশ করতে চাই যাদের মতামত অধিকাংশ আলিমের মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা বিভিন্ন মাযহাবের গ্রহণযোগ্য ফকিহ।

মালিকি ফকিহ ইবনু শাস রহিমাহুল্লাহ 'আকদুল যাওয়াহির' গ্রন্থে বলেন, যদি স্বামী ধারণা করে যে, কঠিন প্রহার ছাড়া স্ত্রী অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসবে না, তাহলে তার

৬৪. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪

জন্য স্ত্রীকে কোনোভাবেই প্রহার করা বৈধ নয়। অর্থাৎ তাকে সামান্য আঘাতও করবে না। কঠিন প্রহারও করবে না। কারণ, বিষয়টি শাস্তি বা প্রতিশোধের জন্য নয়। বরং ভুল থেকে ফিরে আসার জন্য। যদি তার সম্ভাবনাই না থাকে, তবে প্রহার করা অনর্থক। তখন তাহলে কী সমাধান? ইসলাম এখানেও সমাধানের পন্থা বাতলে দিয়েছে :

﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾

'প্রেরণ করো পুরুষের পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং নারীর পরিবার থেকে একজন বিচারক।'[৬৫]

তারপর হয়তো তালাক হবে অথবা খুলা হবে। কিন্তু মারপিট হবে না। যখন শরিয়তসম্মত প্রহার অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে তখন প্রহারের আর কোনো উপকারিতা নেই।

মালিকি ফকিহ ইবনু আরাফাহ 'আশ-শারহুল কাবির' গ্রন্থে বলেন, যদি স্বামী নিশ্চিত হয় বা ধারণা করে যে, স্ত্রীকে বিছানায় পরিত্যাগ করেও কোনো ফলাফল আসবে না, তাহলে তাকে প্রহার করতে পারে। তবে তার প্রবল ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রহারে যদি কাজ হয়, তবে প্রহার করতে পারে। শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে প্রহার করতে পারবে না। অর্থাৎ স্বামী যদি নিশ্চিত হয় বা প্রবল ধারণা করে যে, প্রহার করলে ফলাফল ভালো হবে, তবে সে প্রহার করবে। সন্দেহগ্রস্ত হলে করবে না। এই হলো মালিকি মাযহাবের মতামত।

হাম্বলি ফকিহ বুহুতি রহিমাহুল্লাহ 'কাশফুল কিনা' গ্রন্থে বলেন, উত্তম হলো, ভালোবাসা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে প্রহার না করা। অর্থাৎ স্ত্রী যদি প্রহারের উপযুক্তও হয়, তবুও ভালোবাসা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে তাকে প্রহার না করাই উত্তম।

শাফিঈ ফকিহ ইবনু হাজার হাইতামি রহিমাহুল্লাহ 'তুহফাতুল মুহতাজ' গ্রন্থে বলেন, যদি জানা যায় যে, প্রহারে কোনো কাজ হবে না, তাহলে প্রহার করা হারাম। অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রহারটিকে শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে প্রহার হিসেবেই দেখেছেন। তার উদ্দেশ্য একটিই। আর তা হলো ভুল থেকে ফিরে আসা। যাতে পরিবার টিকে থাকে এবং দাম্পত্যজীবন স্বাভাবিক থাকে।

যদি স্ত্রী আবারও ভুল করে, তাহলে কী করণীয়? যদি সে শুধু স্বামী নয়, বরং আল্লাহর হকও নষ্ট করে, তবে কী করতে হবে? ইবনু হানি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহকে এমন স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যে সালাত আদায় করে না।

---

৬৫. সূরা নিসা, ৪ : ৩৫

স্বামী কি তাকে প্রহার করবে? ইমাম বললেন, হ্যাঁ, তাকে অযন্ত্রণাদায়ক প্রহার করবে। হতে পারে এতে তার পরিবর্তন হয়ে যাবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে আল্লাহর হকের ব্যাপারে সতর্ক করতে চায় তবে এই বিধান। বরং, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান সালাতের ক্ষেত্রে সতর্ক করতে এই বিধান। এতটুকু আসার পর আপনি হয়তো বলবেন, অনেক স্বামীই স্ত্রীকে আবু জাবালের মতো প্রহার করে। আমি আপনাকে হাজারবার বলব, বাস্তবতা এমন নয়। এগুলো পশ্চিমারা আবিষ্কার করেছে মুসলিমদেরকে তাদের দীন থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। শরিয়ত কখনোই স্ত্রীকে ওভাবে প্রহার করার আদেশ করেনি। আপনি বলবেন, শরিয়ত তো কোনো না কোনোভাবে প্রহার করার অনুমতিই দিচ্ছে। স্বামীরা সুযোগ পেয়ে শরিয়তের এই বিধানের অপব্যবহার করছে। আমি আপনাকে বলব, নারীর প্রতি সহিংসতা অতীত ও বর্তমান সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন জাহিলিয়াত ও নব্য জাহিলিয়াত উভয় যুগেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। পশ্চিম ও পূর্ব সবখানেই তার অবস্থান। বস্তুগত উন্নত ও অনুন্নত উভয় প্রকার সমাজেই তাকে আপনি খুঁজে পাবেন। যার বাস্তব চিত্র খুবই ভয়ংকর ও বীভৎস। কিন্তু ইসলাম এসে তাকে মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করে দিলো এবং শুধু অপারগতার ক্ষেত্রে তাকে সীমাবদ্ধ করে দিলো। প্রতিশোধ, কঠোরতা, শত্রুতা ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য থেকে তাকে মুক্ত করে শুধু ভুলের মাঝে থাকা অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দিলো। এ পরিস্থিতিতে প্রহারের জন্যও বিভিন্ন শর্ত ও নিয়ম জুড়ে দিলো। জুলি ও পিটারের গল্পের মতো প্রহারকে কোমলতা ও ইনসাফের প্রহারে পরিণত করল।

এখানে এসে আপনি বলতে পারেন, প্রহারের কী দরকার আছে? প্রয়োজনে তালাক দিয়ে দেবে। আমি বলব, আপনি নব্য জাহিলিয়াত দ্বারা প্রভাবিত। যা চায় পরিবারব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে। ঘর থেকে পুরুষ ও নারীকে বিমুখ করে দিতে। যার ফলে সন্তানরা অবহেলায় বড় হবে। স্নেহ ও শিষ্টাচার থেকে বঞ্চিত হবে। ব্যভিচার ও অবৈধ যৌনাচার ছড়িয়ে পড়বে। এ সুযোগে তারা অর্থনৈতিক মুনাফা লুটবে এবং আদর্শহীন আগামী প্রজন্মের গলায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণের লাগাম পরিয়ে দেবে।

আপনি বলতে পারেন, তাহলে কি স্ত্রী শুধু সহ্য করবে? স্বামী যদি প্রহারের ক্ষেত্রে সব নিয়ম ও শর্ত লঙ্ঘন করে, যদি তার চেহারায় আঘাত করে, তাকে গালমন্দ করে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করে এবং তার পরিবারকে গালমন্দ করে—এ সবকিছুই কি তাকে মেনে নিতে হবে? তার অধিকার বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না? আমরা কি শুধু নারীকে এ কথা বলেই সান্ত্বনা দেবো যে, আখিরাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে? না বন্ধু, এমনটি নয়। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় নারীর অধিকার কোথাও ক্ষুণ্ণ হবে না। না দুনিয়ায়,

না আখিরাতে। ইসলামি আইন এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করবে। ইসলাম এই ব্যাপারটিকে শুধু স্বামীর তাকওয়ার উপর ছেড়ে দেয়নি। বরং যদি কোনো স্বামী কোনো স্ত্রীর উপর অবিচার করে তবে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সেও দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। ইসলাম কখনোই অনর্থক স্ত্রীকে প্রহার করার বৈধতা দেয়নি। যদি কোনো ডাক্তার চিকিৎসা করতে গিয়ে অবহেলা করে এবং রোগীর ক্ষতি করে ফেলে, তাহলে আমরা বলি না, চিকিৎসাশাস্ত্রের পুরোটাই ভুল। বরং এই ডাক্তারকে তার অবহেলার কারণে শাস্তি পেতে হয়। আর চিকিৎসাশাস্ত্র আপন স্থানেই বহাল থাকে। এ ক্ষেত্রেও এমনটিই হবে।

আল্লামা ইবনু হাযম 'মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে, তবে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ স্বামী যদি অন্যায়ভাবে প্রহার করে, তবে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে এবং সে যেমন তার স্ত্রীকে প্রহার করেছে তাকেও তেমন প্রহার করা হবে।

আহমাদ আদ-দারদি মালিকি 'শারহুল কাবির' গ্রন্থে বলেন, স্ত্রীকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করার বৈধতা নেই; যদিও স্বামী নিশ্চিত হয় যে, তা ছাড়া স্ত্রী অবাধ্যতা ত্যাগ করবে না। তারপরও যদি স্বামী তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করে, তবে তার জন্য স্বামীর থেকে বিচ্ছেদ ও কিসাস গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এই কথাটি কার ব্যাপারে বলা হলো? অবাধ্য ও অসদাচারী নারী সম্পর্কে। তাকেও যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করার বৈধতা নেই। যদি স্বামী এমনটি করে তবে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তাকে গ্রেফতার করবে এবং সে যেভাবে আঘাত করেছিল তার থেকেও সেভাবে কিসাস গ্রহণ করা হবে। আর স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছেদের ইচ্ছাধিকার দেয়া হবে।

স্বামী স্ত্রীকে অযন্ত্রণাদায়ক প্রহারই করল। কিন্তু তার প্রহারটি যদি অন্যায়ভাবে হয়? যদি প্রহার করার মতো কিছু বাস্তবে ঘটে না থাকে, তাহলে কী করার? মালিকি ফকিহ দাসুকি বলেন, যদি স্ত্রীর উপর স্বামীর অবিচার প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাকে ভর্ৎসনা করবেন। তারপর প্রহার করবেন; যদি স্ত্রী স্বামীর থেকে তালাক না চেয়ে থাকে। বরং তাকে সংশোধন করে তার সাথেই থাকার ইচ্ছে পোষণ করে। অর্থাৎ স্ত্রী বিচারকের কাছে গিয়ে বলল, আমার স্বামী আমাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছে। বিচারক তখন তার কথার সত্যতা যাচাই করবেন। যদি তিনি তার কথা সঠিক পান, অর্থাৎ যদি প্রমাণিত হয় যে, স্বামী স্ত্রীর সাথে সদাচার করে না এবং শরয়ি মানদণ্ড রক্ষা করে না। স্ত্রীকে সে বলে, আমি তোমার স্বামী, তাই তোমার উপর আমার অধিকার রয়েছে। বস্তুত সে জানেই না, তার অধিকার কী আর স্ত্রীর অধিকার কী? দীন তাকে এ ব্যাপারে কী বলে? এ পরিস্থিতিতে বিচারক স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কি আপনার স্বামী থেকে পৃথক

হয়ে যেতে চান? স্ত্রী যদি বলে, না, আমি তার সাথে থাকতে চাই। কিন্তু আমি চাই যে, তার বিচার হোক। কারণ, সে আমার উপর জুলুম করেছে। বিচারক তখন স্বামীকে সতর্ক করে দেবেন এবং ভর্ৎসনা করবেন। তারপর তাকে প্রহার করবেন এবং বলে দেবেন, স্ত্রীকে প্রহার করার আগে দীনের বিধানকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং মনে রাখুন যে, যাকে আপনি প্রহার করছেন তিনি আপনার স্ত্রী। স্ত্রীর সাথে যে এমন আচরণ করে সে প্রকৃত সুপুরুষ নয়।

যদি স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে আর উভয়েই উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তখন কী হবে? দাসুকি রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে আর স্ত্রী দাবি করে যে, তাকে শত্রুতাবশত মারা হয়েছে আর স্বামী দাবি করে যে, সে শিষ্টাচারের জন্য প্রহার করেছে—তখন স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। বিচারক তখন স্বামীকে শত্রুতাবশত প্রহার করার শাস্তি দেবেন। অর্থাৎ যদি প্রমাণিত হয়, স্বামী প্রহার করেছে আর স্বামী বলছে, আমি তাকে একটি ভুলের কারণে শিষ্টাচার শিখাতে প্রহার করেছি। অন্যদিকে স্ত্রী বলছে, সে আমার উপর জুলুম করেছে। তাহলে স্ত্রীর কথাই সত্যায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ীই ফয়সালা করা হবে। তবে এই মাসআলাটিতে মতভেদ রয়েছে। আব্দুস সালাম সাহনুন মালিকি বলেন, এই পরিস্থিতিতে তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেয়া হবে। যদি প্রমাণিত হয়, স্বামী প্রায়ই স্ত্রীর প্রতি অবিচার করে, তাহলে স্বামীকে বন্দী করে শাস্তি দেয়া হবে। হানাফি ফকিহ আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহিমাহুল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন, স্ত্রী যদি অভিযোগ করে যে, তার স্বামী তাকে প্রহার করে, তাহলে স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত হয় যে, স্বামী তাকে নেককার প্রতিবেশীদের পাশে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। যাতে তারা সাক্ষী থাকতে পারে। তারপরও যদি স্বামীর অবিচার প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাকে শাস্তি দেবেন। অর্থাৎ স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তার বাসস্থান পরিবর্তন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। মালিকি ফকিহ মুহাম্মাদ ইবনু জামাল খারসিও 'শারহু খালিল' গ্রন্থে কাছাকাছি মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যদি স্বামী স্ত্রীকে নিয়মিত যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করে, তাহলে তার অধিকার রয়েছে নিজেই নিজের উপর এক তালাক পতিত করার। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

'ক্ষতি করবেও না। ক্ষতি সইবেও না।'[৬৬]

---

৬৬. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ২৩৪০

এতটুকু শোনার পর একদল ধর্মদ্রোহী বলতে শুরু করবে, ইসলামের ইতিহাসে ফিকহ সব সময় পুরুষতান্ত্রিক ছিল। পুরুষের পক্ষেই তা কথা বলেছে। ইসলামি ফিকহকে তাই নতুন করে সম্পাদনা করা আবশ্যক। আপনি এসব লোকদের পাল্টা প্রশ্ন করুন, উল্লেখিত আলিমদের বক্তব্যের মাঝে কোনটি পুরুষতান্ত্রিক আর কোনটিতেই বা নারীর প্রতি ইনসাফের নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে?

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে অনেক কিছুই গোপন থাকে। সবকিছুই তারা ইসলামি রাষ্ট্রকে জানাতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক। আর প্রহার করার ব্যাপারটি বরং অস্বাভাবিক। মুসলিম পুরুষরা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর। স্ত্রীদের ব্যাপারে দয়াবান। আর যদি কখনো কোনো সমস্যা হয়েই যায়, তাহলে মূলনীতি হলো :

﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾

'প্রেরণ করো স্বামীর পরিবার থেকে একজন ফয়সালাকারী এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন ফয়সালাকারী।'[৬৭]

সমস্যা যতই বড় হোক না কেন এই পন্থায় তার সমাধান করা খুবই সহজ। কারণ, প্রতিটি পরিবারেই কোনো না কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই থাকবেন। ইসলাম এভাবেই ধাপেধাপে সব সমস্যার সমাধান দিয়েছে। কারও প্রতি অবিচার সংঘটিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি। স্বামী যদি আল্লাহকে ভয় না করে তবে স্ত্রীকে শুধু তার দয়ার ভিখারি করে রাখেনি। আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষার আদেশ করেন; আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দকাজ ও জুলুম থেকে।' (সূরা নাহল, ১৬ : ৯০)

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

'আপনার প্রতিপালকের কালিমা পরিপূর্ণ—সত্য ও ইনসাফ দ্বারা।'[৬৮]

---

৬৭. সূরা নিসা, ৪ : ৩৫
৬৮. সূরা আনআম, ৬ : ১১৫

প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা তো ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করি না যে, আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়ন করব? এখানে যদি স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে, তাহলে তো স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হবে। এ কথাটি শতভাগ সঠিক। কিন্তু আমাদের উচিত ইসলামের এই বিধানগুলোকে ভালো করে আত্মস্থ করা। ইসলাম কোনো অবস্থাতেই জুলুমকে সমর্থন করে না। ইসলাম কখনোই নারীর প্রতি অবিচার করেনি। অবিচার করেছে জাহিলিয়াত। সেই জাহিলিয়াত যা এখনো আমাদের সমাজে বিদ্যমান আছে। তারা নারীর প্রতিও অবিচার করেছে, আল্লাহর শরিয়তের উপর অবিচার করেছে। শরিয়তের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যকে তারা বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। তারা চায় আল্লাহর শরিয়ত বিধান হিসেবে কোথাও প্রতিষ্ঠিত না হোক।

প্রিয় বোন, বুঝতে চেষ্টা করুন। ইসলাম আপনাকে প্রহার করার কথা বলেনি। যে প্রহারে আপনি কষ্ট পাবেন, আঘাতপ্রাপ্ত হবেন—ইসলাম তার বৈধতা দেয়নি। আপনার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়নি। আপনাকে গালমন্দ করার অধিকারও দেয়নি। বরং এগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে নব্য জাহিলিয়াতের দোসরা। ইসলাম আপনাকে তা থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছে। আপনি ও মুসলিম বিশ্বের বহু নারী যে আচরণের শিকার হচ্ছেন ইসলাম তার বৈধতা দেয়নি। তাই শুধু এই আয়াত পাঠ করেই বিভ্রান্ত হবেন না, وَاضْرِبُوْهُنَّ 'তোমরা তাদেরকে প্রহার করো'। আপনি হয়তো মনে মনে বলবেন, আমার স্বামী কেন আমাকে প্রহার করবে? সে তো হারাম বস্তুর দিকে তাকায়। কর্মক্ষেত্রে নারী সহকর্মীদের সাথে মাখামাখি করে। মানুষের সামনে ভালোমানুষ সেজে থাকে আর বাড়িতে এসে আমার সাথেই শুধু রাগ আর কঠোরতা দেখায়। সন্তানদের কেউ যদি রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে বলে, আমি ক্লান্ত। তুমি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নাও। এই লোক আমাকে মারবে? না বোন! এই ধরনের স্বামী আপনাকে প্রহার করার অধিকার রাখে না। এই স্বামী তো আল্লাহর এই বাণীকে উপলব্ধি করতে পারেনি :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'স্ত্রীদের যেমন সদাচার করা কর্তব্য, তারা তেমনই সদাচার লাভ করার অধিকার রাখে।'[৬৯]

সেই স্বামী আপনাকে প্রহার করার অধিকার রাখে না, যে মনে করে পুরুষত্ব তার একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও সে সংসারের দায়িত্ব ও বোঝা ঠিকমতো বহন করতে না পারে; তবুও নিজেকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে। তাই وَاضْرِبُوْهُنَّ 'তোমরা তাদেরকে প্রহার করো' এই আয়াত

৬৯. সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৮

পাঠ করেই বিভ্রান্ত হবেন না। এটিকে তার সঠিক জায়গায় স্থাপন করুন। কুরআন আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে তা জানুন।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে নারী অবিচারের শিকার হলে কী করবে? সে কি কোর্টে মামলা করবে? সে কি বর্তমানে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার শরণাপন্ন হবে? আমি বলব, আমরা মুসলিমরা এখন যেসকল রাষ্ট্রে বসবাস করি সেখানে আল্লাহর হকই সংরক্ষণ করা যায় না। মানুষের সম্মান ও পরিবারের নিরাপত্তাই এসব দেশে হুমকির সম্মুখীন। তাহলে এসব রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয়ে কী লাভ? এটা কেমন যেন আগুনের চুল্লিতে আশ্রয় নেয়ার মতো। তাই আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি। আপনি হয়তো স্বামী, হয়তো স্ত্রী বা পরিবারের সদস্য। আসুন আমরা আমাদের সমস্যাগুলো নিজেদের মাঝেই সমাধান করে নিই। আমি হয়তো এখানে সব সমস্যার সমাধান বিস্তারিতভাবে পেশ করতে পারিনি। কিন্তু আমরা আমাদের দীনের সম্মান সম্পর্কে অবগত। তাই আমরা সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও সমাধান তালাশ করব না। আমাদের জীবনে পরিপূর্ণরূপে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব। কারণ দীন আমাদের জীবনের সমস্যাগুলোকে ইনসাফ, সদাচার ও সমতার সাথে সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোনো ভাই হয়তো বলবেন, এ তো অপেক্ষার পর অপেক্ষার কথা বলছেন। আপনি যা বললেন তা কি কখনো পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবে? আসুন আমরা বাস্তবতার সাথে তাকে কিছুটা মেলানোর চেষ্টা করি। ইসলাম যখন বাস্তবিক অর্থে পৃথিবীতে বাস্তবায়িত ছিল তখনকার চিত্র দেখে আসি। আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও ফকিহদের বক্তব্যের আলোকে এতক্ষণ দেখেছি। এখন আসুন ইতিহাসের পাতা থেকেও কিছু বাস্তবতা দেখে আসি।

পৃথিবীতে যখন পরিপূর্ণ ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন কি নারীকে প্রহারের নামে অত্যাচার করার কোনো প্রথা প্রচলিত ছিল? ইতিহাসে কি নির্যাতিতা ও নিপীড়িতা কোনো নারীর সন্ধান পাওয়া যায়? ইসলামের ইতিহাস খুঁজলে আপনে পেয়ে যাবেন উম্মাহর শিক্ষিকা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে। পাবেন ইমাম আহমাদের মা সফিয়্যাহ শাইবানিকে, মুহাম্মাদ আল ফাতিহর মা খাদিজা খাতুনকে। পেয়ে যাবেন উম্মাহর বহু সফল সেনাপতিদের মায়ের নাম। যাদের হাতে অবনত হয়েছিল কিসরা ও কায়সারের রাজত্ব। মানুষ মুক্তি পেয়েছিল মানুষের গোলামি থেকে মানুষের রবের গোলামির দিকে। উম্মাহর এসব মায়েদের দিকে তাকালে আপনার মনে হবে এ কথাটিই বাস্তব—প্রতিটি মহান পুরুষের পেছনে একজন নারীর ভূমিকা থাকে। এ ছাড়াও এসব নারীর আরও বহু সাফল্য ছিল। আমরা একটু পরেই তার আলোচনায় আসছি।

ইতিহাসের পাতা সেই সময়গুলোকে বিস্তারিতভাবে সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু কোথাও কি নারীকে প্রহারের কোনো বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া যায়? এই হলো কুরআন, সুন্নাহ, ফকিহদের বক্তব্য ও ইতিহাসে নারীকে প্রহারের বাস্তবতা। তাহলে আবু জাবাল আর ফাতহিয়ার গল্প কোত্থেকে আমাদের শোনানো হয়? এগুলো শোনানো হয় কিছু ষড়যন্ত্রকারী মস্তিষ্কের গবেষণা থেকে। ফিল্মে দেখানো হয়, অন্ধ হাজি স্ত্রীকে প্রহার করছে। বলছে, তোকে আনুগত্যের জন্য মারছি। আল্লাহ বলেছেন, রাসূল বলেছেন তোকে মারতে। তারপর হাজির সন্তানরা তাকে মদের আড্ডায় নর্তকী নারীদের সাথে খুঁজে পায়। কখনো কখনো মুসলিমরাও এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। কথাটি যিনি বলেছেন বড় সত্য বলেছেন—মূর্খ ব্যক্তি নিজেই নিজের যত ক্ষতি করতে পারে শত্রুও তার তত ক্ষতি করতে পারে না। আমাদের সামনে এমন কিছু চিত্র পেশ করা হয় যা রাতদিন পরিশ্রম করে মানবতার শত্রুরা ইসলামকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। আপনি জানেন, আবু জাবাল আর ফাতহিয়ার গল্প ও আবু জাবাল ফাতহিয়াকে মারছে এই পিকচারটি আমি কোত্থেকে নিয়েছি? ইউটিউবে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও থেকে। যা তৈরি করেছে একটি ইউরোপিয়ান সংস্থা। যেখানে মুসলিম তরুণীদেরকে আরও সাহসী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাদেরকে যৌনস্বাধীনতার ব্যাপারে আরও সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পরিবারের কর্তৃত্বকে ভেঙে মুক্ত পৃথিবীতে নিশ্বাস গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সকল দায়িত্বশীলের দায়িত্ব থেকে নারীকে মুক্ত হতে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রথম বাধা হলো খারাপ বাবা। তারাই তাদেরকে নিরাপদে বসবাস করতে দিচ্ছে না। তার যৌনস্বাধীনতা উপভোগ করতে দিচ্ছে না। তাদের কারণেই মেয়েরা লেসবিয়ান সঙ্গিনী গ্রহণ করতে পারছে না।

পৃথিবীর সব সমাজেই বিকৃত মানসিকতার অধিকারী কিছু নারী আছে। পুরুষ কেন নারীকে অপমান করবে? এটাকে তারা মেনে নিতে পারছে না। পুরুষ কেন নারীর উপর কর্তৃত্ব খাটাবে, তাকে বাধ্য করবে এবং তাকে ব্যবহার করবে—এই চিন্তায় তারা পেরেশান। এই যখন তাদের মানসিক অবস্থা, তখন তাদের মস্তিষ্কে চেপে বসে ফেমিনিজমের ভূত। তখন তারা পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধিতায় নেমে যায়। এসব নারীরা তাদের ভূত মুসলিম নারীর ঘাড়েও চাপাতে চায় এবং তাদেরকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে আনতে চায়। কোনো কোনো নারী বিস্ময়করভাবে আমাদের পুরো আলোচনাকেই অস্বীকার করে বসবে। বলবে, নারী যতই অবাধ্য হোক না কেন, সে যতই উচ্ছৃঙ্খল হোক না কেন, স্বামী যতই প্রাজ্ঞ হোক না কেন, যতই শিষ্টাচার, শর্ত ও নিয়ম মানা হোক না কেন, যতই সচাদার ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ রাখা হোক না কেন, যতই মুসলিম রাষ্ট্রের নিবিড় ব্যবস্থাপনায় হোক না কেন, জালিম স্বামী যতই শাস্তি পাক না কেন, ইসলামি ইতিহাসে নারী যতই

সম্মানিতা ও মর্যাদার উৎস হোক না কেন—আমি এ সবকিছুরই বিরোধিতা করি। কিসের বিরোধিতা করেন? স্বামীর জন্য স্ত্রীকে প্রহার করার কোনো অধিকার নেই। এটা নারীর প্রতি স্পষ্ট অবিচার। আমরা তাকে বলব, কুরআনের আয়াত আপনাকে ব্যথিত করছে, আপনি তা মেনে নিতে পারছেন না, কারণ আপনি নিজেকে অবাধ্য নারীর স্থানে কল্পনা করছেন। কেমন যেন আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমি অবাধ্য হতে চাই। আমার ঘরকে বিরান করতে চাই। আমার সন্তানদেরকে স্নেহহারা করতে চাই। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। কেউ আমার কাজে আপত্তি করতে পারবে না। ঠিক সেই ব্যক্তির মতো, যে বলে, আমি চুরি করব। মদ খাবো। কিন্তু শরিয়ত আমাকে শাস্তি দিতে এলে তা মেনে নেব না। আপনি যদি এমনটিই ভেবে থাকেন তবে আমরা বলব, আপনার মাথায় হয়তো ফেমিনিজমের ভূত আছে নতুবা আপনি নিজেকে উপাস্য বানানোর একটি প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অর্থাৎ নিজেকে উপাস্য বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত সেই নারীর চিন্তা আপনার মাথায় ভর করেছে, যার আলোচনা আমরা 'সুপারওম্যান' শিরোনামে করেছি।

না, কোনোভাবেই নারীকে প্রহার করা যাবে না, শাস্তি দেয়া যাবে না। সে যতই অপরাধ করুক না কেন, তাকে স্পর্শ করা যাবে না। যেন নারী একটি উপাস্য। তার কর্মের ব্যাপারে কেউ তাকে প্রশ্ন করতে পারে না। অথচ এই নারীই যখন পিটার আর জুলির গল্প পড়বে তখন নিজেকে জুলির স্থানে কল্পনা করবে। এটিকে চলচ্চিত্র বানানো হলো তা দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যাবে। সে ভাবতে থাকবে, কোনো পিটার যেন তার বাহু স্পর্শ করে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, দয়া করো থামো জুলি। যথেষ্ট হয়েছে। এবার থামো। এসব তরুণ ও তরুণীকে যদি পিটার ও জুলির গল্পটিকে চলচ্চিত্র বানিয়ে দেখানো হতো তবে তারা জুলির কাণ্ড দেখে মনে মনে কামনা করত, পিটার কেন তার গালে চড় বসিয়ে দিচ্ছে না! তার উচিত ছিল জুলির গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দেয়া। এসব তরুণ ও তরুণীরা যখন রোমান্টিক মুভি দেখছে তখন এতকিছু ভাবছে না। পিটার ও জুলির গল্পটিকেও তখন তারা সেভাবেই গ্রহণ করত। তারা চিন্তা করত না, পিটার ও জুলির সম্পর্ক কি হালাল না হারাম? কারণ, আমাদের অধিকাংশ তরুণের কাছেই বিয়ের চিন্তাটিকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাই তারা স্বামী ও স্ত্রীর রোমান্টিক কাহিনির চেয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার রোমান্টিক কাহিনিতে বেশি আকর্ষণ বোধ করছে। প্রিয় তরুণ ও তরুণীরা, নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো। বিশ্বাস করতে শেখো যে, হারাম সম্পর্ক হলো কুৎসিত, নোংরা ও বীভৎস। ওরা নানা রকম রং চড়িয়ে তোমাদের সামনে তা আকর্ষণীয় করে তুলে ধরছে। শয়তান এগুলোকে মানুষের মনে আরও সুশোভিত করে তুলছে। এগুলো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তারা মেকাপ, মিউজিক, ক্যামেরা ও বহু প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। তাই হয়তো তোমাদের চোখে বস্তুগত দিক থেকে এগুলোকে সুন্দর

দেখায়। কিন্তু বস্তুত হারাম সম্পর্ক খুবই নোংরা ও কুৎসিত। যদি তোমরা তোমাদের নবীর নির্দেশনাকে অনুসরণ করে সুন্দর জীবন গঠন করতে পারো, তবে এসব কাল্পনিক দৃশ্য থেকে তোমাদের জীবন আরও বেশি সুন্দর ও প্রেমময় হয়ে উঠবে। বাস্তব পিটার ও বাস্তব জুলির দাম্পত্যজীবনের বিবাদ আসলে বাহু ধরে ঝাঁকুনি দেয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের বিবাদের শেষ পরিণতির কিছু চিত্র তোমরা 'পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা' শিরোনামের আলোচনাটিতে দেখে আসতে পারো। সেখানে তুমি পশ্চিমাদের তৈরি একাধিক পরিসংখ্যান থেকেই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারবে।

বাস্তব জুলিরা দেখতে খুব কুৎসিত হয়। পিটারদের সাথে তারা হারাম সম্পর্কে জড়ায়। কারণ, তারা সন্তান গর্ভধারণ করার ঝামেলায় যেতে চায় না। সন্তান প্রতিপালন তাদের কাছে যন্ত্রণা মনে হয়। তারা শুধু পিটারদের কাছ থেকে যৌন চাহিদা মিটিয়ে নেয়। কোনো দায়িত্ব নেয়ার বেলায় তারা নেই। পিটাররা যখন দেখে যে তারা অন্য আরেকটি যুবকের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে তখন মাতাল পিটাররা আর জুলিদের বাহু ধরে ঝাঁকুনি দেয় না। বরং সরাসরি বক্সিং মেরে দেয়। এই বাস্তবতাকে লুকাতে হলিউডে তারা নানা রকম কল্পিত রোমান্স প্রচার করে। যদি আমি আপনাদের সামনে তাদের সরকারি পরিসংখ্যান পেশ করি, তাহলে জানতে পারবেন যে প্রতি চারজনের একজন নারী তাদের দেশে সঙ্গীর দ্বারা চরম নির্মমতার শিকার হয়। এবার বুঝুন জুলিরা সেখানে কীভাবে বসবাস করছে। চড়ের পর চড় ও আঘাতের পর আঘাত প্রতিনিয়ত তাদের সহ্য করতে হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী অধিকাংশ নারীই কোনো না কোনোভাবে হেয় ও অসম্মানের শিকার হচ্ছে। আসুন হলিউডের দেয়ালের আড়ালে তাদের বাস্তব জীবনের কিছু দৃষ্টান্ত দেখে নেয়া যাক। আসুন আমরা হলিউডে প্রকাশিত প্রেমের গল্পগুলোর অপ্রকাশিত দ্বিতীয়পর্ব দেখে আসি। দেখে আসি সেসব আচরণের চিত্র সরকারি হিসেব অনুযায়ী মিলিয়ন মিলিয়ন নারী যার শিকার হচ্ছে।

আবি ব্রেডন। পশ্চিমা তরুণী। বয়ফ্রেন্ড তাকে টেলিফোনের রিসিভার দিয়ে মাথার পেছনের দিকে আঘাত করেছে। চেহারায় বারবার আঘাত করার ফলে দুই চোখের নিচে ফুলে নীলচে হয়ে গেছে। ঠোঁটজোড়া ফুলে দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে।

জেড গ্যালেঞ্জার। আরেক পশ্চিমা তরুণী। বয়ফ্রেন্ড তার চুল ধরে হেঁচড়ে সড়কে নিয়ে এসেছে। তারপর অনবরত প্রহার করেছে। পরে জানা গেছে, বয়ফ্রেন্ড তখন মদ ও কোকেনে নেশাগ্রস্ত ছিল। মারের কারণে জেডের মাথে ফেটে গেছে এবং শরীরে একাধিক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যালিশিয়া। বয়স ২২ বছর। আমেরিকার দক্ষিণ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার বয়ফ্রেন্ড একদিন প্রচুর মদ ও হুইস্কি পান করেছে। তারপর তাকে মারতে শুরু করেছে এবং তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করেছে। মাটিতে পড়ার পর পা দিয়ে তাকে অনবরত লাথি দিয়েছে ও পাড়িয়েছে। অবশেষে চুল ধরে হেঁচড়ে রুমের ভেতর নিয়ে গেছে ও কাচের একটি বোতল দিয়ে তার মুখে আঘাত করেছে। মারের কারণে তার চেহারায় লম্বালম্বি একটি বিরাট কাটা দাগ সৃষ্টি হয়েছে।

মিগান পার্টেলিন। ১৮ বছর বয়সী আমেরিকান তরুণী। সে বয়ফ্রেন্ডের সাথে নিয়মিত মদ্যপান করত। ২০১৯ সালের নিউ ইয়ার পার্টিতে হঠাৎ বয়ফ্রেন্ড তাকে মারতে শুরু করে এবং মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে।

ব্রিটেনি মেরিক। ২২ বছর বয়সী ব্রিটিশ তরুণী। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে একজন পুরুষের সাথে নাইট ক্লাবে তার মারামারি হয়। ফলে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং আজীবনের জন্য তাকে অন্ধত্ব বরণ করতে হয়।

কেরি আর্মেস্টং। ব্রিটিশ নারী। সন্তান জন্মদানের তিনদিনের মাথায় স্বামী তাকে প্রচুর মারে। তখন সে প্রচুর দুর্বল ছিল। ফলে মার খেয়ে সে মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

কার্লি হেগার। ২৫ বছর বয়সী আমেরিকান নারী। বয়ফ্রেন্ড মেরে তার শরীরের একাধিক হাড় ভেঙে দেয় এবং মাথায়ও কয়েকটি গভীর ক্ষতের তৈরি হয়। সারা শরীরে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ঝগড়া হওয়ার পর বয়ফ্রেন্ড তার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে।

এঞ্জেলা। আমেরিকার টেনিসি প্রদেশের অধিবাসী। বয়ফ্রেন্ড তাকে প্রচুর মারে। কারণ, সে ছয় মাসের সম্পর্কের পর তার সাথে ব্রেকাপ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। মারের ফলে তার চেহারায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ফুটে উঠেছে এবং দীর্ঘদিন তাকে হাসপাতালের বেডে কাটাতে হয়েছে।

এই হলো দুর্দশার চিত্র। যা প্রতিবছর কয়েক মিলিয়ন নারীর সাথে ঘটছে। এক বোনকে আমি এই এসব নির্যাতিতা মেয়েদের ছবি ও তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে পাঠাতে বলেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি কোনো রকমে এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। কিন্তু নির্যাতনের পর তাদের বীভৎস চেহারার দিকে তাকানোর সাহস হয়নি আমার। অথচ আপনি খুঁজলে এসব মেয়েদের একাধিক প্রেমের গল্প পেয়ে যাবেন। তাদের ফেইসবুক ও ইনস্টাগ্রামে প্রেমিকদের সাথে তোলা বহু ছবিও পাবেন।

পশ্চিমা ফিল্ম আর মিউজিক আপনাকে গল্পের একটি অংশ দেখায়। পুরো গল্পটা দেখায় না। সহিংসতার শিকার নারীদের সর্বপ্রথম চেহারায় আঘাত করা হয়। যার ফলে কখনো কখনো দাঁত ভেঙে যায়। চোখ নষ্ট হয়ে যায়। নাকে ক্ষত তৈরি হয়ে যায়। কেউ কেউ মারাও যায়। এই চিত্র ইউরোপে এতটাই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, এগুলোর বিরুদ্ধে ইউরোপে মিছিলও বের হয়। তাহলে দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে কেমন হতে পারে কল্পনা করুন। জীবনের নিষ্ঠুরতা ও দারিদ্র্যের কশাঘাত তাদের আরও বেশি রুক্ষ করে তোলে। 'পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা' পর্বটি প্রকাশিত হওয়ার পর এক ভাই আমাকে লিখেছেন, তিনি জার্মানির একটি রাস্তায় হাঁটছিলেন। দেখলেন এক লোক রাস্তায় হাঁটা অবস্থায় একজন নারীর চেহারায় কাঠের শিট দিয়ে আঘাত করল এবং তাকে রাস্তায় ফেলে দিলো। তখন সেই ভাই লোকটিকে বললেন, কীভাবে এমনটি করতে পারলেন? লোকটি বলল, ওরা তো পুরুষের সমান হতে চায়। তাই নিজের আত্মরক্ষা করুক আগে। কোনো পুরুষ তো তাকে রক্ষা করতে আসবে না। সে অভিযোগ করলে হয়তো পুলিশ আসবে। তারপর লোকটিকে খুঁজবে। তারপর মাসের পর মাস কোর্টে মামলা ঘুরবে। অপরাধ প্রমাণিত হবে। এতকিছুর ঝামেলা পোহাতে পোহাতে এই মেয়ে আরও দুইবার এ রকম আচরণের শিকার হয়ে যাবে।

এবার আসুন ইসলামি সমাজে। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সমাজে। যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল এই আয়াতের ভিত্তিতে :

﴿فَالصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ﴾

'নেককার রমণী তো সে, যে অনুগত...'[৭০]

ছিল এই আয়াতের বাস্তবায়ন :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচার করো।'[৭১]

ছিল এই হাদিস,

لا تُؤَدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها

---

৭০. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪
৭১. সূরা নিসা, ৪ : ১৯

'নারী ততক্ষণ তার রবের হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করে।'[৭২]

ছিল এই হাদিস,

خِيَارُكُم خِيَرُكُم لِنِسَائِهِم

'তোমাদের মাঝে উত্তম সে, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম।'[৭৩]

নারী ও পুরুষ উভয়কেই সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ দেয়া হয়েছিল। কী ছিল তার ফলাফল? পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা? ইসলামি ইতিহাসের হাজারো গ্রন্থ খুঁজে এমন দুই-একটি নিদর্শন পাবেন? এমন কোনো নারীর সন্ধান পাবেন, স্বামীর হাতে মার খেয়ে যার হাড় ভেঙে গেছে? দাঁত উপড়ে গেছে? কোথাও তারা যৌনসহিংসতার শিকার হয়েছে—যেমনটি শিকার হচ্ছে আমাদের দীনের উপর সীমালঙ্ঘন করতে আসা পশ্চিমা দেশের নারীরা? অথচ তারা দাবি করে যে, তারা নারীর মুক্তি ও স্বাধীনতা চায়।

আমরা আমাদের দীনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমরা এতদিন এ ব্যাপারে অচেতন ছিলাম। বুঝতে পেরেছি, নব্য জাহিলিয়াত নারীর সাথে কেমন আচরণ করছে। এই জাহিলিয়াতের মূল অবস্থান পশ্চিমে। আর তার কিছু ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজে। তাই আমাদের উচিত আমাদের দীন শিক্ষা করা। আমাদের জাতির মাঝে সঠিক চেতনা ছড়িয়ে দেয়া। যদি কোথাও কখনো নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটে, আমরাই যেন সর্বপ্রথম তার সমাধানে এগিয়ে আসি। তার অধিকারকে নিশ্চিত করি। পশ্চিমাদেরকে আমাদের ভূখণ্ডে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না করে দিই। তাদেরকে ইসলামের নামে অপবাদ রটানোর সুযোগ না দিই।

আমাদের দীন মহান ও সুন্দর। কিন্তু আমরা তাকে বুঝতে ভুল করি। তাই আসুন আমরা আমাদের রবের কিতাব পাঠ করি। তাঁর প্রজ্ঞা ও ইনসাফের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করি।

---

৭২. সুনানু ইবনি মাযাহ, হাদিস নং : ১৫১৫; সহিহ।
৭৩. সুনানু ইবনি মাযাহ, হাদিস নং : ১৯৭৮; সহিহ।

পশ্চিমা নারী ও আমাদের উদাসীনতা

২০১১ সালে সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, এটাই ব্রিটেনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহণের বছর। ব্রিটেনের বেশ কিছু দৈনিক এই প্রতিবেদনটি তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেছে। দ্য ইন্ডিপেন্ডেট শিরোনাম করেছে, 'ইসলাম ও নারী : অব্যাহতভাবে চলছে ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া'। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণকারী নারীর সংখ্যা বাড়ছে। ইন্ডিপেন্ডেট বলছে, সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত দশ বছরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এমন ব্রিটিশ নাগরিকের সংখ্যা এক লক্ষ। যা বিগত দশক থেকে (১৯৯১-২০০১) অনেক বেশি। বিগত দশকে ইসলাম গ্রহণকারী ব্রিটিশ নাগরিকের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এসব নওমুসলিমদের চারভাগের তিনভাগই নারী। ২০১৭ সালে ইউরোপের একাধিক দেশে পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হয়। জরিপটিতে জার্মানি, ফ্রান্সসহ একাধিক দেশে ইসলাম গ্রহণকারীদের বিরাট একটি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও লক্ষণীয় হলো, পুরুষের চেয়ে নারীদের ইসলাম গ্রহণের হার তুলনামূলক বেশি।

কিন্তু কেন? আপনি কি আমাদের 'পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা' শিরোনামের আলোচনাটি পড়েছেন? আপনি কি সেই মরুভূমিটি দেখেছেন, যার মাঝে পশ্চিমা নারী দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে? নারী যদি সুস্থ স্বভাবের অধিকারী হয়, তাহলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া তার জন্য কোনো বিকল্পই থাকে না। পশ্চিমা নারী দেখেছে, ইসলাম প্রকৃতপক্ষেই তার প্রতি ইনসাফ করেছে। আপন প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক জুড়তে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলে। আর এসব কিছুর উৎসই সংরক্ষিত ওয়াহি। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন স্বার্থসিদ্ধি নয়। তাই আপনি লক্ষ করবেন, ইসলামের প্রতি যেসব দেশের নারীরা সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেসব দেশের তালিকায় সর্বপ্রথম ব্রিটেন, জার্মানি ও ফ্রান্সের নাম। আর এসব দেশেই নারীর প্রতি সহিংস আচরণের হার সবচেয়ে বেশি। যা আমরা 'পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা' শিরোনামের আলোচনায় দেখতে পেয়েছি।

প্রকৌশলী ফাদিল সুলাইমান নওমুসলিম কয়েকজন নারীর মুখোমুখি হয়েছেন। তারপর তিনি এই শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেছেন, 'Islam in women (নারীর মাঝে ইসলাম)'। তার শিরোনামটি একটু ব্যতিক্রমধর্মী। 'ইসলামে নারীর অধিকার' বা 'ইসলামে নারী' এই ধরনের শিরোনামে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কেন? কেন তিনি এমন

শিরোনাম করলেন? কেন তিনি লিখলেন, নারীর মাঝে ইসলাম? এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারী একাধিক নারীকে আমি প্রশ্ন করেছি, আপনি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? তারা আমাকে জবাব দিয়েছে, এভাবে জিজ্ঞেস করবেন না যে, আমি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছি। বরং জিজ্ঞেস করুন, নিজের ভেতরে থাকা ইসলামকে আপনি কবে আবিষ্কার করেছেন? ইসলাম যে মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম তা বোঝানোর জন্য এটি একটি চমৎকার বর্ণনাভঙ্গি। এই হলো ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। আর আমাদের মুসলিমদের অবস্থা তো আপনি নিজেই দেখছেন। এই হলো প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়া ও ফিল্মে প্রোপাগান্ডার ফলাফল। অথচ যে নারী ইসলাম গ্রহণ করছে সে ভালোভাবেই জানছে যে, সে এমন একটি ধর্মকে গ্রহণ করছে যার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব যুদ্ধ করছে। সে জানে, শুধু হিজাব পরিধান করার কারণে তাকে কী পরিমাণ প্রতিকূলতার শিকার হতে হবে। এই হলো পরিস্থিতি। অথচ সাধারণ মুসলিমরা অন্যদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করার বিষয়টি ভাবছেই না। কেউ কেউ আবার ভিন্ন ধর্মের লোকদের ধর্মীয় উৎসবে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করছে। অথচ তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করছে না। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা ২০১১ সালের পর তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ নাইন ইলেভেনের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তার পর থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমারা যা আশা করেছিল তার বিপরীত ফলাফল তারা নিজেদের দেশেই দেখতে পেয়েছে। পশ্চিমা নারীরা হন্যে হয়ে খুঁজছিল বাঁচার উপায়। তাদের সামনে যেন মুক্তির দূত হয়ে উপস্থিত হয়েছে ইসলাম। আগে তারা শুধু জানত, ইসলাম নামে একটি ধর্ম আছে। তাতে কী আছে তা তাদের জানা ছিল না। কিছু মুসলিম ভাই তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার মহান কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, কী এমন জিনিস, যা পশ্চিমা নারীদেরকে ইসলামের প্রতি ধাবিত করেছে? যার ফলে তারা সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করেও ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফাদিল সুলাইমান তার 'Islam in women' বইটিতে এই প্রশ্নেরই উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। আপনি জানলে অবাক হবেন যে, ইসলামের যেসকল বিধানের কারণে কিছু কিছু মুসলিম নারী তাদের সম্পর্কে সংশয়গ্রস্ত হয় এবং এড়িয়ে চলে—এসব বিধানই পশ্চিমা নারীদেরকে ইসলামের প্রতি বেশি আগ্রহী করে তুলেছে। ইসলামের কিছু বিধান নিয়ে কিছু মুসলিম নারী সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। হয়তো তার বিবেচনার মানদণ্ড সঠিক না হওয়ার কারণে, অথবা এসব বিধানের বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে। কিন্তু পশ্চিমা নারীর কাছে তো বাস্তব অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। সব তিক্ততা দেখা

তার শেষ। জীবনভর সে অপমানের শিকার হয়েছে এবং অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমা নারী স্বাধীনতার আদ্যোপান্ত সব তার জানা। এই পথে সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলেছে। তার পরিণতি ও ফলাফল স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। নারী স্বাধীনতার এসব স্লোগানের আড়ালে মানব শয়তানদের কী কী স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে তা সে চাক্ষুষ অবলোকন করেছে। তাদের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়ার ফল দীর্ঘদিন সে ভোগ করেছে। কিন্তু তারা মানবীয় স্বভাব ছিল পরিচ্ছন্ন। বিবেচনাশক্তি ছিল পরিষ্কার। তাই যখন ইসলামের বিধানগুলোর তার সামনে এসেছে তখন সে এসব বিধানের মাঝেই ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে—যা অনেক মুসলিম নারীও দেখতে পায়নি। কিন্তু দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী এসকল নওমুসলিম নারীরা প্রতিনিয়তই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। ইসলাম সম্পর্কে জানার বা জ্ঞান অর্জন করার কোনো পরিবেশ তারা পাচ্ছে না। ফলে দিনদিন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাদের মাঝে কিছুসংখ্যক নারী একাকিত্বের অভিযোগ করছেন। কেউ কেউ বলছেন, তারা যখন প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন মুসলিমদের থেকে অনেক উদারতা পেয়েছিলেন। কিন্তু দিনদিন তারা মুসলিম সমাজেও বিশেষ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছেন। কেউ তাদের নিয়ে আলাদা করে ভাবছে না। সবাই কেমন যেন তাদের এড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় অন্যান্য ধর্মে নতুন ধর্ম গ্রহণকারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। তাদেরকে ধর্ম শেখাতে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন তৈরি করা হচ্ছে।

যেন পশ্চিমা নারীরা আমাদের সম্বোধন করে বলছে, তোমরা যারা মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করেছ, কোথায় তোমরা? কেন তোমরা আমাকে সাহায্য করছ না? কেন আমার মতো লক্ষ লক্ষ নারীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছ না? কেন তোমরা বিশ্বের সামনে পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে নিজেদের সফলতাগুলো প্রকাশ করে সবার জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছ না? সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগী হয়ে এবং সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে তোমরা কেন জগতের বুকে নিজেদেরকে আইডল বানাচ্ছ না? তোমরা কেন আল্লাহপ্রদত্ত তোমাদের দায়িত্ব পালন করছ না? কেন নিজেদেরকে আল্লাহর এই বাণীর বাস্তবায়নকারীতে পরিণত করছ না :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।'[৭৪]

৭৪. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০

এসব কিছু তো আমি কুরআনের অনুবাদ পড়ে জেনেছি। কিন্তু তোমাদেরকে তো তা বাস্তবায়ন করতে দেখছি না। আমি তো চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে আগমনকারী নবীর জীবনী পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর অনুবাদে আমি যা পড়েছি কেন তোমরা তা নিজেদের মাঝে বাস্তবায়ন করছ না? কেন তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলছ না? আমার মতো বহু নারী আজ তোমাদের অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে আছে। আমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে তোমরা অবহেলা করেছ। তবুও আল্লাহর অনুগ্রহে আমি হিদায়াত লাভ করেছি। কেন তোমরা আমাকে মানসিকভাবে সাহস জোগাচ্ছ না? কেন আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছ না? কেন আমাকে বোঝাচ্ছ না যে, এই দীনে আমার জন্য ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতা রয়েছে। হে মুসলিম নারী, তোমরা কি তোমাদের দীন নিয়ে গর্ব করো না? তোমরা কি উপলব্ধি করো না, ইসলামের মতো কোনো ধর্মই হয় না? পুরুষ ও নারীর এই সমন্বয় জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতি তোমার দায়িত্ব তুমি কতটুকু পালন করলে হে মুসলিম নারী?

প্রিয় সুধী, উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন এই নওমুসলিম নারীর আক্ষেপ। সে যেন আমাদের প্রত্যেককেই প্রশ্ন করছে—তোমরা যারা মুসলিম হয়ে জন্মলাভ করেছ, কোথায় তোমরা? ভাবুন তো, এই নওমুসলিম পশ্চিমা নারী কতটা বিস্ময়বোধ করবে যখন জানতে পারবে যে, মুসলিম হয়ে জন্মলাভ করা তার মুসলিম বোনেরা সেই গর্তে প্রবেশ করার জন্য মুখিয়ে আছে—যা থেকে সে তাকদিরের জোরে বহু কষ্টে বের হয়ে এসেছে। আজকের মুসলিম নারীরা তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে বরং জোর করেই সেই কঠিন বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাচ্ছে। ভাবুন তো, পশ্চিমা নওমুসলিম নারী যখন শুনবে, মুসলিম নারীরাই ইসলামের ইনসাফ ও অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে—তখন সে কতটা অবাক হবে! সে হয়তো আল্লাহর বিধান সম্পর্কে পশ্চিমাদের কোনো প্রচারণা দেখেছে আর আল্লাহর বিধানকেই অপছন্দ করতে শুরু করেছে। সে কীভাবে অন্য নারীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে? তাকেই তো বরং ইসলামের দিকে আহ্বান করা উচিত। আপনি দেখবেন, রাতদিন তারা ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের কাজে ব্যস্ত। নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সব সময় চিন্তিত। সে তার প্রতি পুরুষের অবিচারের অভিযোগ তোলে। আর পুরুষও তার প্রতি নারীর অবিচারের অভিযোগ তোলে। এই নারী পুরোপুরি ভুলেই গেছে যে, সে সেই জাতির সদস্য, যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য। বরং তারাই ইসলামকে ত্যাগ করছে এবং মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم﴾

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।'[৭৫]

নিঃসন্দেহে সমাজে এমন মুসলিম নারী অনেকেই রয়েছেন যারা তাদের দায়িত্ব পালনে সোচ্চার। সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে বদ্ধপরিকার। পরিবার, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজ সকল ক্ষেত্রেই তারা নিজেদেরকে একজন মুমিন নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মাঝে অনেকেই সুস্থ অনুভূতিশক্তির অধিকারিণী। দৃঢ় প্রত্যয়ী ও উচ্চাভিলাষিণী। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত। শুধু ব্যক্তি বা স্বার্থকেন্দ্রিক নয়। সে বুঝতে পারে, নারী প্রতি যেমন অবিচার হচ্ছে তেমনই পুরুষ ও শিশুদের প্রতিও অবিচার হচ্ছে। মানুষ এখন ওয়াহির বন্ধন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই জুলুম ও অবিচার যেন তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার লক্ষ্য শুধু নিজেকে রক্ষা করা হয় না; বরং পরিবার, সমাজ, জাতি ও মানবতাকে রক্ষা করাও তার লক্ষ্য হয়। এমন দৃঢ়তার অধিকারিণী, ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার নারী এখনো আছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমাদের সমাজের প্রতিটি নারীই উপর্যুক্ত গুণগুলো অর্জনে সচেষ্ট হতে পারে। আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾

'হে মানবসম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী; আর আল্লাহ চির অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। তিনি যদি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং নতুন একটি সৃষ্টি আনয়ন করবেন। আর তা আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন নয়।'[৭৬]

ঠিক এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা এই সিরিজটি শুরু করেছি। সিরিজটি সংক্ষিপ্ত, তথ্যপূর্ণ ও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এ বিষয়ে হয়তো তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, যেন তিনি তাকে হিদায়াতের মশাল বানিয়ে দেন। এখান থেকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় চলে যাব। যার শিরোনাম, 'রিহলাতুল ইয়াকিন'। এই সিরিজটি মুমিন নারীদের জন্য; তাদের সম্পর্কে নয়। লক্ষ্য হলো,

---

৭৫. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮
৭৬. সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৫-১৭

মুমিন নারীকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনে সহায়তা করা। মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে মুমিন নারীর এই দায়িত্ব কোনো ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়। বরং তা আবশ্যকীয়। এই দায়িত্বে অবহেলার ফলাফল হতে পারে নারীরই বিপদের কারণ। তার দায় বর্তাতে পারে নারীর উপরেই। হতে পারে তার অত্যাচারিত হওয়ার কারণ। বহু অমুসলিম সমাজে মুসলিম নারী তার সঠিক দায়িত্ব পালন না করার কারণে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অমুসলিম নারীদের মতোই আক্রান্ত হচ্ছে। এই সিরিজটি মুসলিম নারীর মাঝে তার প্রকৃত দায়িত্ববোধকে জাগিয়ে তুলবে। অন্য মুসলিম বোনদেরকেও এ ব্যাপারে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। সিরিজটিতে যুক্ত হলে একজন মুসলিম নারী চিহ্নিত করতে পারবে নিজের ও সমাজের ত্রুটিগুলো। জানতে পারবে তা সংশোধনের কুরআন ও সুন্নাহসম্মত পথ ও পন্থা। নারী ও পুরুষ উভয়েই তাদের অবস্থান, ভুল ও পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান এ সিরিজে পেয়ে যাবেন। ফলে তা আমাদেরকে সংশোধিত হতে এবং বিশ্বমানবতাকে সংশোধনে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন এই সিরিজের মাঝে উপকারিতা, বরকত ও আস্থা দান করেন। অবশেষে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী কতিপয় কতিপয়ের বন্ধু। তারা পরস্পরকে সৎকাজে আদেশ করে এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'[৭৭]

---

৭৭. সূরা তাওবা, ৯ : ৭১-৭২

আমি স্বাধীন

সে আমার স্বামী। তার মানে এই নয় যে, আমাকে শাসন করার অধিকার তার আছে। তার এ কথা জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই যে, আমি কোত্থেকে ফিরলাম? কোথায় যাব? আমি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ। তাহলে আমাকে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেন তার থেকে অনুমতি নিতে হবে? আমি অনুমতি নেব? আমার কি কোনো কিছু কম আছে যে, আমি তার অনুগত হয়ে চলব? সে আমার স্বামী। তার মানে এই নয় যে, আমাকে সে কিনে ফেলেছে। আমি তো তার দাসী নই।

* * *

বস : আসতে দেরি হলো কেন?

নারী চাকরিজীবী : সরি বস! আমার একটু ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ছিল। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।

বস : এসব অজুহাত শুনতে চাই না। আর কোনো দিন যেন দেরি না হয়। তোমার অনুপস্থিতিতে অফিসের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

নারী চাকরিজীবী : আর হবে না বস।

বস : আগামীকাল সকাল আটটায় যেকোনো মূল্যে তোমাকে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে।

নারী চাকরিজীবী : অবশ্যই।

বসের কথাগুলো খুব ঝাঁজালো ছিল। তবে তার এমন আচরণের যৌক্তিকতা আছে। এ জন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। কাজের স্বার্থেই তাকে এমনটি করতে হয়। তাই তিনি যতই কঠোরতা করুন না কেন, আমাকে তা সহ্য করতে হবে। কারণ, এটা আমার কর্মক্ষেত্র। আমার সফলতা ও স্বাতন্ত্র্যের উৎস। আমি কারও উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন কাটাতে চাই না।

* * *

নারী স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে না। তার বিষয়ে স্বামীর নাকগলানোকে পছন্দ করছে না। অথচ একই নারী অফিসে তার বসের কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে এবং তার আদেশকে সম্মান করছে। বস যখন বলছে, কেন দেরি করে এলে? তখন সে তার প্রশ্নটিকে উদারচিত্তে গ্রহণ করছে। তার রুমের দরজায় অনুমতির জন্য দাঁড়িয়ে থাকছে। খুব সম্মান ও ভদ্রতার সাথে নরম ভাষায় তার কাছে ছুটি চাচ্ছে। অথচ এই নারীই স্বামীর কাছে অনুমতি নেয়ার ব্যাপারটিকে অপমানজনক মনে করছে। আমরা সেসব সংস্থা বা বসদের সম্পর্কে কথা বলছি না, যারা নারীকর্মীদের সংক্ষিপ্ত পোশাক পরতে বাধ্য করে। তাদের পোশাকের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করে। অদ্ভুতভাবে নারী তার অফিসের স্বার্থ বোঝে। বসের আচরণকে মেনে নেয়। বিশেষত যখন তার অন্য কোনো চাকরির ব্যবস্থা থাকে না তখন চাকরির স্বার্থে সে সবকিছু মেনে নেয়। কিন্তু এই নারীর প্রতি যখন স্বামী রাগ করে, তখন সে তা মেনে নিতে পারে না। পরিবার বা সংসারের কোনো স্বার্থই তার বুঝে আসে না। সে তখন বিচ্ছেদ চেয়ে বসে। তারপর সেই সিদ্ধান্তের সাথেই নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। নারী একজন পুরুষ তথা স্বামী বা পিতার কর্তৃত্ব মানছে না। অথচ অফিসে গিয়ে একাধিক অপরিচিত পুরুষের কর্তৃত্ব মাথা পেতে নিচ্ছে। কখনো কখনো তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী এসব পুরুষের মাঝে পরিবর্তন ঘটছে। একজন যাচ্ছে, আরেকজন আসছে। তবু সে তাদের কর্তৃত্ব অকপটে মেনে নিচ্ছে। অথচ তাদের কেউই নারীর জন্য নিরাপদ নয়। কারণ, তাদের চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্পর্কে নারী ওয়াকিফহাল নয়। মোটকথা, কেন সে উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করছে? যেন কুরআনের এই আয়াতই তার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে :

﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ﴾

'তোমরা কি নিকৃষ্ট জিনিসকে তার পরিবর্তে গ্রহণ করতে চাও, যা উত্তম?'[৭৮]

১. কর্তৃত্ব অর্থ কী?

২. স্বামীরা কি কখনো কখনো কর্তৃত্বের অর্থ বুঝতে ভুল করে? স্ত্রীরা যা প্রত্যাখ্যান করে তা অনেক সময়ই কি শরিয়তসম্মত হয়?

৩. কেন দাম্পত্যজীবনে কর্তৃত্বের প্রশ্ন এল? কেন পরিবারের সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান হলো না? কেন নারীর মতামত পুরুষের মতামতের সমতুল্য হলো না?

---

৭৮. সূরা বাকারাহ, ২ : ৬১

৪. দাম্পত্যজীবনে কি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সমতার সম্পর্ক থাকতে পারত না?

৫. পুরুষের কর্তৃত্বের ব্যাপারটি কি শুধু তার শারীরিক যোগ্যতার কারণে? এই কারণেই যে তার মাঝে ক্রোমসোম Y বিদ্যমান আর নারীর মাঝে ক্রোমসোম X বিদ্যমান?

৬. স্বামী যদি তার স্ত্রী ও পরিবারের খরচ দেয়া ও তাদের দেখভাল করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে কী হবে? তারপরও কি তার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকবে?

৭. স্ত্রী যদি পরিবারের খরচ চালায় এবং স্বামীর খরচও চালায়, তাহলে কী হবে? এ ক্ষেত্রে কি পরিবারের উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব চলবে না?

৮. স্ত্রী যদি ডক্টর হয় আর স্বামী যদি মূর্খ হয়, তাহলে কী হবে? এই পরিস্থিতিতেও কেন স্ত্রীর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে না?

৯. কর্তৃত্বের এই বিধানটি কি নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে না?

১০. সেই বোনের গল্পটি কী? যিনি হল্যান্ড গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ফিরে আমাদেরকে পত্র লিখেছিলেন?

আজকের আলোচনায় আমরা এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তাই আজকের আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করব, শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন।

কেন নারী উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করছে? কেন সে স্বামীর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে? অথচ অফিসের বস ও উচ্চপদস্থ একাধিক পুরুষ কর্মকর্তার কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে? বিষয়টি তার ভালো-মন্দ বিচারের মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল। সে তার এক হাতে রাখছে শরয়ি কর্তৃত্বকে আর অপর হাতে রাখছে বস্তুবাদী পরিচালনা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে। অন্যদিকে ইতিপূর্বেই বস্তুবাদী পরিচালনা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে নারীর সামনে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটাকে তার সম্মানের প্রতীক বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নারীও কোনো রকম বাছবিচার ছাড়া তাকে সঠিক ও সুন্দর বলে মেনে নিয়েছে। পক্ষান্তরে শরয়ি কর্তৃত্বকে তার সামনে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের শত্রুরা বিভিন্ন কল্পিত ফিল্ম ও শরয়ি কর্তৃত্বকে কিছু মুসলিম কর্তৃক অপব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তগুলোকে তার সামনে উপস্থাপন

করেছে। ফলে নিজের অজান্তের তার মাঝে শরিয়তের প্রতি নেতিবাচক ভাবনা স্থান করে নিয়েছে। অবশেষে নারী যখন শরয়ি কর্তৃত্বকে বস্তুবাদীদের অফিসিয়াল নিয়ন্ত্রণের সাথে তুলনা করছে, তখন তার কাছে নিকৃষ্ট বস্তুকেই ভালো মনে হচ্ছে। কারণ, সে যেই মানদণ্ড দিয়ে বিচার করছে তা ত্রুটিপূর্ণ। তা হলো সমতার মানদণ্ড। ইনসাফের মানদণ্ড নয়। ফলে তার মানদণ্ডে বস্তুবাদীদের নিয়ন্ত্রণ ভারী হয়ে যাচ্ছে এবং শরয়ি নিয়ন্ত্রণ হালকা হয়ে যাচ্ছে।

সে যখন বস্তুবাদকে পবিত্র মনে করছে তখন তার কাছে মনে হচ্ছে, বস হলো তার সকল সফলতার উৎস। তিনি তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছেন। যা তার স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার একমাত্র উপায়। এ ব্যাপারে আমরা 'মুসলিম বিশ্বের নারীর ক্ষমতায়ন' শিরোনামে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি, কীভাবে নারী রেম্বো ও দুষ্ট আত্মীয়ের পাল্লায় পড়ে নিজেকে দাসত্বের জালে জড়িয়ে ফেলছে। নারী মনে করছে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাই তার সফলতার একমাত্র উৎস। তাই বস্তুবাদী ব্যবস্থাপনায় বসের নিয়ন্ত্রণ তার কাছে সফলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। কারণ, যেকোনো মূল্যে তাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। নিজেকে পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। তারপর নিজের প্রবৃত্তির চাহিদামতো চলতে হবে। ইতিপূর্বে আমরা 'সুপারওম্যান' শিরোনামে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি, কীভাবে নারী নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে নিজেকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিচ্ছে। স্বামীর কর্তৃত্ব হলো আল্লাহর নির্দেশ। কিন্তু নিজেকে উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাওয়া এই নারীর কাছে তো আল্লাহর নির্দেশের কোনো মূল্য নেই। তাই সে স্বামী কর্তৃত্বকে উপহাসের দৃষ্টিতে দেখছে। কারণ, গোটা পরিবারব্যবস্থাই তার নিকট উপহাসের পাত্র। অপরদিকে এই নারীই তাকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা দানকারী অফিসের নিয়ন্ত্রণ ও তার ব্যবস্থাপনাকে সম্মানের চোখে দেখছে। পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব তার কাছে মূল্যহীন। দীন ও আখিরাত তার কাছে অলীক বিশ্বাস। অপরদিকে বস্তুবাদী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ তার কাছে সম্মানিত। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা তার কাছে মূল্যবান। বস্তুবাদের অত্যাচারের কথা আমরা ভুলে যাইনি। তা শুধু নারীর উপর অবিচার করেই ক্ষান্ত হয়নি; অবিচার করেছে সমাজ ও পুরুষের উপরও। তাই এখন বহু পুরুষই নারীকে শুধু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা শুরু করেছে।

তা ছাড়া শরিয়ত নির্দেশিত স্বামীর কর্তৃত্বের অর্থও নারীর কাছে সংশয়পূর্ণ রয়ে গেছে। পিতা, ভাই ও স্বামীর দায়িত্ব বলে কী বোঝানো হয়েছে তা তার কাছে স্পষ্ট নয়। বস্তুত কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অর্থ সে ভুল বুঝেছে। আর তা কখনো কখনো হয়েছে এসব পুরুষের

ভুল ও বাজে আচরণে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়েছে বিধর্মীদের অপপ্রচারের কারণে। অনেক নারীর কাছেই পরিবার ও স্বামীর কর্তৃত্বকে একটি কল্পিত দাসত্বের মতো মনে হয়। ফলে তারা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনাকে সেভাবেই বিবেচনা করে। তাদের মুখস্থ বুলি হলো, আমরা নির্যাতিত হচ্ছি। কখনো কখনো হয়তো আসলেই তারা নির্যাতিত হয়। কিন্তু তাদের নির্যাতিত হওয়ার এই অনুভূতির কারণে তারা গোটা পুরুষ জাতিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলে। এমনকি তারা মনে করে, আল্লাহর পক্ষ থেকেও তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই মানসিকতা থেকে তারা এই আয়াত শ্রবণ করে :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ববান। কারণ, আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।'[৭৯]

তাদের কাছে তখন এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, পুরুষদের অধিকার আছে নারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার। তারা নারীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ, তারা নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা নারীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন করে। তাই তারা নারীর স্বাধীনতাকে কিনে নিয়েছে। টাকার বিনিময়ে নারীর সম্মানকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছে। এ জন্য তারা কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ইত্যাদি শব্দকে ব্যবহার করছে।

ঠিক যেমন সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা ভাবে যে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। চারপাশে সে যা কিছু দেখে ও শোনে তাকে সে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আর যেসকল নারীরা তাদের রবের কালামকে ভালোবাসে এবং তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারে তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, 'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ববান' অর্থাৎ তারা নারীদের বিষয়ে দায়িত্ববান। তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব তাদের। এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষকে আদেশ করা হচ্ছে, যেন সে নারীর প্রতি সকল বিষয়ে লক্ষ রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাকে নিরাপত্তা দেয় ও তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে। তাকে যেন নিঃসঙ্গ ও দায়িত্বহীন অবস্থায় ছেড়ে না দেয়। তার সম্মানকে যেন ক্ষুণ্ণ হতে না দেয়। তাকে সেসব নেকড়েদের মুখে ছেড়ে না দেয়, যাদের পরিচয় আমরা 'পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা' শিরোনামের আলোচনায় দেখতে পেয়েছি। সুতরাং কর্তৃত্ব হলো নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব—চাই সে নারী

৭৯. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪

স্ত্রী হোক বা বোন কিংবা মেয়ে। শরিয়তের নির্দেশিত ধারাবাহিকতায় সে তার দায়িত্ব পালন করবে। ইবনু আশুর বলেন, নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অর্থ হলো, সে তাকে সুরক্ষিত রাখবে। তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। তার জন্য উপার্জন করবে এবং তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করবে। আর এই দায়িত্ব পুরুষের জন্য ঐচ্ছিক নয় যে, ইচ্ছে করলেই সে তা গ্রহণ করবে; আর ইচ্ছে না করলে পরিত্যাগ করবে। বরং এটা পুরুষের উপর আবশ্যক। যদি সে এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে গুনাহগার হবে। তাই ইসলামি শাসনব্যবস্থায় এমন কোনো নারীর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না, যার কোনো পুরুষ দায়িত্বশীল নেই। বাধ্য হয়ে নিজেকে উপার্জনে নামতে হয়েছে এমন কোনো নারী আপনি ইসলামি শাসনব্যবস্থায় খুঁজে পাবেন না। যদি কেউ এতটা অসহায় হয়ে পড়ে যে, তাকে দেখভাল করার মতো কোনো পুরুষ নেই, তাহলে রাষ্ট্র তার দেখভাল করবে। তার প্রয়োজন পূরণ করবে। তাই তো ইসলাম বলে, যার কোনো অভিভাবক নেই রাষ্ট্রপ্রধান তার অভিভাবক। তাই শরয়ি এই কর্তৃত্ব পুরুষের প্রতি নারীর অধিকার। সে নারী সত্তা ও সম্মানকে সুরক্ষিত রাখবে। প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে নারীকে রক্ষা করবে। যদি কেউ নারীর সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করে, তবে সে তার মোকাবেলা করবে। পশ্চিমাদের মতো পথে ঘাটে মা-বোন ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হতে দেখেও চুপ করে বসে থাকবে না। তাই তো রেন্বো ও দুষ্ট আত্মীয়রা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার টোপ দিয়ে নারীকে তার সবচেয়ে আপন পুরুষটির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে বের করতে চাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অনেক নারী তাদের এই টোপটি গিলে ফেলেছে। ফলে তাদের সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। জীবনভর তারা কোনো সমাধান পায়নি। নারী যখন উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করল, তখন তাকে পরিবারের আপন পুরুষদের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে দুষ্ট আত্মীয়ের হাতে বন্দী হতে হলো।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ববান' অর্থাৎ এসকল কর্তৃত্ববান পুরুষরা পরিবারের নেতৃত্ব দেবে। এ ক্ষেত্রে সুবিধার চেয়ে তার কাঁধে দায়িত্বের বোঝা বেশি। তাদের এই দায়িত্ব পালনের স্বার্থেই নারীরা সেসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করবে—যেসব ক্ষেত্রে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। যেমন : স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারী ঘর থেকে বের হবে না।

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ 'কারণ আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' আল্লাহ এভাবে বলেননি, 'কারণ আল্লাহ পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন'; বরং বলেছেন, 'কারণ আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন'। অর্থাৎ তিনি কিছু বিধান ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরুষকে

শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আবার কিছু বিধান ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। শ্রেষ্ঠত্বদানের এই প্রক্রিয়ার মাঝে অনেক নিগূঢ় বিষয়কে লক্ষ করা হয়েছে। কারণ, নারীর দৈহিক কাঠামের মাঝে নম্রতা রয়েছে। তার শরীর ও মেধার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যার কারণে তাকে সন্তান প্রতিপালনের জন্য দায়িত্বশীল করা হয়েছে। ফলে তার সন্তানের জন্য স্নেহের আশ্রয় হয়ে যায় এবং স্বামীর জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে। ঠিক যেমন স্বামী তার জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে। পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা, যোগ্যতা ও মানসিক দৃঢ়তার কারণে সে উপার্জন করা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে অধিক সক্ষম। তাই তাকে সেই দায়িত্বটি দেয়া হয়েছে।

وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 'আর তারা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।' পুরুষকে পরিবারের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পেছনে এটা হলো দ্বিতীয় স্তম্ভ। কারণ যে পুরুষ খরচ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, নিরাপত্তা দেয়, সুরক্ষিত রাখে—সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি সে-ই নেবে। সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করবেও সে। সিদ্ধান্ত ভুল হলে তার মাসুলও দেবে সে। কিন্তু পুরুষ যদি খরচ না চালায়? যদি সে তার দায়িত্ব সে পালন না করে? তাহলে তার কর্তৃত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে। সে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। তাই অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। যার বিশ্লেষণ সামনে আসছে। পুরুষের কর্তৃত্ব দুটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত । এক. পুরুষত্ব ও তার সাথে শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা। যার বিশ্লেষণ সামনে আসছে। এই গুণটির কারণে সে কর্তৃত্বের জন্য অধিক উপযোগী। দুই. খরচ প্রদান। অর্থাৎ পুরুষত্বের দাবি অনুযায়ী তার উপর এই দায়িত্বটি বর্তায়। বিশ্লেষণ সামনে আসছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জানা থাকা উচিত।

কর্তৃত্ব শুধু তার পুরুষত্বের জন্য নয়। এ জন্য নয় যে, পুরুষ ক্রোমসোম Y এর অধিকারী আর নারী ক্রোমসোম X এর অধিকারী। এ জন্যও নয় যে, পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন রয়েছে আর নারীর শরীরে রয়েছে এস্ট্রোজেন হরমোন। এমন নয় যে, পুরুষ অপদার্থের মতো বাড়িতে বসে থাকবে। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বেখবর থাকবে। আর দিনশেষে নারীর উপর কর্তৃত্বের ছড়ি ঘোরাবে। কর্তৃত্ব তার দাবি পূরণ করার উপর নির্ভরশীল। মোটকথা, নারীর উত্তম বস্তুকে ত্যাগ করে নিকৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করার পেছনে মোট তিনটি কারণ করেছে। এক. বস্তুবাদীদের অফিসিয়াল নিয়ন্ত্রণকে তার সামনে আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তোলা। দুই. শরয়ি কর্তৃত্বকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা। তিন. সঠিক মানদণ্ডে বিচার না করা। প্রথম দুটি সম্পর্কে আমরা জানলাম। আসুন তৃতীয়টি নিয়ে কিছু কথা বলি। পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নিতে নারীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। কারণ, তা নারী ও পুরুষের সমতা বোঝায় না। আপনি যখন বলবেন, নারীকে

কেন শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে স্বামীকে প্রহার করার অনুমতি দেয়া হয়নি? কেন ইসলাম নারীকে পুরুষের মতো চারটি বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি? তখন আমি আপনাকে বলব, যতগুলো প্রশ্ন আপনি করেছেন সেগুলোর প্রতি একটু লক্ষ করুন। প্রশ্নগুলো আপনার মাথায় আসার কারণ হলো, উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সমতার মানদণ্ডে সঠিক নয়। আপনি সমতাকেই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল মানদণ্ড মনে করছেন। তাই আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন এটি এমন একটি মানদণ্ড যা নিয়ে কারও কোনো আপত্তি নেই। তারপর আপনি ইসলামের বিধানগুলোকে আপনার সেই কল্পিত নির্ভুল সমতার মানদণ্ডে বিচার করতে শুরু করেছেন। আপনার মনে একবারও এই প্রশ্ন আসেনি যে, এই মানদণ্ডটি কি আসলেই সঠিক কি না? ইসলাম যে মানদণ্ডে সকল কিছুকে বিচার করে তা হলো আল্লাহর আনুগত্যের মানদণ্ড। তিনি তাঁর দীনকে সত্য ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। আর তার জন্য সব সময় সমতা আবশ্যকীয় নয়। কারণ, সমতা কখনো কখনো সত্য ইনসাফ এনে দেয়। আর কখনো কখনো তার পরিণতি হয় মিথ্যে ও অবিচার।

নারী ও পুরুষের মাঝে দৈহিক কাঠামো, মানসিক ভারসাম্য, শারীরিক সক্ষমতা ও যোগ্যতাগত পার্থক্যের বিষয়টি কোনো বিবেকবান মানুষই অস্বীকার করতে পারবে না। তাই উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সাব্যস্ত হবে। এটি স্পষ্ট ও বোধগম্য বিষয়। যদি নারীকে পুরুষের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তার জন্য পুরুষের অধিকার সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তা নারীর স্বভাববিরুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে নারীর জন্য দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা ও অধিকার পরিপূর্ণ উপভোগ করা কষ্টকর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে যায়।

পশ্চিমা নারীরা পুরুষের থেকে অত্যাচারের শিকার হয়েছে। কিন্তু কোনো আসমানি ওয়াহির নিকট সমাধান চাওয়ার সুযোগ তার হয়নি। কোনো বিধান তাকে তার অধিকার ও দায়িত্ব ইনসাফের সাথে জানিয়ে দেয়নি। তাই সে সমতার দিকে ঝুঁকেছে। অবশেষে সে অধিকার, ইনসাফ, স্বাধীনতা ও সমতা কিছুই পায়নি। নারী এক জুলুম থেকে বের হয়ে আরেক জুলুমের মাঝে প্রবেশ করেছে। পুরুষের সাথে নারীর সমতা নারীর প্রতি একধরনের অবিচার। ইসলাম ও আসমানি ওয়াহির দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর মাঝে শারীরিক, মানসিক ও সংবেদনশীলতার পার্থক্য দিয়ে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য তিনি উভয়ের জন্যই তাদের উপযোগিতা অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করেছেন। যে বিধানের ভিত্তি হলো ন্যায় ও ইনসাফ। আল্লাহ বলেন :

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ও সকল বিষয়ে অবগত।'[৮০]

বাবার সাথে সদাচার আর মায়ের সাথে সদাচারের মাঝে আল্লাহ সমতা করেননি। বরং মায়ের সাথে সদাচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাই ন্যায় ও ইনসাফের দাবি। পরিবার ও সন্তানদের খরচ দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সমতা করেনি। বরং পুরোটাই বাবার দায়িত্বে দিয়েছে। নারীর উপর পরিবারের কোনো খরচ দেয়াই আবশ্যক নয়। এমনকি নারী যদি ধনী হয়—যদি সে স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি ধনীও হয়—তবুও তার উপর কোনো খরচ দেয়া আবশ্যক নয়। নারীর নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য পুরুষের উপর ইসলাম জিহাদ আবশ্যক করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো সমতা রাখেনি। পুরুষকে রক্ষা করার জন্য নারীকে কোনো দায়িত্ব দেয়নি। নারীকে স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহারের বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সমতা রাখেনি। বরং পুরুষের জন্য এগুলোর ব্যবহারকে হারাম করে দিয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর স্বামীর পরিবর্তে স্ত্রীকে সন্তান লালনপালনের অধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সমতা রাখেনি। বরং স্ত্রীকেই সে অধিকার দেয়া হয়েছে। এসব বিধানের ক্ষেত্রে ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের দিকে লক্ষ করেছে। সমতার দিকে লক্ষ করেনি।

আল্লাহর ইবাদতের দাবি হলো, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ডে বিশ্বাস করা। কিন্তু মানুষ যখন নিজেকে উপাস্য বানাতে যায় তখন সে ন্যায়, ইনসাফ, স্বাধীনতা, সমতা সবকিছুকে নষ্ট করে ফেলে। বিশেষত নারীর ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটে। মুমিন নারী তো তার রবের এই বক্তব্যের সামনে নিজের ভালোবাসা, সম্মান ও নিষ্ঠাকে সঁপে দেয় :

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

'আল্লাহ তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা তোমরা কামনা কোরো না। পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী অংশ এবং নারীদের জন্যও রয়েছে তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী অংশ। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞানী।'[৮১]

---

৮০. সূরা মুলক, ৬৭ : ১৪
৮১. সূরা নিসা, ৪ : ৩২

তাই একজন নারীর জন্য এমন কিছু কামনা করা উচিত নয়, যা শুধু আল্লাহ বিশেষভাবে পুরুষদেরই দিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে কোনো পুরুষের জন্য এমন কিছু কামনা করা উচিত নয়, যা শুধু আল্লাহ বিশেষভাবে নারীদের দিয়েছেন। বরং তোমরা সকলেই আল্লাহর ইনসাফ ও প্রজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আর তার পাশাপাশি আল্লাহ প্রত্যেককে যা দান করেছেন তার ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। তারপর দেখো, আল্লাহপ্রদত্ত সবকিছু নিয়ে তুমি ভালো থাকো কি না। পুরুষ ও নারী উভয়কে একজন রবই সৃষ্টি করেছেন। উভয়ের জন্যই তিনি ইনসাফের আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾

'সুতরাং সৎ নারী তারাই, যারা অনুগত ও আল্লাহ যে গোপন বিষয় সংরক্ষণ করার আদেশ করেছেন তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যত্নবান।'[৮২]

এই আয়াতের একটি অর্থ এমনও হয় যে, হে নারী, তুমি পুরুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করো। কারণ, আল্লাহ পুরুষের উপর তোমার অধিকারকে সংরক্ষণ করেছেন। যে নারীর ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ড ঠিক নেই—পুরুষের কর্তৃত্ব তার কাছে অবিচার, জুলুম ও অপমান মনে হবে। কিন্তু কেউ যখন সঠিক মানদণ্ডে তাকে বিচার করবে তখন সে বুঝতে পারবে, কর্তৃত্বের মানে হলো দায়িত্ব, সুরক্ষা, প্রশান্তি ও সুখ। নারীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা রবের পক্ষ থেকে নারীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। যদি এই মূলনীতি আপনার বুঝে আসে এবং আপনার মানদণ্ড সঠিক হয়ে যায়, তাহলে আপনি এবার শরিয়তের সকল বিধানের দিকে দৃষ্টি ফেলতে পারেন। দেখুন তো, সেখানে কোনো সমস্যা খুঁজে পান কি না? কোথাও কোনো ত্রুটি ও কমতি আপনার নজরে আসে কি না? আল্লাহর কসম! আপনি এমন কোনো কিছুই অনুসন্ধান করে পাবেন না। যে মহান সত্তা তাঁর সৃষ্টিকে সুনিপুণ করেছেন, তিনি তার বিধানকেও সুনিপুণ করেছেন।

এবার আসুন, আমরা উপরে উল্লেখিত আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করি। দেখে আসি, ইসলাম কীভাবে মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে।

❖ প্রশ্ন : যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে বিবাদে জড়িয়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে বলে, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো, তবে তোমার অধিকার বুঝে পাবে; তাহলে কী হবে?

---

৮২. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪

✓ উত্তর : আমরা বলি, বৈবাহিক সম্পর্ক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও হৃদ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে এবং অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। এভাবেই তাদের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটবে এবং তারা সুখী হবে। এটি কোনো হিসাবরক্ষণ সংস্থা নয় যে, এখানে সবকিছুর হিসাব করা হবে। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কও প্রতিপক্ষতামূলক বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয়। এখানে তারা বাদী ও বিবাদী নয়। তাই যখনই কোনো মতবিরোধ দেখা দেবে তখনই তারা ফয়সালার জন্য সেই ভালোবাসা ও সহমর্মিতার দ্বারস্থ হবে, যা আল্লাহ তাদের মাঝে দান করেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

'আর তিনি তোমাদের উভয়ের মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।'[৮৩]

দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে যখন 'আমার অধিকার', 'তোমার দায়িত্ব' ইত্যাদি শব্দ বেশি বেশি ব্যবহৃত হবে তখন বোঝা যাবে, এই দাম্পত্য সম্পর্কটি যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল তার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্যটি অর্জিত হচ্ছে না। জগতের সকল অংশীদারত্বের সম্পর্ক ইনসাফের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক তার বিপরীত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় অনুগ্রহের ভিত্তিতে।

❖ প্রশ্ন : আপনার কথাটি বেশ সুন্দর। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি নিজের অবস্থানে অটল থাকে এবং তাদের মাঝে সহমর্মিতার মানসিকতা হারিয়ে যায়, তাহলে কী করণীয়? স্ত্রী বলছে, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো। স্বামী বলছে, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো। এ পরিস্থিতিতে আমরা কার পক্ষ নেব? কাকে বেশি ছাড় দিতে ও ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতে বলব?

✓ উত্তর : এ ক্ষেত্রে পুরুষকে ছাড় দিতে বলা হবে এবং নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যেতে বলা হবে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

'স্ত্রীদের উপর যেমন সদাচার করা আবশ্যক ঠিক তেমনই সদাচার তারা প্রাপ্য। আর তাদের উপর পুরুষের রয়েছে একটি মর্যাদা।'[৮৪]

---

৮৩. সূরা রুম, ৩০ : ২১
৮৪. সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৮

দেখুন শাইখুল মুফাসসিরিন ইমাম ইবনু জারির তবারি রহিমাহুল্লাহ কী বলছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরার পর তিনি বলেন, এই বক্তব্যগুলোর আলোকে বোঝা যায়, আয়াতটি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করাই যথার্থ। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহ এখানে যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন তার দাবি হলো স্বামী স্ত্রীকে ছাড় দেবে এবং স্ত্রীর উপর থেকে কিছু দায়িত্ব কমিয়ে দেবে। আর সে নিজে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করবে না।' তারপর ইমাম তবারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা তার নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা এই অর্থটিই উদ্দেশ্য নিয়েছেন :

'স্ত্রী আমার সকল অধিকার আদায় করে ফেলুক, এমনটি আমি চাই না। কারণ আল্লাহ বলেছেন : وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 'তাদের উপর পুরুষের রয়েছে একটি মর্যাদা' মর্যাদা মানে হলো বিশেষ স্তর ও অবস্থান।'

অর্থাৎ, হে পুরুষ, তুমি ছাড় দাও ও সহ্য করো। স্ত্রী যদি তোমার অধিকারের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করে, তাহলে তাকে ছাড় দাও। তার ভুলগুলোকে না দেখার ভান করো। আর নিজের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালনে চেষ্টা করে যাও। তাকে বলতে যেয়ো না, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এবার তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো। বরং তুমি এই ছাড় দেয়ার বিনিময়ে, ক্ষমা ও সহ্যের বিনিময়ে, নিজের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট একটি মর্যাদার আশা রাখো।

তারপর ইমাম তবারি লিখেছেন, আল্লাহর এই বক্তব্যটির বাহ্যিকতা যদিও সংবাদ দেয়ার মতো বোঝাচ্ছে, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ হলো, পুরুষের জন্য নারীর প্রতি অনুগ্রহ করা উত্তম। যাতে তারা নারীর উপর নিজেকে একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

অর্থাৎ উপর্যুক্ত আয়াতটি সংবাদবাচক নয়। আয়াতে এ কথা জানাতে চাওয়া হয়নি যে, শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে নারীর উপর পুরুষের একটি মর্যাদা রয়েছে। এ কথাও বলা হয়নি, পুরুষের নিকট ক্রোমসোম Y আর নারীর নিকট ক্রোমসোম X রয়েছে, তাই পুরুষ শ্রেষ্ঠ। বরং পুরুষ যদি নিজের দায়িত্ব পালন করে এবং ছাড় দেয়, তাহলে সে একটি মর্যাদার অধিকারী হবে।

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

'হে মানবসম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে। যাতে তোমরা পরস্পরকে পরিচয় দিতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সে, যে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবগত।'[৮৫]

ইমাম তবারির মতো ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহরও একটি সুন্দর বক্তব্য রয়েছে। وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 'তাদের উপর রয়েছে পুরুষদের একটি মর্যাদা' উক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, যেহেতু আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের উপর একটি মর্যাদা দান করেছেন, তাই তাদের জন্য কর্তব্য হলো স্ত্রীদের অধিকার আদায় করা—তা যতই বেশি হোক না কেন। আয়াতে মর্যাদার কথা বলে যেন পুরুষকে পরোক্ষভাবে হুমকি দেয়া হলো। যাতে তারা স্ত্রীদেরকে কষ্ট না দেয়। কারণ, যার উপর আল্লাহর নিয়ামত বেশি থাকে তার পক্ষ থেকে গুনাহ প্রকাশিত হলে তা বেশি কুৎসিত হয় এবং সে বেশি ধমকির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

এবার সেসব স্বামীর কথা চিন্তা করুন, যারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত অবহেলা করে আর স্ত্রীকে দাবির সুরে বলে, কর্তৃত্ব আমার। তোমার উপর আমার মর্যাদা রয়েছে। আয়াতের অর্থকে তারা যেন উল্টিয়ে দিলো। যে পুরুষ নারীর উপর মর্যাদা লাভ করবে সে তার অনুগ্রহ দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হবে। পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে এই পুরুষই ফয়সালার দায়িত্ব পাবে। এই মর্যাদার ভিত্তিতেই সে দাম্পত্যজীবন পরিচালনা করবে। সে দায়িত্ব বহন করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যতই কঠিন হোক না কেন, সে পিছপা হবে না। তাহলেই সে স্ত্রীর উপর মর্যাদা লাভ করবে। নতুবা স্ত্রীর উপর তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

❖ **প্রশ্ন** : পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে কর্তৃত্বের কী প্রয়োজন? কেন পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত পরস্পর অংশীদারত্বের ভিত্তিতে হবে না? কেন নারীর মতামত ও পুরুষের মতামত সমান বলে বিবেচিত হবে না?

✓ উত্তর : আপনি কি পরামর্শের কথা বলছেন? অর্থাৎ নিজেদের জীবনের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবে, তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?

: না, না। আমি অংশীদারত্বের কথা বলছি।

---

৮৫. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

: কীভাবে অংশীদারত্ব হবে? তারা তো স্বামী-স্ত্রী। সবশেষে তো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পৃথিবীর সকল কোম্পানি, সংগঠন, সংস্থা, স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান আছে। একজন পরিচালক আছে। যদি কোনো সংস্থার পরিচালনা পর্ষদে দুইজন লোক থাকে, তাহলে অবশ্যই সিদ্ধান্তের জন্য একজন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয়। কারণ, চূড়ান্ত পর্যায়ে একজনকে প্রাধান্য দিতেই হবে। অফিসে গিয়ে সব নারীই বিষয়টি বোঝে। কিন্তু পরিবারে এসে বোঝে না! স্বামীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারকে সে মেনে নিতে পারে না। বলতে চায়, পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান। সব সিদ্ধান্ত তাই অংশীদারত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। অথচ তা অসম্ভব। কারণ, নারী সকল সিদ্ধান্তে পুরুষের সাথে একমত হবে না; এটাই স্বাভাবিক। কারণ তার কাছে মনে হবে, স্বামীর কথার মাঝে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা ও কর্তৃত্ব ফলানোর ইচ্ছে বিদ্যমান। তাই সে স্বামীর মতামতকে সহজে মানতে চাইবে না। ফলে পরিবার হুমকির মুখে পড়বে। সবার জীবনে সুখ বিনষ্ট হবে। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়েই পরিবারের মাঝে বিবাদ লেগে থাকবে। বরং এই কারণে কত স্বামী ও স্ত্রী বাসর করার পূর্বেই বিবাহবিচ্ছেদ করে ফেলেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমি আবারও বলছি, এর কারণ হলো নারী কোম্পানির স্বার্থে অন্যের সিদ্ধান্ত মানছে। কিন্তু পরিবারের স্বার্থে স্বামীর সিদ্ধান্ত মানতে পারছে না। তার কাছে পরিবারের মূল্য নেই। তার তুলনায় বস্তুবাদী কোম্পানি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে পরিবারকে মূল্যায়ন করছে না, ঠিক যেমন বহু পুরুষও পরিবারকে মূল্যায়ন করছে না। কারণ, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের রূপরেখা কী তা বোঝে না। এ ধরনের নারী ও পুরুষের নিজেদের যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে বিয়ে করছে। মা-বাবা হওয়ার ইচ্ছে থেকে সন্তান গ্রহণ করছে। তাদের কাছে এটি নিছক একটি সামাজিক আচার। মানুষ বিয়ে করছে, তাই আমিও বিয়ে করেছি। অথচ ইসলাম বলছে, পরিবার হলো আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন, পৃথিবীকে আবাদকরণ ও শত্রুদের বিরুদ্ধে উম্মাহকে শক্তিশালীকরণের প্রথম পদক্ষেপ। তাই পরিবার জগতের সকল সংস্থা ও সংগঠন থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা স্ত্রীকে বলল, আপনি জেরা করুন। আপনার মতামত প্রকাশ করুন। কারণ বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর সাথে জেরা করতেন। অর্থাৎ দুনিয়াবি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাঁর সাথে বোঝাপড়া করতেন এবং ভিন্নমত পোষণ করতেন। কিন্তু সবশেষে স্ত্রীকে স্বামীর সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে, যদি তা কোনো গুনাহের কাজ না হয়।

❖ **প্রশ্ন** : এমন অনেক পুরুষ রয়েছে, যারা কর্তৃত্ব বা নারীর উপর দায়িত্বের অপব্যবহার করে। তাদের ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন?

✓ উত্তর : আপনি ঠিক বলেছেন। এখানে আমরা ঠিক সেই কথাটিই বলব, যা 'ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা' শিরোনামের আলোচনাটিতে বলেছিলাম। কর্তৃত্বের অপব্যবহারের দায় অবশ্যই অপব্যবহারকারী ব্যক্তির। এই দায় কখনোই শরয়ি কর্তৃত্বের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। কর্তৃত্বের বিধান দানকারী শরিয়তকেও এ জন্য প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না। তাই স্বামী যাতে শরিয়তের অজুহাত দিয়ে কর্তৃত্বের অপব্যবহার করতে না পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইসলামি আইন অনুযায়ী সে যদি কর্তৃত্বের উপযুক্ত না হয়, তবে ইসলামও তার জন্য কর্তৃত্বের অধিকার সাব্যস্ত করবে না। কিন্তু কর্তৃত্বের এই বিধান অবশ্যই ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। পারিবারিক বিষয়গুলো সাধারণত গোপনীয় থাকে। এগুলো নিজেদের মাঝে সমাধান করা সম্ভব হলে কেউ আর তা নিয়ে বিচারালয় পর্যন্ত যায় না। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব হলো একটি বাহনের মতো। যার উপর আরোহণ করে পরিবার চলে। যদি নারী ও পুরুষ একটি বাহনে আরোহণ করে আর পুরুষ বাহনটি চালাতে ভুল করে আর তার ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে এর দায় বাহনটির কাঁধে বর্তায় না। বরং বলা হয়, চালক ভালো না।

❖ প্রশ্ন : কোনো কোনো নারী পরিবারের জন্য খরচ করে থাকে। প্রশ্ন হলো, তাদের জন্য কি তাহলে কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে?

✓ উত্তর : নারী যখন পরিবারের জন্য স্বেচ্ছায় খরচ করে তখন সে তার নিজের একটি অধিকারকে ছেড়ে দেয়। এটা নারীর পক্ষ থেকে ছাড় ও ইহসান। কিন্তু এর মাধ্যমে সে কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না। কারণ, কর্তৃত্ব শুধু খরচকারী পুরুষের জন্য সাব্যস্ত। যদি নারী এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয়, তাহলে সে তার প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু এটি ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি একেবারে ভিন্ন। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

'আল্লাহ তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তা তোমরা কামনা কোরো না।'[৮৬]

❖ প্রশ্ন : কোনো কোনো নারী ইহসানের নিয়তে খরচ করে না। বরং স্বামী যখন পরিবারের খরচ পুরোপুরি বহন করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে খরচ করে। তাহলে কি আমি কর্তৃত্ববান হব না?

---

৮৬. সূরা নিসা, ৪ : ৩২

✓ উত্তর : কুরআনে কর্তৃত্বের জন্য দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

এক. আল্লাহপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্য।

দুই. পরিবারের খরচ প্রদান।

সুতরাং সক্ষমতা থাকা অবস্থায় যদি স্বামী পরিবারের খরচ না দেয়, তাহলে সে কর্তৃত্বের জন্য আবশ্যকীয় কাজে ক্রটি করল। এখন তার কর্তৃত্ব স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও গ্রহণ করার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে।

: আমরা ধারণা করেছিলাম, সে শুধু গুনাহগার হবে; কিন্তু তার কর্তৃত্ব তবুও অবশিষ্ট থাকবে।

: না। এই বিষয়টি নিয়ে আলিমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। বরং সকলেই এ ব্যাপারে একমত।

: তাহলে এ পরিস্থিতিতে স্ত্রী কী করবে?

: তার একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার রয়েছে।

(ক) সে ইচ্ছে করলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার সম্পদ থেকে এই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে, যা তার ও তার সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত হবে।

(খ) ইচ্ছে করলে সে ইসলামি শাসনব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে পারে। তখন বিচারক স্বামীকে তার খরচ বহন করতে বাধ্য করবেন।

(গ) ইচ্ছে করলে নিজের সম্পদ থেকেও খরচ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই পরিমাণ সম্পদ স্বামীর উপর ঋণ হিসেবে বর্তাবে।

(ঘ) ইচ্ছে করলে বিচারকের অনুমতিক্রমে সে কারও থেকে ঋণ নিতে পারে। স্বামীকে তার সেই ঋণ শোধ করতে হবে।

(ঙ) ইচ্ছে করলে সে স্বামীর দায়িত্বেই থাকবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীস্বরূপ মেলামেশা থেকে বিরত থাকবে। বরং সে তার বাড়ি থেকে নিজের বাবার বাড়িতে চলে যাবে। সেখানে তার বাবা বা ভাই তার উপর কর্তৃত্ববান হবে। অর্থাৎ সে একজনের কর্তৃত্ব থেকে অন্যজনের কর্তৃত্বে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু তার দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো

কেউ নেই; এমনটি হবে না। ইসলাম তাকে কোনো অবস্থাতেই নিরাপত্তাহীনতার মাঝে রাখবে না।

(চ) ইচ্ছে করলে সে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ করে নেবে।

: আপনি কি আমাদের ফিকহের দরস দিচ্ছেন নাকি?

: না। বরং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরুষ যখন তার কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করবে তখন স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার দেয়া হবে। কারণ, কর্তৃত্ব শুধু তার পৌরষত্বের কারণে নয়। তাই নারীকে পুরুষের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। তাকে এ কথা বলা যাবে না, 'দুনিয়ায় তার অত্যাচার সহ্য করো। আখিরাতে তার প্রতিদান পাবে।' বরং ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে নারীর প্রতি ইনসাফ করেছে। যেসব স্বামীরা ধূমপান করে এবং স্ত্রী ও পরিবারের খরচের চেয়ে ধূমপানই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, ইসলাম তাদেরকে প্রশ্রয় দেয় না। কর্তৃত্ব হলো স্ত্রীকে রক্ষা করা এবং তাকে কষ্ট দেয় এমন সব বস্তুকে দূর করা। কিন্তু স্বামী যখন নিজেই ধূমপান করে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, তখন সে আর তার অবস্থানে থাকে না। কিছু পরিবার তো এমনও রয়েছে, যাদেরকে কেউ সহায়তা করতে এগিয়ে এলে স্ত্রী সহায়তাকারীদেরকে বলে, আল্লাহর দোহাই! আমার স্বামীকে কোনো অর্থ দেবেন না। সে অর্থ খরচ করে সিগারেট কিনবে। কিন্তু আমার ও আমার পরিবারের কোনো খরচ দেবে না। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾

'আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, সে সম্পদকে তোমরা নির্বোধদের হাতে তুলে দিয়ো না।'[৮৭]

আয়াতটিতে দায়িত্বশীলদেরকে আদেশ করা হয়েছে, যেন তারা নির্বোধ শিশুদের হাতে তাদের সম্পদ তুলে না দেয়। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক এমন বহু লোক আছে, যারা এই আয়াতের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। এত অযোগ্যতা সত্ত্বেও এসব লোকেরা ধারণা করে যে, শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে স্ত্রীর উপর তার কর্তৃত্ব চলবে। তাদের এই ধারণা সঠিক নয়।

❖ প্রশ্ন : স্বামী তার স্ত্রীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন সহ অন্যসব প্রয়োজন পূরণ করছে না এবং তার সাথে খারাপ আচরণ করছে। স্ত্রী তার পরিবারের কাছেও ফিরে যেতে

---

৮৭. সূরা নিসা, ৪ : ৫

পারছে না। আবার বিচারকের দ্বারস্থও হতে পারছে না। কিংবা সবকিছুর দ্বারস্থ হয়েও সে ন্যায়বিচার পায়নি। বাধ্য হয়ে সে স্বামীর সাথে বসবাস করছে। কারণ, তার পরিবার দরিদ্র। কিংবা তারা তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। এখন তার কী করণীয়?

✓ উত্তর : এই পরিস্থিতিতে আমরা সেই স্ত্রীকে বলব, বুঝতে চেষ্টা করুন যে, আপনার উপর যে অবিচার চলছে তার জন্য শরিয়ত বা শরয়ি কর্তৃত্ব দায়ী নয়। আপনার উপর অবিচার করেছে আপনার স্বামী, পরিবার ও সমাজ। যারা শরিয়ত থেকে অনেক দূরে। কিংবা অবিচার করছে বিচারব্যবস্থা বা রাষ্ট্র। কিন্তু শরিয়ত আপনার সহায়ক। আপনার প্রতিপক্ষ নয়। তাই এই অবিচার থেকে মুক্তি পেতে আপনি সেই শরিয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করুন—যা আপনাকে এই অবিচার থেকে মুক্তি দেবে এবং সহায়তা করবে। তাই শরিয়ত আপনার সহায়ক। প্রতিপক্ষ নয়।

❖ প্রশ্ন : আমরা পরিবারের যে খরচ প্রদান নিয়ে কথা বলছি তার পরিমাণ কতটুকু?

✓ উত্তর : এই খরচ স্বামীর সাধ্যের উপর চাপাচাপি নয়। বরং;

﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾

'প্রত্যেক সামর্থ্যবান যেন খরচ করে তার সামর্থ্য থেকে। আর যার রিযিক সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, সে যেন তা থেকে খরচ করে যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন।'[৮৮]

মৌলিক চাহিদার বাইরে পরিবারের সবকিছুর চাহিদা পূরণ করতে সে বাধ্য নয়। বস্তুবাদী চিন্তাভাবনাপ্রসূত সকল প্রয়োজন পূরণে তাকে চাপাচাপি করা হবে না। বলা হবে না যে, এসব অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে না পারলে তুমি পরিবার ও স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব হারাবে। বরং ইসলাম আধুনিক বস্তুবাদী বিশ্বের বহু অপচয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। যেসব কারণে আজ বহু পরিবার ভেঙে যাচ্ছে এবং অসংখ্য পরিবারে অশান্তি বিরাজ করছে।

❖ প্রশ্ন : স্বামী যদি পরিবারে খরচ চালাতে সক্ষম না হয়, তাহলে কী করণীয়?

✓ উত্তর : মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনারা জানেন। বহু পুরুষ এখন কাজ হারাচ্ছে। অনেকের ব্যবসা ধ্বংসপ্রায়। তবে এই বিষয়টি নিয়ে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা স্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ

৮৮. সূরা তালাক, ৬৫ : ৭

করব, আপনি আপনার স্বামীর অসচ্ছলতার উপর ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহর এই আয়াতকে স্মরণ করুন :

﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾

'তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহের কথা ভুলে যেয়ো না।'[৮৯]

কিন্তু বিষয়টিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে মনে রাখতে হবে, স্ত্রীর এই ধৈর্যধারণ তার পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ। এটা তার উপর আবশ্যক নয়। এটা তার ইহসান। তাই স্বামী এই ইহসান ও অনুগ্রহের মূল্যায়ন করবে। স্ত্রীর অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা করবে। তার ছোটখাটো ভুলকে সহ্য করবে। আর স্ত্রীও যখন বুঝতে পারবে যে, স্বামী তার এই অনুগ্রহ ও ইহসানের মূল্যায়ন করছে, তখন সে আরও বেশি ধৈর্যধারণ করার উৎসাহ পাবে। সন্তুষ্টচিত্তে সে কাজটি করতে পারবে। পুরুষের অসচ্ছলতা নারী মানসিক সংকীর্ণতার উৎস। কারণ, নারীকে সৃষ্টিগতভাবেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্যের উপর ভরসা করার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তার জন্য খরচ করার উপযুক্ত লোকের অস্তিত্ব তার মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত; যদিও তার কাছে সম্পদ থাকুক না কেন। বিষয়টি স্বামীকে বুঝতে হবে। তার পেরেশানি ও সংকীর্ণতা দেখেই স্বামী যেন তা উপলব্ধি করতে পারে। তাকে বুঝতে হবে, তার যেমন পেরেশানি আসে, স্ত্রীরও আসে। তখন স্ত্রীর জন্য তার হৃদয় প্রশস্ত হয়ে যাবে। আমরা স্ত্রীকেও বলব, আপনার স্বামীর অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার পেছনে জালিমরা দায়ী। পুঁজিবাদীরা আপনাদের সংকটের মুখে ফেলে নিজেরা সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। তাই আপনি আপনার স্বামীর সহযোগী হন। পরিবার ভেঙে যাওয়া মুসলিমদের অপমান ও অপদস্থতা বাড়িয়ে দেয়। তাদের উপর পাপাচারীদের নিয়ন্ত্রণকে সহজতর করে দেয়। মুমিনদের জীবনকে তারাই কঠিন করে দিয়েছে।

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

'তোমরা জমিনবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন।'[৯০]

এই অসচ্ছলতার পরিস্থিতিতে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে, তাহলে সে বিরাট প্রতিদান লাভ করবে। সহিহ বুখারির বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, ইবনু মাসউদ

---

৮৯. সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৭
৯০. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ১৯২৪; হাসান।

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যয়নব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্বামী ও কোলের এতিমদের জন্য খরচ করা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? অর্থাৎ তার স্বামী তার খরচ চালাতে সক্ষম ছিলেন না। তখন তার প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لك اجران اجر الصلة و اجر الصدقة

'হ্যাঁ, তোমার জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান। সদকার প্রতিদান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতিদান।'[৯১]

তার প্রতিদান দ্বিগুণ। কারণ তিনি তার স্বামীকে সদকা করেছেন।

: সদকা!

: হ্যাঁ, সদকা। এটাকে বলা হয় স্বামীকে সদকা দেয়া। কারণ, এটা তার উপর আবশ্যক নয়। তবুও তার প্রতিদান দ্বিগুণ।

❖ প্রশ্ন : আপনি যা বললেন এসব কথা যদি প্রকাশ্যে বলা হয়, তাহলে তো অনেক নারী দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।

✓ উত্তর : আপনি আসলে কী চাচ্ছেন? আমরা মানুষকে তাদের শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানাব না? আমরা তাদেরকে অজ্ঞ রাখার চেষ্টা করব? নারী কি তার অধিকার কী, তা জানবে না?

: যদি সে জানে আর স্বামীর কাছে তা দাবি করে, তাহলে সে তা দেবে না। তাহলে তো না জানাটাই ভালো।

: না। মানুষকে শরিয়ত সম্পর্কে জানানোর চেয়ে বড় কোনো হিকমত এখানে নেই। নারী ও পুরুষ উভয়ে শরিয়ত সম্পর্কে জানবে। তাদের রবের শরিয়তের মহত্ত্ব অনুভব করবে। ফলে রবের ইনসাফ ও প্রজ্ঞার কথা ভেবে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হবে। আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণকারী কিছু পরিবারকে টিকিয়ে রাখার চেয়ে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যখন সকলের উপর শরিয়তের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে তখন সকলেই ইনসাফ পাবে। অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী ও প্রবৃত্তিপূজারি ছাড়া কেউ কোনো আপত্তি করবে না। মানুষ যখন আল্লাহর কোনো আদেশকে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তখন তাদেরকে সেটির প্রতি

---

৯১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ১৪৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১০০০

প্রয়োজনগ্রস্ত করে দেন। যদি সবাই শরিয়ত থেকে নিজের সুবিধাগুলো ভোগ করে আর দায়িত্বের কথা বলা হলে বেঁকে বসে, তাহলে সবাই মুনাফিকদের মতো হয়ে গেল। যে মুনাফিকরা মানুষকে শরিয়তের নামে ধোঁকা দেয়, অথচ তারা তা থেকে বিমুখ।

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾

'আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল উপেক্ষা করে। আর যদি তাদের জন্য অধিকার সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার দিকে অনুগত হয়ে ফিরে আসে।'[৯২]

কাফিরদেরকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কারণ মুসলিমরা তাদের রবের দীন থেকে বিমুখ হয়ে গেছে।

❖ প্রশ্ন : স্ত্রী যদি ডক্টরেট ডিগ্রীধারী হয় আর স্বামীর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই না থাকে, তাহলে কীভাবে স্বামী কর্তৃত্ববান থাকে?

✓ উত্তর : প্রথমত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কখনো জ্ঞান বা সুস্থ চিন্তার মানদণ্ড নয়। যদি আমরা ধরেও নিই যে, কোনো স্ত্রী শরিয়তের জ্ঞানে স্বামীর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তবুও মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে তার সৃষ্টিগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দায়িত্ব প্রদান করে। তারপরও যদি কোনো পুরুষের মাঝে এসব ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে—যেমন : এমন মানসিক ব্যাধি যা তাকে সঠিক ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে আর স্ত্রী তাকে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের জীবনাচারে তা প্রভাব ফেলে—তাহলে এই পরিস্থিতিতে স্ত্রী তার নিজের পরিবার থেকে বা স্বামীর পরিবার থেকে বিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সহায়তা নেবে বা ইসলামি বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হবে। কিন্তু পুরুষের কর্তৃত্ব তার নিজেরই থাকবে। কারণ, অসুস্থ থাকা অবস্থায় সে শরিয়তপ্রদত্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। সাধারণ নীতি হিসেবে এটাই প্রচলিত থাকবে যে, কর্তৃত্ব ব্যাপকভাবে পুরুষের জন্য সাব্যস্ত হবে। বিশেষ কোনো অবস্থা তাতে প্রভাব ফেলবে না। আমরা এভাবেও বলব না যে, কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। কারণ, এ কথাটি শরিয়তের উপর হস্তক্ষেপের নামান্তর হয়ে যায়।

---

৯২. সূরা নূর, ২৪ : ৪৮-৪৯

❖ প্রশ্ন : একজন পুরুষ বাবা বা স্বামী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে এবং নারীর অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো কখনো তার থেকে এমন কিছু আচরণ সংঘটিত হয়ে যায় যা কোনো কারণ ছাড়াই নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মতো হয়ে যায়। যেমন : কোনো কারণ উল্লেখ করা ছাড়াই সে নারীকে কোথাও যেতে নিষেধ করল। সে কারণ জানতে চাইলেও তা জানাল না। এটা কি কর্তৃত্বের অপব্যবহার নয়? এ ক্ষেত্রে কি নারীর জন্য তার অবাধ্য হওয়া বৈধ হবে না?

✓ উত্তর : সব সিদ্ধান্তে স্বামীর বিরোধিতা করা, তার সাথে তুচ্ছ বস্তু নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ার স্বভাব মুসলিম পরিবারগুলোর মাঝে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ। হ্যাঁ, স্বামীর অধিকার আছে যে, সে কোনো কারণ বলা ছাড়াই স্ত্রীকে যেকোনো স্থানে যেতে নিষেধ করতে পারে। যদি তা শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো আবশ্যক কাজ না হয়ে থাকে (যেমন : জরুরি দীনি ইলম শিক্ষা করা, নিকটাত্মীয়ের আত্মীয়তা রক্ষা করা ও জরুরি চিকিৎসা গ্রহণ করা ইত্যাদি), তাহলে স্ত্রীর কর্তব্য এ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুগত্য করা। স্বামীর কর্তব্য নয় যে, সব সময় সে স্ত্রীকে অনুমতি না দেয়ার যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু বিষয়টি যদি সীমার বাইরে চলে যায়, তখন তার দায় শরয়ি কর্তৃত্বের নয়। বরং এসব কিছু সংঘটিত হয় পরস্পর ভালোবাসা কমে গেলে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

‘আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য হতেই, যাতে তোমরা তাকে পেয়ে প্রশান্তি লাভ করো। আর তিনি তোমাদের মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।’[৯৩]

যদি ভালোবাসা হ্রাস পায়, তাহলে দেখা যাবে স্বামী তার স্ত্রীকে তার পছন্দনীয় সকল কাজ থেকেই নিষেধ করছে। তখন স্ত্রীকে একটু চিন্তা করতে হবে, কীভাবে সে তার স্বামীর মন জয় করবে? তাকে বুঝতে হবে, কোনো অবস্থাতেই সে শরয়ি কর্তৃত্ব থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না। কারণ, এটা তার মানবীয় স্বভাবের অংশ। কর্তৃত্বহীনতা তার জন্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদের কারণ। তাই সে স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করবে। স্বামীর কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা ভাববে না। স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, পুরুষ রেগে গেলে উত্তেজিত ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। প্রতিপক্ষকে সে ধমকি দেয়। তাকে

৯৩. সূরা রুম, ৩০ : ২১

ভীত করে তোলে। রাগের বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে বসে। কিন্তু তাকে দমন করতে স্ত্রী তার সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করবে। কী সেই ধারালো অস্ত্র? সে শুধু বলবে, দুঃখিত। ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার সাথে বাজে আচরণ করে ফেলেছি। আপনি আসলে ভালোই চেয়েছিলেন। আমি বুঝিনি। এতটুকু বলে সে স্বামীর সামনে থেকে সরে আসবে। এটাই নারীর শক্তি। তার দুর্বলতাই তার সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র। স্ত্রী এ কথাটুকু বলার সাথে সাথেই স্বামী নিজেকে অত্যাচারিতের পরিবর্তে অত্যাচারী বলে ভাবতে শুরু করবে। স্বামী তখন ঝগড়া বাদ দিয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে অজুহাত পেশ করতে শুরু করবে। এটাই পুরুষের স্বভাব। দুর্বলতা ও দুঃখ প্রকাশ করে লজ্জিত হলে এক পুরুষ অপর পুরুষকে ক্ষমা করে দেয়। আর কাজটি যদি নারী করে, তাহলে তো আর কথাই থাকে না। স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে। দেখবে, সাথে সাথেই স্বামীর কঠোরতা বরফের মতো গলে যাচ্ছে। তারপর নারী তার দুর্বলতা, ভালোবাসা ও নারীত্ব দিয়ে পুরুষকে নিজের বশীভূত করে ফেলা শুধু সময়ের ব্যাপার।

বাইরের পৃথিবীতে কর্মাঙ্গনের কাঠখড় পুড়িয়ে পুরুষকে পরিবার পরিচালনার জন্য উপার্জন করতে হয়। দিনশেষে বাড়ি ফিরে যদি সে দেখে তার স্ত্রী তার প্রতিপক্ষ হয়ে বসে আছে, সে তার সাথে বোঝাপড়া করতে চায়, সব বিষয়ে তার সাথে তর্কে জড়াতে চায়—তখন তার মাঝে আর ভালোবাসা জেগে উঠে না। তখন সে বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।

এই হলো কর্তৃত্বের গল্প। যখন তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হবে তখন নারী তার নবীর এই বক্তব্যটি ভালোভাবে বুঝতে পারবে,

لا تُؤَدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها

'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নারী যতক্ষণ না তার স্বামীর অধিকার আদায় না করে ততক্ষণ সে তার রবের অধিকার আদায় করতে পারবে না।'[৯৪]

একজন পুরুষ তাকে সুরক্ষা দান করে, তাকে আশ্রয় দেয়, তার ব্যয় বহন করে, তার সম্মান রক্ষা করে—সে তার থেকে এতটুকুর অধিকার অবশ্যই রাখে। বরং এই কর্তৃত্ব স্বভাবগতভাবে স্বয়ং নারীরই দাবি। এটা তার সৃষ্টিগত চাহিদা। ইসলামি বিচারব্যবস্থা যখন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন অনেক বিদ্বেষী হৃদয়ও প্রশান্ত হবে। অনেক সংশয় তখন তাদের কাছে গর্বে পরিণত হবে। মুসলিম নারী বুঝতে পারবে, সে সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। অথচ সেই চামচের মূল্য সে বুঝতে পারছে না।

৯৪. আত তারগিব ওয়াত তারহিব, হাদিস নং : ১৯৩৮

কারণ, সে সেসব নারীর গল্প পুরোটা দেখেনি যারা শরয়ি কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে গেছে। মিডিয়া তার সামনে সেসব গল্পের আংশিক প্রকাশ করেছে। আড়ালে রয়ে গেছে বহু বেদনাদায়ক অধ্যায়।

আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়ত নির্ধারিত এই কর্তৃত্ব পশ্চিমা নারী ও প্রাচ্যের অমুসলিম কাছে অধরা স্বপ্নের মতো। তাদেরকে সংসারের জন্য স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে মিলে সমানভাবে খরচ করতে হচ্ছে। খরচ না দেয়ার কারণে কখনো কখনো তাদেরকে পথে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে।

শেষ কথা। একজন মুসলিম তরুণী আমাকে চিঠি লিখেছে। সে উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে হল্যান্ড গিয়েছে। সে মূলত সংশয়বাদী ছিল। তাই সে আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে বলেছে, ইসলামের ব্যাপারে সে পরিতৃপ্ত নয়। আল্লাহর প্রতি আর তার কোনো ভালোবাসা নেই। এভাবে কয়েক মাস কেটে গেছে। অবশেষে কিছুদিন আগে সে আমার কাছে একটি লম্বা চিঠি লিখেছে। সেখানে সে আমাদের 'নারী সিরিজ' ও 'রিহলাতুল ইয়াকিন সিরিজ' দেখার পর আবারও দীনের পথে ফিরে আসার কথা লিখেছে। এ ছাড়াও সে প্রিয় ভাই ডক্টর আব্দুর রহমান জাকিরের 'ফিকহুন নাফস সিরিজ' দেখেছে। সেই লম্বা চিঠিতে বোনটি যা বলেছে তা হলো :

'আমি আল্লাহকে ভালোবাসি। কারণ, তিনি আমাকে মুসলিম করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে একটি পরিবার দান করেছেন। যারা আমাকে ভালোবাসে। দান করেছেন বাবা, মা, ভাই, বোন। যারা সব সময় আমাকে নিয়ে শঙ্কিত থাকে। আমার জীবনের ছোট ছোট বিষয়েরও খোঁজখবর নেয়।

ডক্টর ইয়াদ, নারী বিষয়ক আপনার সিরিজটি আমি অক্ষরে অক্ষরে শব্দে শব্দে দেখছি। স্বচক্ষে আমি তা অবলোকন করেছি। শেষ চার মাস হল্যান্ডে আমি ইউরোপিয়ান মেয়েদের সাথে একসাথে থেকেছি। তাদের প্রত্যেকের জীবনের কালো অধ্যায় দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। মুসলিম নারীর পবিত্রতা ও সরলতার মূল্য আমি তখন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, পরিবার আমার জন্য কত বড় নিয়ামত। বাবা ও ভাই আমার শক্তি। পৃথিবীর যে মহাদেশেই আমি থাকি না কেন, তারা আমাকে নিয়ে ভাবে। অথচ ইউরোপিয়ান মেয়েদের বাবারা তাদের পাশেই বসবাস করছে। কিন্তু সপ্তাহে একবারও মেয়ের চেহারার দিকে তাকিয়েও দেখছে না। তার খোঁজখবরও নিচ্ছে না। তাদের কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয়। ইউরোপিয়ান নারীদের জন্য আমার করুণা হয়। হল্যান্ডের এক বান্ধবী ছিল আমার। সে আমাকে জানাল, দ্রুত তার একটা কাজ

দরকার। কারণ, তার পরিবার বাসায় তার অবস্থানকে ভালো চোখে দেখছে না। আরেক জার্মান বান্ধবী তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া করেছে। তাই বয়ফ্রেন্ড তাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে। একসময় আমি কট্টর ফেমিনিস্ট ছিলাম। এখন আমি বুঝতে পারি, পরিবার আমার জন্য কত বড় নিয়ামত। আমি আমার পরিবারের সাথে কতটা সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করি তা ভাবতেই এখন আমার পরিতৃপ্তি অনুভব হয়। আমার প্রতি তারা দায়িত্ব অনুভব করে।'

আমি কখনোই কোনো তরুণীকে দূরদেশে একা ফেলে রাখার পক্ষে নই। কিন্তু সেখানে কিছুদিন একা থাকলেই সে বুঝতে পারবে, পরিবার আল্লাহর কত বড় নিয়ামত। এই বোন—যে আগে শরিয়তের প্রতি বিদ্বেষী ছিল—সে তার চিঠিটি এভাবে শেষ করেছে,

'আমি যে আমার রবের সাথে বেয়াদবি করেছি তা থেকে ক্ষমা পেতে এখন আমি কী করতে পারি? আমি তো তাঁর পবিত্র বিধানের উপর আপত্তি তুলতাম। আমি বারবার তাঁর পবিত্র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছি। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে ভালোবাসেন। তাই তো একবার পথ হারাবার পরও তিনি আমাকে পথের দিশা দিয়েছেন। কিন্তু আপনি আমাকে যেকোনো একটি উপদেশ দিন। যা মেনে চললে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।'

সেই সম্মানিতা বোনকে সম্বোধন করে আমি বলব,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

'আপনি বলুন, হে আমার সেসব বান্দারা, যারা নিজের প্রতি অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।'[৯৫]

আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তার এই ঘটনাটি উল্লেখ করা আমাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিন। আমাদের হৃদয়ে তা সুশোভিত করে দিন। কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিন। আমাদেরকে আপনি সঠিক পথের অনুসারী বানিয়ে দিন। আমিন।

---

৯৫. সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

কিছু আপত্তি ও তার জবাব

আমাদের 'নারী সিরিজ' আল্লাহর অনুগ্রহে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং অনেক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এই সিরিজের প্রভাবে প্রতিনিয়তই আমি অনেক ভাই ও বোনের বদলে যাওয়ার গল্প শুনছি। কিন্তু মতানৈক্য মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। তাই কোনো বিষয়ই সাধারণত মতানৈক্য থেকে মুক্ত হয় না। সে হিসেবে আমাদের এই সিরিজের উপরও বেশ কিছু আপত্তি উঠেছে। বিশেষত নারীর উপর পুরুষের শরয়ি কর্তৃত্ব বিষয়ক আমাদের সর্বশেষ পর্ব 'আমি স্বাধীন' শিরোনামের আলোচনাটির উপর অনেকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি তুলেছেন। অনেকের আপত্তিই আমার চোখে পড়েছে। তাদের মাঝে কিছু ভাই সুন্দর পন্থা ও ভাষায় কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, 'ড. ইয়াদ, আপনার এই সিরিজটি এবং বিশেষত নারী সম্পর্কে এই আলোচনাটি বেশ উপকারী। কিন্তু...।' তারপর তারা কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় পেশ করেছেন।

প্রথমত আমি এসব ভাইয়ের প্রশংসা করব এবং তাদেরকে শুকরিয়া জানাব। আশা করি, তারা কল্যাণকামিতা থেকেই কথাগুলো বলেছেন। তাদের কাছে যা সঠিক মনে হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা আপত্তি করেছেন। আরও বেশি সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে যে, এখানে কোনো ব্যক্তিগত বিষয় উঠে আসেনি। অনেকেই পার্থক্য করতে পেরেছেন। বলেছেন, এখানে ডক্টর ইয়াদ সঠিক বলেছেন, এখানে ভুল করেছেন। আমার কাছে বিষয়গুলো ভালো লেগেছে। যারা এভাবে আলোচনা করেছেন আমি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব, যেন তারা এটা অব্যাহত রাখেন। তবে আমি আশা করব যেন সমালোচনাগুলো ইলমি হয়। সে উদ্দেশ্য থেকেই আজ আমি আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি। আশা করি সংক্ষেপেই শেষ করতে পারব।

যেসকল আপত্তি এসেছে ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর যথার্থতা আমরা যাচাই করে দেখতে চাই। পূর্বের পর্বের উপর যতগুলো আপত্তি এসেছে সবগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমার কাছে মনে হয়েছে, মোট তিনটি কারণে এ বিষয়ে আপত্তি উঠেছে।

কেউ কেউ বলেছেন, গত পর্বের আলোচনার কিছু বক্তব্য ভুল ছিল। আমি বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত সবার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। অভিযোগ এসেছে, পুরুষ থেকে কিসাস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমি মালিকি ফিকহের প্রাথমিক যুগের ফকিহদের বক্তব্য না এনে পরবর্তী যুগের ফকিহদের বক্তব্য এনেছি। তা ছাড়া আমি পুরুষের কর্তৃত্বের জন্য কিছু শর্ত যুক্ত করে দিয়েছি। অথচ এসব শর্তের কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই।

এগুলোর কোনো দলিল নেই। সমালোচক ভাইদের ধারণা, আমি দলিল ছাড়া কথা বলছি কিংবা ফকিহদের নিকট বিচ্ছিন্ন মতকে উপস্থাপন করছি। কোনো কোনো ভাই মনে করেন, বাস্তবে আমি নিন্দাযোগ্য কোনো কাজ করিনি। কিন্তু নারীরা নিজেদেরকে খুব বেশি নির্যাতিতা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তাই পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতিত হওয়ার বিচ্ছিন্ন অবস্থাগুলোর আলোচনা না করাই উচিত। তাদের অভিযোগ, আমি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতিগুলোর বিধানসমূহকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আলোচনা করেছি। ফলে বাস্তবতার বিপরীতে এগুলো মানুষের চিন্তাভাবনায় ভুল প্রভাব সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো এত বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তাদের ধারণা, আমি বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখি না।

আরেকদল ভাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, আমার কথাগুলোর অপব্যবহার করা হবে। তারা বলেছেন, আপনার কথাগুলো সঠিক হতে পারে। কিন্তু এটাকে ভুলভাবে বোঝার সুযোগ রয়েছে। কোনো কোনো নারী এসব বক্তব্যকে পুঁজি করে ভালো কাজের ক্ষেত্রেও স্বামীর অবাধ্যতা করে বসবে। শরয়ি হিজাব ছেড়ে যেখানে খুশি সেখানে বেরিয়ে পড়বে। জিজ্ঞেস করলে স্বামীকে বলবে, তুমি আমার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছ। এখন আর আমার উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।

আমি উল্লেখিত সকল দৃষ্টিকোণকেই বিবেচনায় রাখতে চাই। যারা এ ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন তারা হয়তো জানেন না যে, পূর্বের আলোচনাগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে কী পরিমাণ পরিশ্রম করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি আমার শ্রোতাদের আশ্বস্ত করতে চাই। এসব আলোচনা প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনাদের জানাতে চাই। অনেক দিন যাবৎই ভাবছি, আমি এ বিষয়ে কথা বলব। আমার ইচ্ছে, কীভাবে এসব সিরিজ ও আলোচনা প্রস্তুত করা হয় তা নিয়ে আপনাদের জন্য বিশেষ একটি পর্ব তৈরি করব। তাহলে আপনারা আমার আলোচনার ইলমি অবস্থান সম্পর্কে আরও বেশি আশ্বস্ত হতে পারবেন।

মূলত আমি ভিডিও সিরিজে আলোচনা করার জন্য প্রতিটি বক্তব্য নিয়েই পরামর্শ করি। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর এই আয়াতকে আমি শিরোধার্য মনে করি,

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

'তাদের বিষয় তাদের মাঝে পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান হয়।'[৯৬]

৯৬. সূরা শুরা, ৪২ : ৩৮

ইলমি, ফিকহি ও আকিদাগত কোনো বিষয়ে কথা আমি আহলে ইলমের পরামর্শ ছাড়া বলি না। আল্লাহ বলেন :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'সুতরাং তোমরা যদি না জানো, তাহলে আহলে ইলমের নিকট জিজ্ঞেস করো।'[৯৭]

আমার বক্তব্যের উপর যেসব আপত্তি তোলা হয়েছে তার মাঝে অন্যতম হলো, আমি আমার নিজের ইচ্ছেমতো কোনো মতামত বা বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত তুলে ধরি। এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই, 'আমি স্বাধীন' শিরোনামে সর্বশেষ আলোচনাটির ফিকহি ও ইলমি বিষয়গুলো নিয়ে, বিশেষত ফিকহি বিষয়গুলো নিয়ে, আমি চারজন আহলে ইলমের সাথে পরামর্শ করেছি। এ বিষয়ে আমি বহু আর্টিকেল পড়েছি। যেমন : 'সমকালীন ফিকহে ইসলামির দৃষ্টিতে বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ না দেয়ার প্রভাব' ও 'কর্তৃত্ব স্থগিতকরণ : সমকালীন ফিকহি গবেষণা' ইত্যাদি শিরোনামে বহু আলোচনা আমি পড়েছি। সেগুলো পড়ার পর আহলে ইলমদের সাথে পরামর্শ করেই গত পর্বে আলোচনা করেছি। যারা বলতে চাচ্ছেন, আমি নারীর অত্যাচারিত হওয়ার দুই-একটি অবস্থা সম্পর্কে জেনে বা শরয়ি কর্তৃত্বকে হাতেগোনা কিছু পুরুষের দ্বারা অপব্যবহারের শিকার হতে দেখে আমি প্রভাবিত হয়ে গেছি এবং বিষয়টিকে ব্যাপকতার আকারে প্রচার করতে চাচ্ছি, আমি তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করছি। দুয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি কথা বলিনি। ৪৪ বছরের এই জীবনে বহু কিছুই আমি দেখেছি। কিন্তু এ বিষয়ে বিজ্ঞ এক ভাইকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া কোনো কথাই বলিনি। তিনি একজন পারিবারিক বিষয়ে পেশাদার পরামর্শদাতা। তার কাজই এসব বিষয় নিয়ে। তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে যতটুকু বলার পরামর্শ দিয়েছেন আমি ততটুকু বলেছি। পরিবার বিষয়ক আরেক চিকিৎসক ভাইয়ের সাথেও কথা বলেছি। পেশার খাতিরে তিনিও বহু পরিস্থিতি দেখেছেন। পরিবার বিষয়ক পরামর্শদাতা ভাইটি আমাকে বলেছেন, ৪৪-৪৫ বছর বয়স অতিবাহিত হওয়ার পর নারীরা সাধারণত বহু বিষয়ের সম্মুখীন হয়। তখন তারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার এবং অধিকার আদায় ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার হয়। কিন্তু এ বয়সের আগেই যুবতি ও তরুণীরা বয়স্ক নারীদের চেয়েও বেশি ফেমিনিস্ট ও নারীবাদীদের ফাঁদে পা দেয়। কিন্তু ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। বরং প্রতিদিনই এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কথা বলার আগে আমি বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি।

---

৯৭. সূরা নাহল, ১৬ : ৪৩

কোনো কোনো ভাই বলেছেন, আপনার কথা সঠিক। কিন্তু মানুষের মনে তার ভুল প্রভাব পড়ে। কখনো কখনো এগুলোর অপব্যবহার হয়। আমি তাদেরকে বলতে চাই, গত পর্বটি তৈরি করার পূর্বে আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি ছয়জন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি। যাদের মাঝে পুরুষ ও নারী উভয় লিঙ্গের মানুষই ছিল। তারা শরয়ি ইলমের অধিকারী নন; কিন্তু একটি বিশেষ চিন্তাধারাকে তারা লালন করেন। অর্থাৎ তারা আলিম নন। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতালব্ধ। আমার বক্তব্যের মধ্য থেকে কোন কোন কথাটি মানুষ ভুল বুঝতে পারে কিংবা কোনটির অপব্যবহার হতে পারে তা নিয়ে আমি এসব বিজ্ঞ মানুষের সাথে কথা বলেছি। তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ পরামর্শ করেছি। আমার মতে, চিন্তা যেমন বিশুদ্ধ হতে হবে, তা বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিও তেমনই সঠিক হতে হবে। তাই আমার কথা থেকে কেউ যেন ভুল না বোঝে আমি তার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এ জন্য আমার বক্তব্যের একটি একটি করে শব্দকে আলাদাভাবে নির্ণয় করেছি। এমন নয় যে, একটি চিন্তা প্রচার করেই দায়মুক্ত হয়ে গেলাম। এমনও নয় যে, কিছু চিন্তা মাথায় এল, আর তা প্রচার করে দিয়ে বিদায় নিলাম। বরং আমি আমার বক্তব্যকে শব্দে শব্দে বিশ্লেষণ করতে প্রস্তুত। যাতে তার অব্যবহার না হয়, সে জন্য আমি আমার দিক থেকে সচেতন। তারপরও যারা বলেছেন, ইয়াদ সঠিক বলেন আবার ভুলও বলেন, তাদের কথা শতভাগ সত্য। কারণ, আমি তো মানুষ। আমার ভুল হয়। আমি নিষ্পাপ নই। কিন্তু আমি যা কিছু প্রচার করছি তা শুধু আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়। বরং এটা দীর্ঘ বিচার-বিশ্লেষণ, গবেষণা ও পরামর্শের ভিত্তিতে হচ্ছে। এসব কিছুর পরও কোনো সন্দেহ নেই যে, অবশ্যই সুনিশ্চিতভাবেই কেউ কেউ ভুল বুঝবে। কথাগুলোকে ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। আসলে আমি একটি বিরাটসংখ্যক মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলি। আজকের এই বক্তব্যটি প্রকাশের আগ পর্যন্ত গত পর্বটি ইউটিউবে দেখেছেন প্রায় দুই লক্ষ মানুষ। ফেসবুকেও কয়েক লক্ষ শেয়ার হয়েছে। তার মানে, প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ আমার বক্তব্য শুনেছেন। খুবই স্বাভাবিক যে, তাদের মাঝে কেউ কেউ ভুল বুঝবে। মানুষ তো কুরআনকেও ভুল বোঝে। সুন্নাহকেও ভুল বোঝে। আমার বক্তব্যকে ভুল বোঝাটা তাই খুবই সাধারণ ব্যাপার। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই কথাগুলোকে ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। এসবের আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রবৃত্তির পিছু ছুটবে। এ আচরণ তো তারা কুরআন ও সুন্নাহর সাথেও করে। আমার কথা তো তাদের কাছে নস্যি। আমি শুধু আমার সাধ্যানুযায়ী সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে কথাগুলো বলার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তারপরও কিছু মানুষ তা ভুল বুঝবে এবং ভুল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবে।

কোনো ভাই যদি এ বিষয়ে শরিয়তসম্মত, সুসাব্যস্ত, দলিলসমৃদ্ধ ও আলিমদের মতামতভিত্তিক কোনো আলোচনা পেশ করেন এবং তিনি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারেন যে, তার বক্তব্যের কোনো অপব্যবহার, অপব্যাখ্যা বা প্রবৃত্তি অনুসারে তা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য আমার জায়গাটি ছেড়ে দেবো। বলব, ভাই, আসুন, আমার জায়গা থেকে আপনিই প্রচার করুন। আমার পক্ষ থেকে এ সিরিজটি আপনিই করুন। কিন্তু দিনশেষে এসবের অপব্যাখ্যা হবেই। আমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করি। তারপরও যখন তার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ দেখি, তখন কষ্ট পাই। কিন্তু মানুষ কখনো এই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে যেতে পারে না।

কোনো কোনো ভাই বলেছেন, আপনার বক্তব্য শোনার পর বা আপনার সিরিজ দেখার পর তার কারণে তালাকের ঘটনা ঘটেছে এমন ঘটনাও আমি জানি। আমি আপনাকে বলব, আমি তো এমন বহু ঘটনা জানি; বরং শত শত ঘটনা জানি যে, আমার আলোচনা শোনার পর বহু পরিবারে আবারও শান্তি ফিরেছে। ভেঙে যাওয়ার উপক্রম বহু পরিবারের সংশোধন হয়ে গেছে। এই সিরিজটি দেখার পর বহু মানুষ তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতির কথা জানিয়েছেন। গত পর্বের শেষেও আমরা একটি নমুনা পেশ করেছি। ইনশাআল্লাহ সামনেও কিছু নমুনা আপনাদের জন্য তুলে ধরব। যদি আসলেই মানুষের মাঝে আমার কথার ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি ভুলের মাঝে আছি। এ ক্ষেত্রে আমি আবারও সংশোধনের চেষ্টা করব। একবারে সম্ভব না হলে দুই, তিন, চারবার চেষ্টা করব। নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করব যে, কী কারণে কথার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এমনটি হচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাচ্ছি।

যেসব ভাইদের অভিযোগ আমি বিচ্ছিন্ন ফিকহি মতামত তুলে ধরছি, তারা আসলে দীনের ব্যাপারে জানেন না। কথাটি এভাবেই বলতে হলো। এ জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। দীন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার ফলেই আপনাদের কাছে বিষয়গুলোকে নতুন ও অপরিচিত মনে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সর্বশেষ পর্বটিতে স্ত্রীর খরচ প্রদান না করলে পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। এটি এমন একটি বিষয় যার মাঝে কোনো মতভেদ নেই। আমার কথাটি লক্ষ করুন। আমি সংযত হয়ে, হিসেব করে ও দায়িত্ব নিয়ে কথাটি বলেছি। আমি বলিনি যে, কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যায়। বরং বলেছি, কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তার কর্তৃত্ব তখন নারীর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির উপর শর্তযুক্ত হয়ে যায়। তার এই অধিকার রহিত হয় স্ত্রীর খরচ শরিয়ত নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্রদান না করলে। পরিপূর্ণ খরচের কথা বলা হয়নি। এমন

নয় যে, স্ত্রীকে নতুন মডেলের গাড়ি দিতে না পারলে তার কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। বিষয়টি গত পর্বেই আমি স্পষ্ট করেছি। শরিয়ত নির্ধারিত সর্বনিম্ন পরিমাণ খরচ প্রদান না করলে পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যায়; এটি সর্বসম্মত বিষয়। এটি আমার বা আমার চিন্তার অনুসারী কারও মস্তিষ্কপ্রসূত বিষয় নয়। কর্তৃত্বকে খরচের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে স্বয়ং কুরআন :

﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

'কারণ, আল্লাহ তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষরা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।'[৯৮]

আয়াতটি খুবই স্পষ্ট। আমি কুরআনকে নতুনভাবে বোঝা বা পড়ার চেষ্টা করছি না। শাহরুর প্রমুখের মতো আধুনিকায়নের আশ্রয়ও নিচ্ছি না। বরং সকল ফকিহই আয়াতটিকে এমনই বুঝেছেন। এ ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ সেই ক্ষেত্রে যেখানে স্বামী খরচ চালাতে অক্ষম। হয়তো স্বামী কোনো বিপদে পড়েছে বা কোনো অসুস্থতার কারণে উপার্জন থেকে অক্ষম হয়ে গেছে। এই মাসআলাটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যা একাধিক কারণে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। কিন্তু কোনো স্বামী যদি ইচ্ছাকৃত স্ত্রীর খরচ না দেয় এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তাহলে তার কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তার 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই মাসআলায় শরিয়তের উসুল ও মূলনীতির দাবি অনুযায়ী পুরুষ যদি নিজেকে সম্পদশালী হিসেবে প্রকাশ করে ধোঁকা দিয়ে নারী বিয়ে করে, কিন্তু পরবর্তী সময় প্রকাশ পায় যে, সে দেউলিয়া। অথবা সম্পদশালী, কিন্তু স্ত্রীর খরচ দিচ্ছে না আর স্ত্রী নিজে বা বিচারকের মাধ্যমে তার সম্পদ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করতে পারছে না, তাহলে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এই বিয়েকে রহিত করে দেয়ার।' অর্থাৎ সে বিয়ে ভেঙে দেয়ার অধিকার পাবে।

'ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা' শিরোনামের আলোচনায় অনেকে আপত্তি করে বলেছেন, আমি পরবর্তী যুগের মালিকি ফকিহদের বিচ্ছিন্ন মতামত উল্লেখ করেছি। স্বামী যদি স্ত্রীকে সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে প্রহার করে, তাহলে স্বামীর থেকে কিসাস নেয়ার বিধানটিতে তাদের আপত্তি। তাদের উদ্দেশে আমি বলব, ক্ষমা করবেন, আপনি আসলে আপনার দীন সম্পর্কে জানেন না। হাম্বলি ফিকহের গ্রন্থ 'আল ইনসাফে' উল্লেখ রয়েছে, 'স্ত্রীকে শিষ্টাচারের জন্য মাত্রাতিরিক্ত প্রহার করলে স্বামীর থেকে কিসাস নেয়ার

---

৯৮. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪

মতটি আবু তালিব বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি সীমালঙ্ঘন করে, জখম করে কিংবা হাড় ভেঙে ফেলে, তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।' এটা পরবর্তী যুগের মালিকি ফকিহদের বক্তব্য নয়। এটা হাম্বলি ফকিহদের কথা। শাফিয়ি ফিকহের গ্রন্থ 'আসনাল মাতালিবে' উল্লেখ রয়েছে, 'স্বামী, শিক্ষক, বাবা ও মা প্রমুখ ব্যক্তিরাও শিশু বা স্ত্রীকে সীমাতিরিক্ত প্রহারের কারণে জরিমানার শিকার হবে; যদিও বাবা শিক্ষককে প্রহারের অনুমতি দেয়। আর শাস্তিদাতা যদি বাড়াবাড়ি করে এবং তার আচরণে হত্যার ইচ্ছে প্রকাশ পায় (যেমন : এমন কিছু দিয়ে আঘাত করে, যা দ্বারা সাধারণত মানুষ হত্যা করা হয়), তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা আবশ্যক হবে।' মালিকি ফকিহ দারদির তার 'আশ শারহুল কাবির' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যন্ত্রণাদায়ক প্রহার জায়েজ নেই। যদিও জানা যায় যে, স্ত্রী তা ছাড়া অবাধ্যতা ত্যাগ করবে না। যদি তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করা হয়, তাহলে তার বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্ত হবে এবং স্বামী থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।' ইবনু হাযম 'আল মুহাল্লা' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, 'যদি সাব্যস্ত হয়, স্বামী স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করেছেন, তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।' আমি এখানে হাম্বলি, শাফিয়ি, মালিকি ফিকহ এবং ইবনু হাযম জাহিরির বক্তব্যও উল্লেখ করলাম। এগুলো আমার জানা-শোনা ও পড়ার মাঝে এসেছে। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে ফকিহদের কত বক্তব্য রয়েছে আল্লাহই ভালো জানেন। তাই এ ধারণা করার সুযোগ নেই যে, নারীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি কিছু বিচ্ছিন্ন মতামত উল্লেখ করে দিয়েছি। যারা এমনটি বলছেন তারা আমাকে ক্ষমা করবেন, আসলে আপনারা আপনাদের দীন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন।

কাউকে খুশি করার জন্য ইসলামের বিধানকে তার সামনে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা আমার মানহাজ নয়। মানুষকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা আমার মানহাজ নয়। কখনোই এটা আমার কর্মপদ্ধতি ছিল না। আল্লাহর শোকর! শৈশব থেকেই আমি ইসলাম সম্পর্কে আশ্বস্ত ও তৃপ্ত। এটা আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, ইসলাম যেমনটি আছে তেমন অবস্থায়ই সুন্দর। আল্লাহ ইসলামকে যে অবস্থায় অবতীর্ণ করেছেন সে অবস্থায়ই ইসলাম সুন্দর। তার মাঝে ছুরি চালানোর কোনো প্রয়োজন নেই। প্রবৃত্তিপূজারিদের মনোরঞ্জনের জন্য তাতে কোনো কাটছাঁট, লুকোচুরি, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির সুযোগ নেই। আমার দায়িত্ব হলো, ইসলামকে তার আসল রূপে উপস্থাপন করা। সময়ের সকল ধুলো-ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করে সবার সামনে পেশ করা। তারপর সবাইকে প্রশ্ন করব, তোমাদের রবের দীন কি তোমাদের ভালো লেগেছে? যদি তাদের উত্তর হয়, হ্যাঁ, তাহলে আমি বলব, আপনাদের স্বভাব সুস্থ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যদি আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের

হাদিস আপনার ভালো না লাগে, তাহলে আপনি বরং নিজেকেই দোষারোপ করুন। আপনি আপনার প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহর অনুগ্রহে এটাই আমার কর্মপন্থা।

যখন আমি বিবর্তনবাদের কুসংস্কার নিয়ে কথা বলেছি তখন বহু ভাই আমার উপর আপত্তি করেছেন। আমি তাদের কথা বলছি না যারা ইসলামকে মানে না বা নাস্তিকতার প্রতি আকর্ষণবোধ করে। বরং যারা নিজেদেরকে ইসলাম চর্চাকারী মুসলিম বলে দাবি করে, তারাই আপত্তি করেছেন। বলেছেন, নাস্তিকদের নিয়ে এভাবে উপহাস করা ঠিক হচ্ছে না। একটি বৈজ্ঞানিক থিউরিকে এতটা অবজ্ঞা করা উচিত হচ্ছে না। আমি তাদেরকে কোনোভাবেই আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করিনি। আমি তাদেরকে বলেছি, আমি আল্লাহর দীনকে অতিরঞ্জিত করি না। আর কোনো অনর্থক ভিত্তিহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন থিউরিকে দর্শনও মনে করি না। আমি তাকে ইলমি বা একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করতে অপারগ। এটাকে আমি বিবেচনা বা পর্যালোচনা করার উপযুক্তই মনে করি না। আমার বক্তব্য স্পষ্ট—এটা কুসংস্কার। আমি একাডেমিকভাবেই প্রমাণ করে দেবো যে, এটা কুসংস্কার। এ ক্ষেত্রেও আমি অতিরঞ্জন করব না। যারা আমার এসব কথা শুনে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে, তাদের দেখে আমার কষ্ট হয়। আমি চাই, তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হোক। আমি চাই, তারা এই কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসুক। কিন্তু এ জন্য আমি ইসলামকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করতে পারব না। বিবর্তনবাদকে দর্শনের মান দিতে পারব না। এটাকে সম্মানের চোখে দেখতে পারব না। এসব দর্শনে বিশ্বাসীদেরকে আমি জ্ঞানীও বলতে চাই না। তারা মূর্খ।

যখন আমি বিবর্তনবাদকে কুসংস্কার বলেছি এবং তা নিয়ে উপহাস করেছি—কারণ, তা উপহাসযোগ্য; বরং তা স্বতন্ত্র একটি উপহাস—তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের হৃদয়ে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা। যাতে তারা বুঝতে পারে, জগতে কিছু আছে জ্ঞান আর কিছু আছে জ্ঞানের নামে কুসংস্কার। এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইসলাম স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। যখন আমি কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হই যে তা মিথ্যা, তখন আমি তা নিয়ে অতিরঞ্জন করি না। যখন আমি কাউকে সত্যের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করি তখন তাকে বশীভূত করার জন্য কখনো ইসলামকে কাটছাঁট করি না। নিজের মতের দিকে টানার জন্য কখনো আমি বিচ্ছিন্ন মতামত কারও সামনে তুলে ধরি না। বরং আমি ইসলামকে সেভাবেই উপস্থাপন করি, যেভাবে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। এ জন্য আমি আহলে ইলমের শরণাপন্ন হই। তাদের সাথে পরামর্শ করি ও ইস্তিখারা করে নিই। তাই 'আমি স্বাধীন' এই শিরোনামের আলোচনাটির উপর যেসকল ভাইয়েরা আপত্তি তুলেছেন তারা নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের যেকোনো একটি করেছেন। প্রথমত : কেউ

কেউ এমন কিছু আপত্তি তুলেছেন, যা আমি বলিনি। তারা দলিল দিয়েছেন, বিতর্ক করেছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কার বিরুদ্ধে বলছেন? সে বলবে, ইয়াদের বিরুদ্ধে। যদি বলেন, আচ্ছা ইয়াদ কি এমনটি বলেছেন? সে বলবে, না, সে এমনটি বলেনি। যারা বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সদাচার না করে তবুও তার কর্তৃত্ব রহিত হয় না। অথচ আপনি কীভাবে বলেন যে, রহিত হয়ে যায়? আমি তাদেরকে বলব, আমি কি বলেছি যে, স্ত্রীর সাথে সদাচার না করলে বা অসদাচার করলে স্বামীর কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যায়? কোথায় বলেছি? আমি তো বলেছি, যদি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে স্ত্রীর খরচ না দেয়, তাহলে তার কর্তৃত্বের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আপনি কি এ দুটি বক্তব্যের পার্থক্য বুঝতে পারছেন না? আপনি না বুঝলেও এখানে পার্থক্য রয়েছে। প্রয়োজনে বক্তব্য দুটি তিন-চারবার পড়ে দেখুন। তাতেও যদি বুঝে না আসে, তাহলে কোনো আলিমকে জিজ্ঞেস করে নিন। কেউ কেউ বলবেন, না, পুরুষ নারী থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমি কি এ বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো আলোচনা করেছি? পুরুষ ও নারীর মাঝে কে শ্রেষ্ঠ—তা নিয়ে আমি কোনো কথাই বলিনি। আমি বলেছি, আল্লাহ কিছু দৈহিক যোগ্যতা, বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তার বিপরীতে বিশেষ কিছু দৈহিক যোগ্যতা, বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিধানের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে কে শ্রেষ্ঠ তা আমার আলোচনায় ছিল না। এ ব্যাপারে ইবনু হাযম সহ অনেকেই কথা বলেছেন। আপনি তাদের আলোচনায় পেয়ে যাবেন—পুরুষ শ্রেষ্ঠ নাকি নারী? এটা আমার বিষয় নয়। বিশেষত আমার সিরিজের আলোচ্য বিষয়ও নয়। যদি কেউ আগ বেড়ে বুঝতে যান যে এটা আমি আলোচনা করছি, তাহলে আমি বলব, আপনার বোধশক্তিতে সমস্যা রয়েছে। কেউ হয়তো তাড়াহুড়োর কারণে এমনটি বুঝতে পারেন। আমি তার অজুহাতকে গ্রহণযোগ্য মনে করি। কিন্তু আমি সেসব বক্তব্য বা বিতর্কের জবাব দিতে চাই না, যা আমি বলিনি। তারা আসলে আমার বিরুদ্ধে বা ব্যাপারে কিছু বলেনি। তারা তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা দিয়ে একজন ব্যক্তির বিরোধিতা করে গেছে। আর ভেবেছে যে, সেই ব্যক্তিটি আমি। আসলে আমি সেই ব্যক্তি নই।

দ্বিতীয়ত : একদল ভাই কিছু দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমি উল্লেখ করেছি এবং জোরদার প্রমাণ করেছি। অথচ তাদের বক্তব্যে মনে হচ্ছে, আমি সেগুলোর বিরোধিতা করেছি। যেমন আমি বলেছি, শুধু বায়োলজিকাল পুরুষত্বের কারণে আপনার জন্য নারীর উপর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে না। আপনার মাঝে ক্রোমসোম Y আর নারীর মাঝে ক্রোমসোম X রয়েছে, এ জন্যই আপনি তার উপর কর্তৃত্ববান নন। আপনি তার

উপর কর্তৃত্ববান হবেন যদি আপনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখেন তাহলে। যদি আপনি তার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন এবং তার জন্য খরচ না করেন, তাহলে আপনি কর্তৃত্বের অধিকার রাখেন না। অনেক ভাই এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন, এই বক্তব্যটি সঠিক নয়। তারা বলছেন, আমার কথার অর্থ হলো, পুরুষ যদি খরচ না দেয় তাহলে কর্তৃত্ব নারীর কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। তারা বলছেন, আমার কথার অর্থ হলো, যদি স্বামী শারীরিকভাবে দুর্বল হয় তাহলে কর্তৃত্ব নারীর কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার! আমি বিশদ আলোচনা করেছি, বিশ্লেষণ করেছি, ব্যাখ্যা করেছি। আমার পক্ষে যতটুকু স্পষ্ট করে বলা সম্ভব বলার চেষ্টা করেছি যে, কর্তৃত্ব নারীর কাছে স্থানান্তরিত হবে না। এভাবেও বলেছি, যদি স্ত্রী স্বামীর জন্য খরচও করে, তবুও কর্তৃত্ব তার জন্য সাব্যস্ত হবে না। এর কারণ কী তা-ও আমরা ব্যাখ্যা করেছি। দুই মিনিটে যে দর্শনটি বলা যায় প্রায় ৩৫ মিনিট সেটিকে বোঝানোর জন্য ব্যয় করেছি। আমি এসব ভাইকে বলব, আপনারা গত পর্বের আলোচনাটি আবারও পুরোটা দেখুন। আমি কী বলেছি তা কান লাগিয়ে শুনুন। কেউ কেউ বলেছেন, ক্রোমসোম Y ছাড়া কীভাবে কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হতে পারে? বরং কর্তৃত্বের জন্য ক্রোমসোম Y আবশ্যক। এসকল ভাইকে আমি বলব, আপনি আপনার দীন সম্পর্কে জানেন না। কর্তৃত্ব ক্রোমসোম Y এর ভিত্তিতে হয় না। তার মানে আমার কথার অর্থ এই নয় যে, নারী কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে। বরং আমি বলেছি, শুধু বায়োলজিকাল পুরুষত্বের কারণেই কেউ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় না। বরং আল্লাহ যেমনটি বলেছেন :

﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

'কারণ, আমি তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং পুরুষ তার সম্পদ থেকে খরচ করার কারণে।'[৯৯]

এ বক্তব্যটির মাধ্যমে আমি একটি ভুল চিন্তা লালনকারী পুরুষদের উত্তর দিতে চেয়েছি। যারা মনে করে, যদি সে ঘরে বসে থাকে আর সিগারেট খেয়ে টাকা খরচ করে আর স্ত্রী যদি বলে, 'বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা করো', তাহলে বলে, আমি পারব না। সে নিজের সিগারেটের টাকা জোগাড় করতে পারে, কিন্তু পরিবারে খাবার জোগাড় করতে পারে না। অথচ সে বিশ্বাস করে, সে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ববান। এটি ভুল চিন্তা। ইসলামে এমন কিছু নেই। কেউ যদি এর বিপরীত কিছু বলতে চায়, তাহলে সে তার দীন সম্পর্কে জানে না। কথাটি বলার জন্য আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

৯৯. সূরা নিসা, ৪ : ৩৪

তৃতীয়ত : একদল মানুষ এমন কিছু বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে যা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল। তারা ধারণা করছে, আমি আমার সমচিন্তার নারীদের চিন্তাকে সবার সামনে পেশ করছি। আর আমি আগেই বলেছি, দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা মুসলিমরা নারী ও পুরুষের উভয়ের অধিকাংশই আমাদের দীন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই অন্যের কথার প্রতিবাদ করার আগে আমাদের উচিত দীন সম্পর্কে কিছু জানা।

চতুর্থত : কিছু ভাই আমাকে এমন কিছু বিষয় স্পষ্ট করার অনুরোধ করেছেন যা আমি ইতিপূর্বে করেছি এবং সামনেও করব ইনশাআল্লাহ। কিছু কিছু ভাই খুবই ভদ্র ভাষায় কথা বলেছেন। আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন। কাউকে শিষ্টাচার শেখানো আমার কাজ নয়। আর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা আমি পছন্দও করি না। আমি কাউকে কাউকে বলতে চাই যে, আপনি আহলে ইলম কারও সাথে কথা বলুন। আমি আহলে ইলম নই। আমার অবস্থা আপনাদের মতোই। আমি আহলে ইলমদের সাথে পরামর্শ করে কিছু করার চেষ্টা করছি। আমি শুধু ততটুকুই বলি, যা আমি শিখেছি। তবুও আমি কিছু ভাইকে বলব, সমালোচনার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বজায় রাখুন। কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, আপনি নারীদেরকে ঘরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল করে তুলতে চেষ্টা করুন। তাদের মাঝে নিজেকে ইলাহ বানানোর যে মানসিকতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু করুন। আপনি কেন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারের কথা উল্লেখ করছেন না? আমি এই ভাইদের কাছে শুকরিয়া আদায় করি। আমি 'সুপারওম্যান' শিরোনামে নিজেকে উপাস্য বানানোর মানসিকতার বিরুদ্ধে কথা বলেছি। সেখানে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি। সেখানে আমি মানুষের মাঝে নিজেকে ইলাহ বানানোর মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছি। পশ্চিমা নারীদের নিজেকে ইলাহ বানানোর মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছি। মুসলিম বিশ্বে কিছু নারীর সে পথে হাঁটার কথা উল্লেখ করেছি। তাদের মাঝে উপেক্ষা, আপত্তি, সুবিধাবাদ ও ব্যাখ্যা করার যে মানসিকতাগুলো রয়েছে তা-ও উল্লেখ করেছি। অবশেষে এক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের বার্তা দিয়েছি। বিষয়গুলো নিয়ে আমি এই সিরিজে এবং এই সিরিজের বাইরেও লম্বা আলোচনা করেছি। আমি যখন কোনো প্রয়োজনে কোনো বিষয়ে আংশিক আলোকপাত করি, তখন আমার পক্ষে পুরোপুরি বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয় না। 'আমি স্বাধীন' শিরোনামের আলোচনাটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক ছিল। ছোট্ট আলোচনাটির মাঝেও আমি অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছি। মৌলিক চিন্তাগুলো তুলে আনার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অবশেষে আলোচনাটির দৈর্ঘ্য হয়েছে ৩৫ মিনিট। অধিকাংশ মানুষই যখন দেখবে আলোচনাটি ৩৫ মিনিটের, তখনই বলবে, এত বড়! থাক। পরে শুনে নেব। তাই বিষয় যতই গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ হোক না কেন, আমাকে

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হয়। বিষয়ের মাঝে বিভিন্ন ভাগ ও অধ্যায় তৈরি করতে হয়। যেমন : একটি ভিডিওতে আমাকে শুধু নিজেকে উপাস্য বানানোর মানসিকতা নিয়ে কথা বলতে হয়। আরেকটি ভিডিওতে পুরুষের কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে হয়। আরেকটি ভিডিওতে নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে কথা বলতে হয়। এভাবে একের পর এক বিভাজন করতে হয়। সবগুলো বিষয়কে একবারে আলোচনা করা অসম্ভব। সবগুলো দিককে একত্রে তুলে আনাও অনেকটা দুঃসাধ্য। যারা বলেন, আপনি কেন আংশিক কথা বলেন? আমি তাদেরকে বলব, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পেতে আপনি পূর্বের আলোচনাগুলো দেখুন। নতুবা অপেক্ষা করুন। সামনের আলোচনাগুলোতে আপনি আপনার জবাব পেয়ে যাবেন। সামনে উপযুক্ত সময়েই আমরা স্বামীর আনুগত্য নিয়ে কথা বলব। যারা বলেন, আমার বক্তব্য থেকে অনেকেই ভুল বোঝে, তাদেরকে বলব, এটা আমার হাতে নেই। মানুষের কোনো কাজই সংকীর্ণতা বা ত্রুটিমুক্ত নয়। আমি আমার সাধ্যমতো চিন্তাগুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করতে পারি। তারপরও আমাকে বলতে হবে, আমি একজন মানুষ। আমি যেমন সঠিক বলি, তেমন ভুলও বলি। কিন্তু এই এসব সিরিজ তৈরি করার পেছনে শুধু আমার একার শ্রম ব্যয় হয় না। একাধিক আহলে ইলমের পরামর্শ ও নির্দেশনায় এগুলো তৈরি করা হয়। তারা আমাকে শুধরে দেন। আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার আগে সেগুলোতে সংশোধন করে দেন। তাই আমি আমার প্রিয় ভাইদের কাছে আশা করব, আপনারা সমালোচনা ও পর্যালোচনা করার পূর্বে কিছুটা স্থিরতার সাথে বিবেচনা করুন যে, আমি আসলে কী বলতে চাচ্ছি? যদি আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—আমি অবনত মস্তকে তা স্বীকার করে নেব। নতুবা একপেশে কোনো আলোচনায় আপনারা আমাকে ব্যস্ত রাখবেন না বলে আমি আশাবাদী। অন্য কারও আলোচনার সাথে আমার আলোচনাকে তুলনা করতে যাবেন না। এসব সিরিজ তৈরি করতে কী পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় আল্লাহই তা জানেন। কী পরিমাণ ব্যস্ততা ও কাজের মধ্যে আমাকে সময় কাটাতে হয়, তা আমার কাছের মানুষেরা বুঝতে পারেন। তারপরও আমি একটি সিরিজ প্রকাশের পূর্বে যথাসম্ভব তাকে নির্ভুল করার চেষ্টা করি। যারা আমার আলোচনা নিয়ে কথা বলেন এবং সমালোচনা করেন, আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনারা আমাকে উপদেশ দেবেন। আমার ভুলগুলো শুধরে দেবেন। আমি অবনত মস্তকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি আমাদের সকলকে সঠিক পথের দিশা দিন। আমাদেরকে ফিতনা থেকে মুক্তি দান করুন।

হৃদয়কে প্রশান্ত করুন

বিগত দুটে পর্বে আমরা 'ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা' ও শরয়ি কর্তৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। পর্ব দুটি নিয়ে আমরা পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করেছি। জানতে চেষ্টা করেছি, এ দুটি পর্বের মাধ্যমে শ্রোতাদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা কতটা পরিবর্তন ও স্বচ্ছ হয়েছে। আজ আমরা আপনাদের সামনে তার ফলাফল প্রকাশ করব এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে একটি কর্মপদ্ধতি বাতলে দেবো—যারা মাধ্যমে আপনারা ইসলাম উপর উত্থাপিত সকল আপত্তির জবাব খুঁজে পাবেন। আর আলোচনার শেষে আমরা ইতিহাসের নাস্তিক প্রফেসর ইউসুফ ইবন সাদিকের ঈমানের পথে ফিরে আসার গল্প শোনাব।

আসুন আমরা ফলাফল বিশ্লেষণ করি। 'ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা' পর্বটি যতটুকু ভিউ হয়েছে তার মাঝে ৭,২০০ মানুষ বলেছে, তারা পর্বটি পুরোপুরি দেখেছে। এসব দর্শকদের কাছ থেকে আমরা মতামত নিয়েছি। এই পর্বটি দেখার পূর্বে যারা এ বিষয়টি নিয়ে কিছুটা সংশয়ের মাঝে ছিলেন তাদের মাঝে প্রায় ৯২ শতাংশ এমন রয়েছেন পর্বটি দেখার পর যাদের সংশয় একেবারে দূর হয়ে গেছে কিংবা কিছুটা কমেছে। মোট দর্শকের প্রায় চার-পঞ্চমাংশের সংশয় পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে।

'আমি স্বাধীন' শিরোনামে শরয়ি কর্তৃত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তা পুরোপুরি দেখেছে মোট ৮,৬০০ জন। তাদের কাছ থেকে আমরা মতামত গ্রহণ করেছি। তাদের মাঝে ৮১ শতাংশ মানুষ জবাব দিয়েছেন, পর্বটি দেখার পর এ ব্যাপারে তাদের সংশয় পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে কিংবা কিছুটা কমে এসেছে। তাদের মাঝে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ পুরোপুরি সংশয় থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এ দুটি পর্ব নিয়ে আমরা যা করেছি তাকে কেইস স্টাডি বা অবস্থা নির্ণয় বলা যেতে পারে। আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে, দর্শকরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন। তারা কতটুকু অনুভব করতে পারছেন যে, তারা একজন সত্য রবের ইবাদত করছেন। ইসলামের এই ঐশী বিধানগুলোর মৌলিক চিন্তাগুলোকে মুসলিমদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করার লক্ষ্যে আমরা এই কাজটি করে যাচ্ছি। বোঝানোর চেষ্টা করছি, কুরআনের কোনো আয়াত বা শরিয়তের কোনো বিধানের প্রতি আমাদের মাঝে কখনো কখনো যে সংশয় তৈরি হয় তা মূলত তিনটি কারণে হয়ে থাকে। এক. কুরআনের বিধানের সঠিক চিত্রটি আমাদের সামনে না থাকার কারণে। দুই. নব্য জাহিলিয়াতের চমকপ্রদ প্রচারণার কারণে। তিন. সঠিক ও ভুল নির্ণয়ের মানদণ্ডটি ভুল হওয়ার কারণে। আমাদের সামনে শরিয়তকে বিকৃত করে প্রচার করা হয়। আর নব্য জাহিলিয়াতকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করা হয়। আর আমাদের বাছবিচারের মানদণ্ডকে নষ্ট করে দেয়া হয়। ফলে আমাদের মাঝে আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে সংশয় তৈরি হয় এবং নব্য

জাহিলিয়াতকে সুন্দর মনে হয়। কিন্তু যখন আপনার চোখের সামনে নব্য জাহিলিয়াতের বাস্তবতা আর শরিয়তের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হবে এবং সত্য ও ইনসাফপূর্ণ মানদণ্ড স্থাপন করা হবে, প্রতিটি আয়াত ও বিধানের সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে—তখন আমাদের সংশয় অনেকাংশেই কমে আসবে বা দূর হয়ে যাবে।

আজ আমরা একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করব। ইসলামের উপর সবচেয়ে বড় অবিচার করা হয় তার বিধানগুলোর বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র না দেখিয়ে। যদি মানুষ ইসলামকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করত, তাহলে চিত্রটি কেমন হতো? কল্পনা করুন। আমরা শুধু আধা ঘণ্টা ব্যাপ্তির দুটি পর্ব নিয়ে পর্যালোচনা করলাম। দেখলাম যে তা বহু মানুষের নেতিবাচক মানসিকতাকে বদলে দিয়েছে। যে মানসিকতা তাদের মাঝে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘদিন অপপ্রচারের শিকার হওয়া ও ভুল প্রয়োগক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করার কারণে। যদি আজ মুসলিমরা সত্যিকার অর্থে ইসলামকে বাস্তবায়ন করত, তাহলে চিত্র কী হতো ভেবে দেখুন তো। বিগত দুই পর্ব যারা পুরোপুরি দেখেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এমন, যাদের ভেতর থেকে সংশয় পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে। তাই আমার মনে হয়, পর্বগুলো আমাদের পুরোপুরি দেখা উচিত। আমরা এ কথা বলছি না যে, আমরা আমাদের পর্বগুলোর দর্শকদের নিয়ে যে পরিসংখ্যান পেশ করেছি তা আমাদের সমাজের সামগ্রিক চিত্র। বরং সামাজিক পরিসংখ্যানের চিত্র স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন হতে পারে। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। তাতে আলোচনাটি একডেমিক ও নীরস হয়ে উঠবে। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে, আমাদের পর্বগুলোর ফলাফল থেকে একটি বার্তা অবশ্যই পাওয়া যায়। আমাদের এসব আলোচনা এখনো পর্যন্ত শুধুই দার্শনিক। যদি এগুলো অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার প্রভাব কতটা বৃদ্ধি পাবে? একটু চিন্তা করুন। সমাজের মাঝে শরিয়ত সম্পর্কে যে নেতিবাচক চিন্তা অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে আমরা যদি সঠিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে শরিয়াহ বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে তা পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা আমাদের পর্বগুলোর ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ করছি। আপনি বলতে পারেন, কেন আমরা সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করছি? কেন ইতিবাচক দিকটি প্রকাশ করে নেতিবাচক দিকটি এড়িয়ে যাচ্ছি? আমরা বলব, আসলে আমরা কোনো কিছুকেই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি না। আমরা আমাদের সামনে ফলাফল প্রকাশ করছি শুধু সংখ্যার মাধ্যমে। যাদের ভেতর থেকে এখনো সংশয় দূর হয়নি তাদের ব্যাপারে আমরা এখনো আশাহত হচ্ছি না। আল্লাহর কাছে কামনা করছি, আল্লাহ তাদেরকেও আমাদের সাথে তাঁর পবিত্র কিতাব ও শরিয়তের ভালোবাসায় ঐক্যবদ্ধ করে দিন।

এবার আসুন সেই কর্মপদ্ধতিটি জেনে নিই, যেটি অনুসরণ করে একজন মুসলিম পুরুষ বা নারী ইসলামের উপর আরোপিত সকল প্রশ্ন, আপত্তি ও সংশয়ের সমাধান পেয়ে যাবেন। প্রথমত, আপনার ঈমানকে কিছু মূলনীতি বা স্তম্ভের উপর স্থাপন করতে হবে। এমন কিছু ভিত্তির উপর আপনার ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ইসলাম যেগুলোকে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেছে। এ জন্য আপনাকে একজন মুমিন ও মুসলিম হিসেবে কিছু মৌলিক ও বড় প্রশ্নের উত্তর সব সময় মাথায় রাখতে হবে। আমি কে? কোত্থেকে আমার অস্তিত্ব? কোথায় আমার শেষ ঠিকানা? কী আমার অস্তিত্বের লক্ষ্য? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি আমার কাছে কী চান? এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'রিহলাতুল ইয়াকিন' সিরিজে। যখন এসব মৌলিক বিষয়ে আপনার বিশ্বাস সুস্পষ্ট ও স্থির থাকবে তখন শাখাগত বিষয়ে কোনো সংশয় আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, শাখাগত বিষয়ে অজ্ঞতা মৌলিক বিষয়কে নাকচ করে দেয় না। তাই যদি কোনো আয়াত-হাদিস বা শরিয়তের বিধান আপনার বিশ্বাস বা ঈমানকে নড়বড়ে করে দেয়, তাহলে আপনার জেনে রাখা উচিত যে, আপনার ঈমান উল্লেখিত স্তম্ভগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। কখনো কখনো আপনার মনে নারীর পর্দা, পুরুষের একাধিক স্ত্রী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন আসতেই পারে। তখন আপনি বিষয়টি নিয়ে সেই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হন, যা আমরা পূর্বের দুটি পর্বে অনুসরণ করেছি। প্রথমত আপনার মস্তিষ্কে স্থাপিত সঠিক ও ভুল নির্ণয়ের মানদণ্ডটি ঠিক করুন। তারপর শরিয়তের বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে সম্পর্কে জানুন। তারপর নব্য জাহিলিয়াতের বাস্তবতা সম্পর্কে জানুন। তবে এসব কিছু আপনি ঈমানের জন্য শর্তস্বরূপ করবেন না। বরং আপনার ঈমান মজবুত পাহাড়ের মতো অটল থাকবে। এর এই পন্থায় আপনি তাকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করে নেবেন। ঠিক যেমন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম করেছিলেন :

﴿قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾

'আল্লাহ বললেন, তুমি কি ঈমান আনোনি? তিনি বললেন, অবশ্যই; কিন্তু তা করেছি যাতে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়।'[১০০]

এসবের উদ্দেশ্য হবে শুধু নিজের বিশ্বাসকে মজবুত করা ও মহান রবের প্রতি নিজের বিশ্বাস ও আস্থার শেষ বিন্দুটুকু সঁপে দেয়ার উদ্দেশ্যে। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যখন আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলেন তখন আপনি এমন একজন রবের প্রতি ঈমান আনলেন যিনি,

---

১০০. সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬০

﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

'আসমানসমূহ ও জমিনের আলো।'[১০১]

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

'আসমানসমূহ ও জমিনের যাবতীয় চাবিকাঠি তাঁরই জন্য।'[১০২]

﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

'আসমানসমূহ ও জমিন এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর নামে তাসবিহ পাঠ করে।'[১০৩]

﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾

'জগতের সকল বস্তুই তাঁর প্রশংসার তাসবিহ জপে।'[১০৪]

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾

'তিনি সত্য ফয়সালা করেন।'[১০৫]

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

'আপনার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ইনসাফে পরিপূর্ণ।'[১০৬]

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

'তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় না। বরং অন্যদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১০৭]

---

১০১. সূরা নূর, ২৪ : ৩৫
১০২. সূরা শুরা, ৪২ : ১২
১০৩. সূরা নূর, ২৪ : ৪১
১০৪. সূরা বানি ইসরাইল, ১৭ : ৪৪
১০৫. সূরা মুমিন, ৪০ : ২০
১০৬. সূরা আনআম, ৬ : ১১৫
১০৭. সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৩

﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

'সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই জন্য।'[১০৮]

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

'তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর কর্তৃত্ববান। তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী।'[১০৯]

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾

'আমার দয়া সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে।'[১১০]

﴿قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

'তিনি সকল কিছুকে তাঁর জ্ঞান দিয়ে বেষ্টন করে আছেন।'[১১১]

আপনি যখন আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করলেন তখন আপনার ভেতর একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হলো। আপনার নিকট আল্লাহর দয়া, ইনসাফ ও প্রজ্ঞার নিদর্শনের প্রমাণ তৈরি হলো। তাই আপনি যদি শরিয়তের কোনো বিধানের মাঝে প্রজ্ঞা খুঁজে না পান, তাহলে আপনি আপনার ঈমানের ভিত্তিগুলোর দিকে আবারও দৃষ্টিপাত করুন। যে তরুণী একটি আয়াতের প্রজ্ঞা না বোঝার কারণে কিংবা একটি বিধান তার মনঃপূত না হওয়ার কারণে ইসলাম ত্যাগ করার ঘোষণা দেয়, সে আসলে ইসলামকে চিনতেই পারেনি। কোনো দিন সে সুদৃঢ় ঈমানকে ভেতরে লালন করেনি। এমনকি হতে পারে সে কুরআনের হাফিজা বা পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায়কারিণী—যেমনটি আমরা ইদানীংকালে শুনতে পাচ্ছি। অধিকাংশ মানুষের সমস্যা হলো, তাদের নিকট আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ইনসাফের এসব প্রমাণ ও মূলনীতির কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে খুব ঠুনকো কারণেই তার ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই আপনি যদি নিজের ভেতর কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে সংশয় অনুভব করেন, তাহলে তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণী,

---

১০৮. সূরা আরাফ, ৭ : ৫৪
১০৯. সূরা আনআম, ৬ : ১৮
১১০. সূরা আরাফ, ৭ : ১৫৬
১১১. সূরা তালাক, ৬৫ : ১২

لا يَموتَنَّ أحدُكُم إلَّا وهو يُحسِنُ باللهِ الظنَّ

'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ না করে।'[১১২]

তাই আপনি আপনার রবের নিকট সবচেয়ে বড় যে অনুভূতিটি নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন তা হলো, তাঁর বাণী ও শরিয়তের প্রতি সুধারণা। তাই তো আল্লাহ যখন কাফিরদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাবটির বর্ণনা দিলেন তখন বললেন :

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

'তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করেছেন। ফলে তিনি তাদের আমলকে বরবাদ করে দিয়েছেন।'[১১৩]

বিপরীতে তিনি যখন মুমিনদের প্রতি তাঁর সবচেয়ে বড় নিয়ামতের কথা প্রকাশ করলেন তখন বললেন :

﴿لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

'কিন্তু আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের হৃদয়ে তাকে সুশোভিত করে দিয়েছেন। আর কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। আর তারাই হলো পথপ্রাপ্ত। এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'[১১৪]

কোনো আয়াত বা বিশুদ্ধ হাদিস যদি আপনার কাছে ভালো না লাগে, তাহলে আপনি এই ভালো না লাগার পেছনে ছুটবেন না। বরং একজন মুসলিম হিসেবে তো আপনার মস্তিষ্কে একটি সঠিক চিন্তা ও জ্ঞানসমৃদ্ধ কর্মপদ্ধতি রয়েছে। যার ব্যবহারের পদ্ধতি আপনি বিগত দুটি পর্বে দেখেছেন। আপনি এবার আপনার অনুভূতিকে সেই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী বিবেচনা করুন। নিজেকে ঈমানকে আরেকবার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করুন। নিজেকে সম্বোধন করে বলুন :

---

১১২. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৮৭৭

১১৩. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৯

১১৪. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৭-৮

﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

'নিশ্চয় তা মহান কিতাব। মিথ্যে তাতে প্রবেশ করতে পারে না সামনে থেকে ও পেছন থেকে। তা মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ।'[১১৫]

এবার আপনি আপনার মস্তিষ্কে পূর্ব থেকে লালিত বা অবস্থিত সকল চিন্তাকে মুছে ফেলুন। এককথায় ফরমেট দিন। নব্য জাহিলিয়াতের শিক্ষাব্যবস্থা ও মিডিয়ার প্রভাবে যেসকল ধারণা আপনার মনে তৈরি হয়েছে, আপনি তাকে পরিপূর্ণ ভুলে যান। তারপর আপনি আপনার দীনকে অধ্যয়ন করুন। দেখবেন আপনার মস্তিষ্ক আল্লাহর ইনসাফ, প্রজ্ঞা ও দয়ার প্রতি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। আপনি তখন আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবেন। আল্লাহর কালামের সাথে অন্তরঙ্গতা অনুভব করবেন। এভাবেই আমরা আমাদের মানসিকতাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করতে পারি। আমাদের স্লোগান তো সেটাই, যা মুসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন :

﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾

'আমি আপনার নিকট দ্রুত ছুটে এসেছি হে রব! যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।'[১১৬]

আমাদের স্লোগান তো এটাই :

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন হে রব! আপনার নিকটই আমরা প্রত্যাবর্তন করব।'[১১৭]

আপনি যদি পূর্বের কয়েকটি পর্বের আলোচনা শুনে থাকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, কোনো আয়াতের প্রতি আপনার অনীহা আসলে আপনার মস্তিষ্কের সাথে তার সংঘর্ষ হওয়ার কারণে নয়। বরং তা আল্লাহর শত্রুদের অপপ্রচারের প্রভাবে আপনার মস্তিষ্কে কল্পিত কিছু ভুল চিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে। তাই যখন নিজের ভেতর এমন কোনো সংশয় অনুভব করবেন তখন এর দায় সর্বপ্রথম তাদেরকে দিন,

---

১১৫. সূরা হা-মিম সিজদা, ৪১ : ৪১-৪২
১১৬. সূরা ত্বহা, ২০ : ৮৪
১১৭. সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৫

যারা আপনার মাঝে সংশয় তৈরি করেছে।

﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾

'আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায়, যেন তোমরা চূড়ান্ত পথভ্রষ্টতার দিকে ঝুঁকে পড়ো।'[১১৮]

তারপর আপনি নিজেকে দোষারোপ করুন। নিজেকে বলুন, গুনাহের কারণে তোমার হৃদয়ের আয়না অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। তাই তুমি সত্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছ না। তারপর আপনার রবের দিকে ধবিত হন :

﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾

'সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে পলায়ন করো।'[১১৯]

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'আর আল্লাহ আহ্বান করেন শান্তির নিবাসে। আর তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকে সরল পথের দিশা দান করেন।'[১২০]

এবার আপনি নিজেকে সম্বোধন করে বলুন :

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করবে; অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে পছন্দ করবে; অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ জানেন। তোমরা জানো না।'[১২১]

বিশ্বাস স্থাপন করুন আপনার রবের এই বক্তব্যে :

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

---

১১৮. সূরা নিসা, ৪ : ২৭
১১৯. সূরা জারিয়াত, ৫১ : ৫০
১২০. সূরা ইউনুস ১০:২৫
১২১. সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৬

'আর আপনার প্রতিপালকের কথা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সত্যতা ও ইনসাফের দিক থেকে।'[১২২]

বর্ণনার ক্ষেত্রে তা সত্য এবং বিধানের ক্ষেত্রে তা ইনসাফপূর্ণ।

বিশ্বাস রাখুন আপনার নবীর এই বক্তব্যে,

ان الله اعطى كل ذى حق حقه

'আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধিকার দান করেছেন।'[১২৩]

আপনি গর্বভরে বলুন, হাজেরা আমার আদর্শ। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তাকে ও তাঁর সন্তানকে শস্যহীন উপত্যকায় ফেলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহই আপনাকে এমনটি আদেশ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন না।

আপনি গর্বভরে বলুন, উমাইমা আমার আদর্শ। কে উমাইমা? উমাইমা বিনতু রুকাইকা একজন সাহাবিয়া। নারীদের সাথে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে এসেছিলেন। তখন রাসূল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তো এই বাইয়াত রক্ষা করতে সক্ষম হবে না ও সামর্থ্য রাখবে না। তখন উমাইমা বললেন,

الله و رسوله ارحم بنا منا من انفسنا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চেয়ে অধিক দয়াবান।'[১২৪]

অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল যদি কোনো ফয়সালা করেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত যে তাতে আমাদের জন্য তারচেয়ে বেশি দয়া ও সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে, যা আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি করতে পারি। এটাই হলো আল্লাহর বিধানের প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ আপনাকে সর্বপ্রথম মনুষ্যত্ব দান করে সম্মানিত করেছেন। তারপর মুসলিম বানিয়ে সম্মানিত করেছেন। যদি কোনো মানুষ আপনার উপর অবিচার করে, তাহলে তার সমাধান মানুষের রবের শরিয়তে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ আপনার ত্রাণকর্তা।

১২২. সূরা আনআম, ৬ : ১১৫
১২৩. তবরানি, হাদিস নং : ১১৫৩২; সহিহ।
১২৪. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ১৫৯৭

প্রতিপক্ষ নন। তাই আপনার রবের প্রতি আপনি সুধারণা পোষণ করুন। বান্দা হিসেবে আপনার উচিত নয় তাঁর দিকে অনাস্থার দৃষ্টিতে তাকানো। বরং রবের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হবে সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের। আল্লাহ আপনার ত্রাণকর্তা। আপনার প্রতিপক্ষ নন। আমরা আপনাকে এ কথা বলছি না যে, আপনার সামনে দীনের নামে যেকোনো বিষয় উপস্থাপন করা হলে আপনি অবনত মস্তকে তা স্বীকার করে নিন। আমরা তো সেই জাতি, আল্লাহ যাদের কিতাবকে সংরক্ষিত রেখেছেন। নবীর হাদিস এখনো আমাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। আপনি যাচাই করুন যে, তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কি না। যদি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে যায়—কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সত্য ও ইনসাফপূর্ণ না হয়—তাহলে আপনি নিজেকে দোষারোপ করুন। বলুন, সমস্যা অবশ্যই আমার ভেতর। আমার রবের বিধান ত্রুটিমুক্ত। তিনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র।

তবে এ ক্ষেত্রে সব জায়গায়ই আপনি নিজেকে দোষারোপ করবেন না। কারণ হতে পারে, আপনার সামনে ইসলামের নামে যা উপস্থাপন করা হচ্ছে ইসলামের মাঝে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি, ইসলাম যে মানদণ্ড দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করে তা হলো সত্য ও ইনসাফের মানদণ্ড। স্বাধীনতা বা সমতার মানদণ্ড নয়। কারণ, সমতা কখনো কখনো মিথ্যা ও অবিচার হয়ে যায়। সুতরাং তাকে বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করা যায় না। প্রশ্ন হলো, যদি কোনো কিছুকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় আর যদি বাহ্যিকভাবে তাকে সত্য ও ইনসাফের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, তাহলে কী করণীয়? যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে জুলুম ও মিথ্যা মনে হয় এমন কিছুকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে আমরা কী করতে পারি? আপনি তখন সরাসরি তাকে সত্য ও ইনসাফের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অস্বীকার করবেন না। হতে পারে আপনি যাকে সত্য ও ইনসাফ ভাবছেন তা মূলত সত্য ও ইনসাফ নয়। কারণ, হতে পারে আপনার মাঝে এখন এমন কোনো কারণ বিদ্যমান রয়েছে যা শরিয়তের প্রতি আপনাকে অনাগ্রহী করে তুলছে। আপনি হয়তো এখনো তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেনই না।

প্রসিদ্ধ আলিমদের কেউ কেউ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু একবার তার দুই স্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে তাদেরকে তাদের চুল দিয়ে বেঁধে ফেললেন এবং প্রচণ্ড প্রহার করলেন। তার এক স্ত্রী ছিলেন আসমা বিনতু আবি বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। তিনি গিয়ে তার পিতার নিকট অভিযোগ করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, মেয়ে আমার! ধৈর্য ধরো। যুবাইর একজন নেককার ব্যক্তি। হতে পারে জান্নাতে তুমি তার স্ত্রী হবে। আমি শুনেছি, কোনো পুরুষ যদি কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করে, তাহলে জান্নাতে সে তার স্ত্রী হয়।

এটা শুনে আপনার মনে হতে পারে, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নারীর প্রতি এই অবিচার দেখেও চুপ রইলেন। আপনি হয়তো বলে ফেলবেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও নারীদের এমন আচরণের শিকার হতে হতো। এই ঘটনা হয়তো আপনার মস্তিষ্ককে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কথা মেনে নিতে বাধা প্রদান করবে। আপনি ভাবতে থাকবেন, ইসলাম হয়তো স্ত্রীর সাথে স্বামীর এই আচরণকে সমর্থন করে। আপনি যদি এমনটি ভেবে থাকেন, তাহলে ভুল করছেন। আপনার উচিত ছিল যার কাছ থেকে আপনি উপরের গল্পটি শুনেছেন তাকে বলা,

﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

'যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।'[১২৫]

যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এই ঘটনাটি কি সঠিক? ঘটনাটির কারণে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোনো জবাবদিহি করা হয়নি? আসলে উল্লেখিত ঘটনাটির কোনো সূত্রই নেই। ইলমুল হাদিসের মানদণ্ডে এটি সঠিক ঘটনা নয়। এ ঘটনার প্রতি আপনার বিদ্বেষ দীনের প্রতি বিদ্বেষের কারণে নয়। বরং এ বিদ্বেষ একটি অশুদ্ধ ঘটনার প্রতি। আর যদি তা বিশুদ্ধও হয় তবুও তার মানে এই নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনাটিকে সত্যায়ন করেছেন। এমনও নয় যে, তা ইসলাম সমর্থিত আচরণ। তারপরও আমরা বলব, ঘটনাটি সঠিক নয়।

এ জন্য আপনাকে অনুসন্ধানী মানসিকতা লালন করতে হবে। কোনো কিছু গ্রহণ করার আগে তার বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা যাচাই করতে হবে। এ আচরণ আপনি শুধু ইসলামের শত্রুদের সাথে করবেন তা-ই নয়; বরং যারা ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করেন তাদের বক্তব্যের সাথেও আপনার একই আচরণ হতে হবে। আমরা আপনাকে আল্লাহ ও তাঁর শরিয়তের সামনে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান করছি; ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে যা কিছু বলা হয় সবকিছুর সামনে আত্মসমর্পণ করতে বলছি না।

আপনি হয়তো বলবেন, বিষয়টি তো বেশ কঠিন হয়ে যাবে। তাহলে তো আমাদের মস্তিষ্ক থেকে কল্পিত চিত্রগুলো দূর করার জন্য ইলম অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শরিয়তের নামে কী কী জিনিস ভুল করে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা জানতে হবে। অনুসন্ধানী চিন্তা থাকতে হবে। প্রক্রিয়াটি তো বেশ কঠিন। হ্যাঁ, আমিও বলি এটা কঠিন। আপনি যদি নিজের মেধা ও সক্ষমতার উপর নির্ভর করতে যান, তাহলে তা

---

১২৫. সূরা বাকারাহ, ২ : ১১১

কঠিনই। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য না আসে, তাহলে একজন তরুণকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তার গবেষণাই যথেষ্ট। তাই এসব কিছু মাথায় রেখেই প্রতি রাকাত সালাতে পাঠ করুন :

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

'আপনি আমাদেরকে সরল পথের দিশা দিন।'[১২৬]

আপনি কি এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য আশা করেন? আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾

'হে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করে দেবেন সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য।'[১২৭]

আপনি সালাতের ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন, হিজাবের ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন, আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ককে অবহেলা করবেন, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কিছু শুনবেন বা দেখবেন আর বলবেন, আমি কিছু নেক আমল তো করি। আর নেক আমল গুনাহকে দূর করে দেয়। তাহলে আপনি জেনে রাখুন, আপনি নিজেকে একটি বিরাট স্বাদ ও প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত করছেন। আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার কালামের প্রতি ভালোবাসার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আপনি যদি আল্লাহর আনুগত্য করতেন এবং নিজেকে প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতেন, তাহলে আপনি নিজের ভেতর যে আলোকিত আভা অনুভব করতেন—তার স্বাদ থেকে আপনি নিজেকে বঞ্চিত করছেন। আর আল্লাহ বলেন :

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

'আর যারা আমার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারীদের সাথে আছেন।'[১২৮]

মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো আপনি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যান? তাহলে আল্লাহর কাছে তা স্বীকার করুন। তাঁর রহমত থেকে গ্রহণ করুন। আল্লাহ বলেন :

---

১২৬. সূরা ফাতিহা, ১ : ৬
১২৭. সূরা আনফাল, ৮ : ২৯
১২৮. সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৬৯

﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

'আরেকদল মানুষ রয়েছে, যারা তাদের অপরাধকে স্বীকার করেছে। তারা মিলিয়ে ফেলেছে কিছু নেককাজ ও কিছু গুনাহের কাজ। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, দয়াবান।'[১২৯]

অহংকার প্রদর্শন করবেন না। গুনাহকে হালকা মনে করবেন না। অজুহাত পেশ করতে যাবেন না। আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করবেন না। এ সবকিছুই জুলুম।

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

'আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।'[১৩০]

আল্লাহর কাছে তাঁর আনুগত্যের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করুন। যেন তিনি আপনাকে আপনার গুনাহ ও অপরাধের কারণে তাঁর পবিত্র কালাম ও শরিয়তের ভালোবাসার স্বাদ থেকে বঞ্চিত না করেন।

এসব কিছুর পরেও যদি আপনি আপনার ভেতরে শরিয়তের কোনো বিধানের প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করেন, তাহলে কাঁদুন। আল্লাহর জন্য কান্না করুন। বিনয়ী হন এবং বলুন, হে রব, আমি আপনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। বলুন, হে চিরঞ্জীব! আপনার রহমত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি আমার সব অবস্থা সংশোধন করে দিন। চোখের একটি পলক পরিমাণ সময়ও আপনি আমাকে আমার নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন না। তারপর স্মরণ করুন সেই হাদিসে কুদসিটি,

يا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَن هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ،

'হে আমার বান্দারা, তোমরা প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট; সে ব্যতীত, যাকে আমি পথ দেখিয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পথের দিশা প্রার্থনা করো। আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব।'[১৩১]

---

১২৯. সূরা তাওবা, ৯ : ১০২
১৩০. সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৮
১৩১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৭৭

যদি আপনি এসব কিছু করে থাকেন, তাহলে আপনি কল্যাণের উপর রয়েছেন। বিশ্বাসগত কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দেবেন না। শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলবে, আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন না। আল্লাহও আপনাকে ভালোবাসেন না। কারণ, আপনার অন্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতি সংশয় রয়েছে। বরং আপনি নিজের ভেতরের সেই বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করুন। আপনার রবের শরিয়তের সামনে নিজের হৃদয়কে অবনত করার চেষ্টা করুন। এটাই আপনার জন্য কল্যাণকর। কিছুতেই আপনি মনের বিদ্বেষ ও অসন্তোষকে প্রশয় দেবেন না। এগুলোকে নিজের মনে স্থায়ী হতে দেবেন না। এটাই গুরুত্বপূর্ণ। নিজে থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন এবং বিধানটির পক্ষে যত যুক্তি আছে সেগুলোকে বারবার স্মরণ করুন।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, সাহাবীদের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা আমাদের মনে এমন কিছু অনুভব করি যা মুখে বলাকে আমরা বড় অপরাধ মনে করি। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আসলেই এমন কিছু অনুভব করো?' তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

ذاك صريح الايمان

'এটাই স্পষ্ট ঈমান।'[১৩২]

যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহকে সম্মান করবেন এবং নিজের বিদ্বেষ ও অসন্তোষকে নিন্দনীয় কাজ মনে করবেন, ততক্ষণ আপনি ঈমানের উপর রয়েছেন। তাই কুমন্ত্রণাকে প্রশ্রয় দেবেন না।

আমরা এই সিরিজে পথ চলছি আমাদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। ঈমান হলো সেই স্তরের নাম, যেখানে পৌঁছলে বান্দার কাছে তার রবের দাসত্বের মহিমা বুঝে আসে। বস্তুবাদী মানসিকতা ও নিজেকে উপাস্য বানানোর এই দুর্গম সময়ে অনেক মানুষের কাছেই আল্লাহর দাসত্বের বিষয়টি মূল্যহীন হয়ে গেছে। এমনকি যারা নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবি করেন, তাদের মাঝেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। ঈমানের অর্থ তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আমার এক প্রিয় বন্ধু, নাম ইউসুফ। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকায়। এক সময় তার ভেতরে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তিমূলক প্রশ্ন উদিত হয় এবং সে ইসলামের প্রতি অনাস্থাশীল হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ইউসুফ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নাস্তিক প্রফেসরের সাথে কথা বলল।

১৩২. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৩২

লোকটি ছিল ইতিহাসের প্রফেসর। সে ইউসুফকে বলল, তোমরা আপত্তিগুলো কী বলো তো? ইউসুফ তাকে আপত্তিগুলো খুলে বলল। তার একটি মৌলিক আপত্তি ছিল বিবর্তনবাদ নিয়ে। নাস্তিক প্রফেসর তখন তাকে বলল, এই আপত্তিগুলো নিয়ে তুমি কী করছ? ইউসুফ বলল, যদি আমি এই আপত্তিগুলোর জবাব না পাই, তাহলে সম্ভবত আমি আর মুসলিম থাকব না। নাস্তিক প্রফেসর তখন তাকে বলল, না, না, এটা মূর্খতা। তুমি এসব প্রশ্নের জবাব তোমার ধর্মে পেয়ে যাবে। তোমার ধর্মের সবকিছু নিয়ে তুমি খুশি থাকার পরও শুধু কয়েকটি আপত্তির দোহাই দিয়ে তুমি ত্যাগ করবে? বিচার দিবসে তোমার উপাস্য যদি তোমাকে প্রশ্ন করেন, আমি তোমাকে সবকিছুর জবাব দিয়েছি। কিন্তু তুমি শুধু কয়েকটি প্রশ্নের জবাব না পেয়ে ইসলাম ত্যাগ করলে? তুমি এই বিষয়গুলোর মর্ম হয়তো অনুধাবন করতে পারোনি। অথবা আমি তোমাকে এগুলো দিয়ে পরীক্ষা করেছি। তোমার বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করেছি। এতটুকু বলার পর এবার নাস্তিক প্রফেসর ইউসুফকে বলল, তুমি বরং তোমার ধর্মকে আঁকড়ে ধরো। আর প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে থাকো। আর যদি সেগুলোর উত্তর খুঁজে না-ই পাও, তাহলে মনে রেখো, ধর্মের মাঝে আত্মসমর্পণের একটি নিয়ম রয়েছে। মনে করবে, প্রভু তোমাকে পরীক্ষা করছেন। ইউসুফ বলল, আমি তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনি যদি মুসলিম হতেন, তাহলে একজন ইমাম হতে পারতেন। এই নাস্তিক প্রফেসর যদিও মুসলিম নন, তবুও তিনি ঈমানের দর্শনটি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন—যা আজ মুসলিম নামধারী অনেকেই বুঝতে পারে না। ঈমান গ্রহণ করা মানে শুধু মুখে উচ্চারণ করা বা বিশেষ কিছু আচার পালন করা নয়। ঈমান মানে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ও দর্শনে প্রবেশ করা। এই নাস্তিক প্রফেসর যদি নিজের সাথে সত্যবাদী হন তাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন, তিনি নাস্তিকতার মাধ্যমে স্ববিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে আছেন। তার আদর্শিক অবস্থান সুদৃঢ় নয়। তার কাছে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে বড় বড় প্রশ্নগুলোর নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক উত্তর নেই। আমরা তার হিদায়াত কামনা করি।

বিষয়টি শুধু কয়েকটি প্রশ্নের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় যে, ইসলাম তার জবাব দিয়ে দেবে। বরং এটি একটি সামগ্রিকতার প্রশ্ন। ইসলাম কি সামগ্রিকভাবে দলিল, প্রমাণ ও যুক্তিনির্ভর কি না তা হলো দেখার বিষয়। ইসলামের বিধানগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র ও ন্যায়পরায়ণতা রয়েছে কি না তা হলো বিবেচ্য। সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ মানবীয় স্বভাবের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা দ্রষ্টব্য। কিছু মানুষের দুয়েকটি প্রশ্ন আর আপত্তির ভিত্তিতে গোটা ইসলামের যথার্থতা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়া হবে আপনার জন্য বোকামি। ইসলাম মানুষকে এমন কোনো বিষয় মেনে নিতে বলে না, যা তার বিবেক

ও স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। জগতের আর কোনো ধর্মের মাঝে আপনি এই বৈশিষ্ট্যটি অনুসন্ধান করে পাবেন না।

'ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা' ও 'আমি স্বাধীন' পর্ব দুটি যারা দেখেছে তাদের অধিকাংশের মন থেকেই সংশয় দূর হয়ে গেছে। 'আমি স্বাধীন' পর্বটির আপত্তির জবাব প্রকাশ করার আগে একজন প্রিয় ভাই আমাকে বলেছেন, 'ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা' পর্বটি দেখার পূর্বেও আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু যখন আপনার আলোচনা শুনলাম তখন আল্লাহর প্রজ্ঞার প্রতি আমার ঈমান ও আস্থা বেড়ে গেল। আমার বিশ্বাসের দালিলিক অবস্থান পরিষ্কার হলো। মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনি যদি আরও একটি অপশন এভাবে যুক্ত করতেন, 'আমার কোনো নেতিবাচক মানসিকতা বা সংশয় ছিল না; কিন্তু আমি পর্বটি থেকে উপকৃত হয়েছি' তাহলে ভালো হতো। তার এই কথা শুনে আমরা 'আমি স্বাধীন' পর্বটির মতামতের ক্ষেত্রে অপশনটি যুক্ত করেছি। ফলাফল এসেছে, যারা পূর্বে সংশয়গ্রস্ত ছিলেন না এমন প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষই পর্বটি থেকে উপকৃত হয়েছেন। যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের উদ্দেশে এবং যাদের সংশয় দূর হয়েছে তাদের উদ্দেশে বলছি, এই উপকারিতাটিকে আপনি আরও ছড়িয়ে দিন।

﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

'আপনিও ইহসান করুন, যেমনটি আল্লাহ আপনার প্রতি ইহসান করেছেন।'[১৩৩]

উপকারিতাটিকে ছড়িয়ে দিন। শুধু নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। প্রতিটি পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর কোন কোন বিষয় থেকে আপনি উপকৃত হলেন তা আমাদেরকে জানান। অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করুন। কল্যাণের প্রসারের ক্ষেত্রে হয়ে যান আল্লাহর সাহায্যকারী।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ﴾

'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর সাহায্যকারী।'[১৩৪]

অন্য মুসলিম ভাইদেরকে তাদের বিশ্বাসের স্বচ্ছতা ও হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জনে সহায়তা করুন। যাতে তারা সেই মহাদিবসে উপকৃত হতে পারে—

১৩৩. সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৭
১৩৪. সূরা সফ, ৬১ : ১৪

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

'যেদিন উপকার করবে না কোনো সম্পদ ও সন্তান। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।'[১৩৫]

এই পর্বটিকে পরিশিষ্ট ও সমাপ্তির মতো মনে হলেও এটিই শেষ নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় এর পরেও গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু পর্ব রয়েছে। আজকের পর্বের সারাংশ হলো, আপনার ঈমান যদি পূর্ব থেকেই সুদৃঢ় হয়ে থাকে, তাহলে আরও সুদৃঢ় হোক। আর যদি কুরআনের কোনো আয়াত বা ইসলামের কোনো বিধানের প্রতি আপনার সংশয় থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহর দাসত্বের অবস্থান ও রবের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করুন। ইলম অর্জন করুন। নিজের বিশ্বাস ও বিবেচনার মানদণ্ডকে সঠিক করুন। নব্য জাহিলিয়াতের যে শোভা আপনার হৃদয়ে ছিল তা দূর করে ফেলুন। শরিয়তের প্রতি সংশয়গুলোকে দূর করুন। আর সেই মহান রবকে ডাকুন, যিনি বলেছেন :

يا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَن هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ،

'হে আমার বান্দারা, তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট। তবে যাকে আমি পথের দিশা দিই, সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পথের দিশা চাও। আমি তোমাদেরকে পথের দিশা দেবো।'

আল্লাহর আনুগত্য ও ভয়কে আঁকড়ে ধরুন। তাহলে তিনি আপনার জন্য সত্য ও মিথ্যাকে পার্থক্য করে দেবেন। সদাচার করুন। যাতে তিনি আপনার প্রতি দয়া করেন এবং ঈমানকে আপনার নিকট প্রিয় করে দেন।

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সদাচারী বান্দাদের নিকটবর্তী।'[১৩৬]

---

১৩৫. সূরা শুয়ারা, ২৬ : ৮৮-৮৯
১৩৬. সূরা আরাফ, ৭ : ৫৬

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

আমরা এসে দেখলাম, প্রতিদিনের মতো আজও তরুণী বাইরে বের হচ্ছে।

: কোথায় যাচ্ছ হে তরুণী?

- বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে অফিসে। তারপর বাজারে। সেখান থেকে মিডিয়ায়।

: কোন লক্ষ্যে তুমি এসব জায়গায় যাচ্ছ?

- নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে।

: কার সামনে তুমি নিজেকে প্রমাণ করতে চাও?

- মানুষের সামনে। যাতে আমি নিজেকে সম্মান করতে পারি।

: কীভাবে?

- কর্মক্ষেত্র ও পড়ালেখায় সফলতা অর্জনের মাধ্যমে।

: এর মাধ্যমে তুমি কী প্রমাণ করতে চাও?

- প্রমাণ করতে চাই, আমি মেধা, সাহস ও দক্ষতার দিক থেকে অন্যদের থেকে কম নই।

: আচ্ছা ভালো। কিন্তু কে তোমাকে বলল, একজন নারী হিসেবে তোমার সফলতা নির্ণয়ের এই মানদণ্ডটি সঠিক? কে বলল, কর্মক্ষেত্রে সফলতার মানেই হলো তোমার নারীজীবনের সফলতা?

- মানুষ তো এটাকেই সফলতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে।

: তার মানে, তুমি মানুষের সামনে তাদের নির্ধারণকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ করতে চাচ্ছ?

- উম্মম... আমার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিজের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব সৃষ্টি করবে।

: নিজের প্রতি কেমন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করবে তা যদি তুমি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির উপর

ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে কি তুমি সত্যিকারের সফল হলে? তুমি কি নিজেকে শক্তিমান বলে প্রমাণ করতে পারলে? অন্যের নির্ধারিত মানদণ্ডে সফল হতে গিয়ে নিজের সুখকে তুমি বিকিয়ে দিলে? তুমি কখন সফল আর কখন ব্যর্থ—তা নির্ধারণ করার অধিকার কি মানুষের আছে? তা ছাড়া তোমার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের মানদণ্ড কি সত্য ও সঠিক? যদি তাদের এই মানদণ্ড হঠাৎ বদলে যায়, তখন তুমি কী করবে? তুমি কি জানো, তাদের মানদণ্ড যুগে যুগে বদলায়? তুমি কি তখন তাদের নির্ধারিত নতুন মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে? তুমি কি তখন তা করে মানসিকভাবে স্থির থাকতে পারবে? তুমি যদি তাদের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ না করো, তাহলে কী হবে?

– নিজেকে আমার ব্যর্থ মনে হবে।

: আচ্ছা, যদি এমন হতো, তুমি মেধাবী ও সাহসী; কিন্তু সমাজ তোমার উপর জুলুম করছে। তাদের মানসিকতা তোমার প্রতি অবিচার করছে। যেমন : তোমার চেয়ে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধু তোমার চেয়ে সুন্দরী হওয়ার কারণে তারা একজন নারীকে তোমার পরিবর্তে চাকরি দিচ্ছে, তখনো কি তুমি নিজেকে ব্যর্থ মনে করবে? কেন তুমি নিজের জীবনকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে সঁপে দেবে? তোমার জীবনের লক্ষ্য কি অন্যের খুশিমতো বাঁচা? আচ্ছা, কখনো কি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছ, তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? কখনো কি ভেবেছ, কে তুমি? কেন তুমি এই জীবন লাভ করলে? কী তোমার উদ্দেশ্য? যদি তুমি তোমার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারো, তারপরেই তো তোমার নিজেকে প্রমাণ করা ও নিজের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন আসবে। কারণ, তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করবে ও নিজের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে। একজন মুসলিম নারী হিসেবে তোমার লক্ষ্য কি অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন হওয়া উচিত নয়?

– কিন্তু আমি তো আমার ধর্মের বাইরে না গিয়েই নিজেকে প্রমাণ করতে চাচ্ছি। তাই আমি হিজাব পরে শিক্ষাঙ্গনে ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছি।

: এটা আসলে পশ্চিমাদের আমদানিকৃত চিন্তাকে ইসলামিকরণের চেষ্টা। কেমন যেন, ভেতরে কী চিন্তা আছে তা গোপন করে বাইরে থেকে একটি ইসলামি ট্যাগ লাগিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা। প্রথমত তুমি কী পরিধাণ করলে তা কোনো বিষয় নয়। বরং তোমাকে এ কাজে আসতে কে উদ্বুদ্ধ করল, তা হলো আলোচ্য বিষয়। দেখার বিষয় হলো তোমার সেই মানদণ্ড ও চিন্তাটি—যা তোমাকে এ কাজটি পর্যন্ত ধাবিত করেছে। পশ্চিমা বিশ্বে

নিজেকে প্রমাণ করার বিষয়টি জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। তাদের জীবনদর্শনে আল্লাহর কোনো স্থান নেই। তারা যত লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছে, তা শুধু পার্থিব জগতের উপর ভিত্তি করে। তাতে পরকালের কোনো প্রভাব নেই। তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত। তারা সেসবকেই সফলতা ও সুখ বলে নামকরণ করবে। কিন্তু আমরা যারা মুসলিম আমাদের তো জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও মানদণ্ড রয়েছে। আমাদের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও আদর্শ রয়েছে। তার ভিত্তিতেই আমরা জীবন ও পৃথিবীকে মূল্যায়ন করি। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও সৃষ্টির মূল লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে আমরা নিজেদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারি না।

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

'আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু শুধু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।'[১৩৭]

আমাদের জীবনের সবকিছুই ইবাদত। আল্লাহর দাসত্বকে নিজেদের মাঝে বাস্তবায়ন করার মাঝেই আমাদের সফলতা নিহিত। আমার পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, এটাই আমাদের সফলতা ও সুখের একমাত্র উৎস। আমরা তো আল্লাহর এই ওয়াদায় বিশ্বাস করি :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾

'পুরুষ কিংবা নারী যে-ই সৎকর্ম করবে, এমন অবস্থায় যে সে মুমিন, তাহলে আমি তাকে দান করব সুখময় জীবন।'[১৩৮]

আমাদের এই জীবনদর্শন পশ্চিমা বিশ্বের জীবনদর্শন থেকে একেবারে আলাদা। তাদের জীবনদর্শনের সারকথা হলো, নিজেকে এবং নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাতে হবে। রবের দাসত্বকে উপেক্ষা করতে হবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই বাণীই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ :

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾

'আর যে আমার স্মরণকে উপেক্ষা করবে, তার জন্য রয়েছে অনটনপূর্ণ জীবিকা।'[১৩৯]

---

১৩৭. সূরা আনআম, ৬ : ১৬২
১৩৮. সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭
১৩৯. সূরা ত্বহা, ২০ : ১২৪

যে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের জন্য চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন :

﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

'এ ব্যাপারেই যেন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে।'[১৪০]

তিনি আমাদের জন্য এ পথের নির্দেশিকা তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের হাতে তার ম্যাপ তুলে দিয়েছেন। এরপর আর কার অধিকার আছে আমাদের সফলতার মানদণ্ড নির্ধারণ করার? কে তার বেশি অধিকার রাখে—মানুষ নাকি বিশ্বজগতের অধিপতি? যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। রিযিক দান করেছেন। তাঁর হাতেই আমার ও আপনার সুখ। তাঁরই হাতে আমার ও আপনার দুর্ভাগ্য। আর তাঁরই নিকট আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। যদি মানুষের নির্ধারিত মানদণ্ড ভুল হয়, তাহলে কী হবে? যদি তাদের মানদণ্ডে নিজেকে প্রমাণ করতে গেলে তাদের রব অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তুমি কী করবে? আর যদি তুমি মানুষের রবের নিকট সফল ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হও, যদি এমন কিছু কাজ করো যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না, মানুষ তা দেখেওনি এবং তুমিও তাদের সামনে কোনো কিছু প্রমাণ করতে যাওনি, তাহলে কি তোমার এই কাজটি বৃথা যাবে? নিজেকে মূল্যায়ন করা ও সম্মান করার ক্ষেত্রে এ কাজটিকে তোমার মাঝে কোনোই প্রভাব ফেলবে না? আর যদি তুমি এসবের কোনো কিছু পরোয়া না করে শুধু মানুষকে খুশি করার কাজে লেগে পড়ো, তাহলে কি তুমি শুধু আখিরাত হারাবে? নাকি দুনিয়ার সুখ ও প্রশান্তিও তোমার থেকে বিদেয় নেবে? তোমার পরিণতি কি তেমন হবে না, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

'আর আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না, যাদের হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ করে দিয়েছি আর সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং তার বিষয়টি ছিল সীমালঙ্ঘন।'[১৪১]

জীবনের রশি তখন তোমার হাত থেকে ছুটে যাবে। হৃদয়ের প্রশান্তি হারিয়ে যাবে। তুমি তোমার রবকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবে। কাছের মানুষদের সাথে তোমার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। যার চিত্র আমরা পশ্চিমা বিশ্বে দেখে এসেছি। তাহলে তুমি কী করবে?

১৪০.সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩ : ২৬
১৪১.সূরা কাহফ, ১৮ : ২৮

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে নিজেকে প্রমাণ করবে? নাকি তাদের হাতেই তোমার বিচারক্ষমতা দিয়ে দেবে? তুমি কি তোমার লক্ষ্যটিকে সুদৃঢ় ও স্থির রাখবে? নাকি মানুষের মর্জিমতো যখন যেদিকে তারা চায় সেদিকে ঘোরাবে? নিজেকে কি তুমি তোমার রবের নির্ধারিত ইনসাফপূর্ণ মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করবে? নাকি মানবীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নিজেকে নির্ণয় করবে? নিজের হৃদয়কে কি তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থির করবে? নাকি মানুষের ইচ্ছে অনুযায়ী একের পর এক দিক বদলাবে? তুমি কি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে? নাকি তাকে তার নিজের মতো যেদিকে খুশি চলতে দেবে?

- এই কথাগুলো তো পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। আপনি কেন শুধু নারীদেরকে এসব কথা শোনাচ্ছেন?

: না। বরং নারী ও পুরুষের উভয়ের ক্ষেত্রেই কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। বরং কথাগুলো সাধারণ মানুষের মতো আমার নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং সকল দায়ীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ যদি দাওয়াহ দিতে চায় এবং মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে চায়, তার জন্য এই কথাগুলো জরুরি। তাকে মানুষের সন্তুষ্টি ও খুশি উপেক্ষা করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। মানুষের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার কোনো মানসিকতা তার থাকবে না। নিজেকে তিনি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করবেন না। যদি করেন, তাহলে তাকে মানুষের পছন্দনীয় কথা বলে বেড়াতে হবে; জরুরি কথা নয়। তাই পূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তা পুরুষ ও নারী উভয়ের উদ্দেশে। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ বলছে, এসব বিষয়ের বিপরীতে চলে তুলনামূলক নারীরা বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। কারণ, সুস্পষ্ট কোনো আদর্শ ছাড়া মানুষের চোখে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া এবং বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদীদের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য ও সুখকে বিসর্জন দেয়ার ফলে তাদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। যার কিছু চিত্র আমরা 'পশ্চিমা নারীর স্বাধীনতা' শিরোনামের আলোচনায় দেখেছি। তাই নারীদের প্রয়োজন আরও বেশি আত্মশুদ্ধি ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়া। প্রয়োজনে সে ঘর থেকে অবশ্যই বের হবে; কিন্তু অন্যদের চোখে নিজেকে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং নিজের লক্ষ্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে সামনে রেখে। নারী ঘর থেকে বের হবে সুস্পষ্ট আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে। মানসিকভাবে সে থাকবে সমৃদ্ধ। ইসলাম তো পুরুষের কর্তৃত্বের বিধান পিতার পিতৃত্বের স্নেহ দিয়েই তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাই রিক্তহস্তে দু-পয়সা কামানোর জন্য তার ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশেষত এই অন্ধকার সময়ে যখন অত্যাচার ও

অবিচার মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন নিজেকে অনিরাপদ স্থানে নিয়ে হুমকির মুখে ফেলার প্রয়োজন নেই। কারণ, মানুষের মাঝে ইসলামের প্রভাব যতটুকু থাকা প্রয়োজন ছিল আজ ততটুকু প্রভাব বস্তুবাদ তৈরি করেছে। যার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনই নিরাপত্তা-সংকটে পড়েছে। এ সময়ে নারী তার দীন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী বাইরের মানুষের সাথে আচরণ করে নিজের সম্মানকে সংরক্ষণ করবে। সুবিধাভোগী রাজনীতিক, পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী আর মানুষকে গোলাম বানানোর নেশায় মত্ত শাসকশ্রেণির শর্তানুযায়ী নিজেকে বিকিয়ে দেবে না।

- আমার মনে নিজেকে প্রমাণ করা বা এমন কোনো ইচ্ছাই নেই। আমি এমনিতেই কিছুদিন কাজ করছি, যাতে অন্যের কাঁধে বোঝা না হয়ে যাই। হতে পারে আমার বিয়ে হবে না। কিংবা বিয়ের পরে আমি আমার স্বামীর উপর আমার খরচকে বোঝা হিসেবে চাপাতে চাই না। অথবা আমি টাকার প্রয়োজনে কাজ করি। যাতে আমার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য অথবা মা-বাবার জন্য খরচ করতে পারি।

: এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তা সত্ত্বেও আমরা আজকের পর্বে যা উল্লেখ করছি, তা আমাদের নারী ও পুরুষ সকলের জন্য আবশ্যক। আমাদের কর্ম ও লক্ষ্যকে নির্ধারণ করার জন্য কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম নারী যখন তার দীনি চেতনার কারণে অন্যদের চেয়ে নিজেকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলবে এবং আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়নকে সামনে রেখে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং নিজের হৃদয়কে এ আদর্শের উপর অবিচল রাখবে, তখনই সে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারিণী হবে। তার কারণে তখন সমাজ ও জাতি উপকৃত হবে। সে তখন কারও অধিকার নষ্ট করবে না। কাউকে তার সম্মান ও অধিকার নষ্ট করার সুযোগ দেবে না। এ ক্ষেত্রে নারীর সফলতার তিনটি স্তর রয়েছে। এক. মৌলিক সফলতা। দুই. আনুষঙ্গিক সফলতা। তিন. অতিরিক্ত সফলতা।

প্রথমত মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা। এগুলো হলো সেসব ফরজে আইন বিষয়, যা প্রতিটি নারীর উপর আবশ্যক। যেমন : স্বচ্ছ তাওহিদের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাওহিদ পরিপন্থী বিষয়গুলোর ধোঁকা থেকে দূরে থাকা, সকল বিষয়ে আল্লাহকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া, ফরজ বিধানগুলো পালন করা, নিজেকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করা ও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখা ইত্যাদি। তার সাথে রয়েছে পারিবারিক বিষয়সমূহ। কন্যা, স্ত্রী, মা ও বোন হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা। আর এসব দায়িত্ব পালন করা যাতে তার জন্য সহজ হয় সে লক্ষ্যে ইলম অন্বেষণ করা। এই

ক্ষেত্রটিতে সফলতা অর্জন করা বয়স ও সম্পর্ক নির্বিশেষে প্রতিটি নারী ও তরুণীর জন্য আবশ্যকীয়। আল্লাহ যে সরল দীন দিয়ে আমাদের নবীকে প্রেরণ করেছেন তার একটি সুন্দর দিক হলো, মৌলিক এই ক্ষেত্রটিতে নারীর সফলতা অর্জন করা খুবই সহজ করে দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় তা এভাবে ব্যক্ত করা যায়,

إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها، وصامَت شهرَها، وحصَّنَتْ فرجَها، وأطاعَت زوجَها، قيلَ لها : ادخُلِ الجنَّةَ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ

'নারী যদি পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাদ্বানের সিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছে সেই দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করো।'[১৪২]

হ্যাঁ এর বাইরেও আত্মশুদ্ধি, পিতামাতার প্রতি সদাচার ও সন্তানদের সঠিক শিষ্টাচার শেখানো ইত্যাদি আরও দায়িত্ব নারীর রয়েছে। আর সবগুলো ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা অনেক বড় বিষয়। আল্লাহ যাকে তাওফিক দান করেন সে ব্যতীত সকলের জন্য তা সহজ নয়। এ জন্যই নারী তার সালাতে প্রতি রাকাতেই বলে,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।'[১৪৩]

এসকল ক্ষেত্রে সফলতা পুরুষের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার দায়িত্ব নিজেকে পরিশুদ্ধ করা এবং পরিবারকে পরিশুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। আর এ সবকিছুই প্রথম স্তর তথা মৌলিক সফলতার অন্তর্ভুক্ত।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।'[১৪৪]

প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করুন। তারপর পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। কিন্তু পুরুষের আনুষঙ্গিক আরও কিছু বিষয় রয়েছে। সে পিতা, স্বামী, ভাই কিংবা সন্তান হিসেবে নারীর দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত। পরিবারের নারীদেরকে সুরক্ষিত রাখা, তাদের খরচ জোগানো,

---

১৪২. সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ৪১৬৩; সহিহ।
১৪৩. সূরা ফাতিহা, ১ : ৫
১৪৪. সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৬

প্রয়োজন পূরণ করা ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব। একই দায়িত্ব তাকে তার সন্তানদের ক্ষেত্রে পালন করতে হবে। তাদের খরচ ও নিরাপত্তার দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে তার সফলতা মৌলিক বিষয়ে সফলতার অন্তর্ভুক্ত। যদি সে তা অর্জনে ত্রুটি করে, তাহলে সে অপরাধী বলে বিবেচ্য হবে। তাই পুরুষ ও নারীর সফলতার মানদণ্ড একই; কিন্তু সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব দিয়ে তৈরি করার কারণে উভয়ের দায়িত্ব ও কর্মের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নারীর অবশ্যই জানা থাকতে হবে যে, যদি সে এসব মৌলিক বিষয়ে সফল হয় তাহলে তার নিজের প্রতি সন্তুষ্টি ও সম্মান অনুভব করা উচিত। অন্যের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার মাঝে তার জন্য কোনো সম্মান নেই। তার সম্মান এসব কাজের মাঝেই নিহিত। কারণ এগুলো তাকে সেই লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে যায়, যা তার রব তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে তার রবের ইচ্ছে অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ করেছে। নিজের সামনে ও নিজের পরিবারে সামনে নিজেকে প্রমাণ করেছে—যে পরিবারের তাকে খুব প্রয়োজন ছিল এবং তারও যে পরিবারকে খুব প্রয়োজন ছিল। এটাই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ময়দান। নারী যদি এখানে সফল হয়, তাহলেই সে প্রকৃত অর্থে সফল। অন্য কোথাও আর তার সফলতা তালাশ করার দরকার নেই। কারণ অন্য কোনো সফলতা তার জীবনে ততটা গুরুত্ব বহন করে না, মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা যতটুকু গুরুত্ব বহন করে।

সফলতার দ্বিতীয় স্তর হলো আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা। সাধারণ মানুষকে উপকৃত করার ক্ষেত্রে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ। যেমন : সে শিক্ষিকা হবে বা ডাক্তার হবে—যা তার স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ক্ষেত্রটিকে আমরা বলি, মাধ্যম ছাড়া সরাসরি অংশগ্রহণ। কারণ, নারী যখন তার পারিবারিক দায়িত্ব পালন করবে তখন পুরুষের প্রতিটি সফলতাই তার সফলতা বলে বিবেচ্য হবে। পরিবারের দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে সে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার মিশনে অংশীদার হবে। জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। পৃথিবীর বুকে উম্মাহর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কাজে অংশীদার হবে। নারী আড়াল থেকে পুরুষের মেরুদণ্ডকে সোজা রাখবে। তাদেরকে মানসিক শক্তি জোগাবে। তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে। তার হাত ধরে গড়ে উঠবে একটি সফল প্রজন্ম। যে প্রজন্মের সফলতার গোপন কারিগর হবে নারী। যেন সে বাগানের মালী। তারই পরিচর্যায় ফুলে ফুলে ভরে উঠবে এ উদ্যান।

নারী যদি পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিবারের জন্য কাজ করে, তাহলে তার এই কাজ সরাসরি কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ইসলাম বলে,

انما الاعمال بالنيات

'নিশ্চয় সকল কর্মের ফলাফল নিয়তের ভিত্তিতে হয়।'[১৪৫]

আর যিনি এই মানদণ্ডটি নির্ধারণ করে দিচ্ছেন, তিনি কোনো মানুষ নন। বরং তিনি মানুষের রব। তাদের পালনকর্তা। তাদের স্রষ্টা। তিনি সহায়তা করাকে সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করা বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাই ইসলামের মূলনীতি হলো, কোনো কল্যাণকর কাজে দিকনির্দেশক ব্যক্তি তা সম্পাদনকারী ব্যক্তির মতোই। তাই যে নারী ঘরের ভেতরে থেকে পুরুষকে কল্যাণের পথে সহায়তা করে, পরিবারকে দেখভাল করে, পুরুষকে সাহস জোগায়—সেও পুরুষের মতোই প্রতিদান লাভ করবে। জগতের সকলের কাছ থেকে গোপন থাকলেও আল্লাহ্ নারীর এই ভূমিকার কথা জানবেন। তিনিই তাকে এর প্রতিদান দেবেন। অথচ বস্তুবাদী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে মানুষকে সংখ্যা না দেখাতে পারলে নারী সফল নয়।

- নারী যদি তার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালন করার পর পরিবারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে নিজের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কাজ করতে চায়—যেমন : সে শরিয়তসম্মত পরিবেশে কর্তৃত্ববান পুরুষের অনুমতি নিয়ে কোনো বৈধ কাজ করল—তাহলে তাকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে?

: অবশ্যই প্রশংসার দৃষ্টিতে। এসব কাজে মাঝে কিছু ফরজে কিফায়াও রয়েছে। এসব কাজ পৃথিবীকে আবাদকরণ ও দাসত্বের মর্মকে বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা কিছু নারীর কর্তব্য; সকলের উপর তা আবশ্যক নয়। যদি একদল নারী ও তরুণী এসব দায়িত্ব পালন করে, তাহলেই তার উপকারিতা পাওয়া যায়। আর যারা এসব দায়িত্ব পালন করবে, তারা নিজেকে প্রমাণ করার জন্য তা করবে না। বরং মানুষের বাস্তবিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে করবে।

- তাহলে আর সমস্যা কোথায়?

: সমস্যা হলো, যেসব নারীরা দ্বিতীয় স্তরের এই আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে অংশগ্রহণ করে তাদের ১০০% নারী ও তরুণীরই বিবেচনার মানদণ্ড ও শ্রেষ্ঠত্বের

---

১৪৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ০১

লক্ষ্যমাত্রা ঠিক নেই। যখন প্রতিটি তরুণীকে এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা সামাজিক সভ্যতায় পরিণত করার চেষ্টা করা হবে এবং এসব ক্ষেত্রে সফলতাকেই একমাত্র সফলতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে, তখনই সমস্যা তৈরি হবে। যখন একাডেমিকভাবে, সামাজিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে আনুষঙ্গিক এই সফলতাকেই মৌলিক হিসেবে দেখানো হবে, তখন মুসলিম উম্মাহর সাথে পুঁজিবাদীদের আর কোনো পার্থক্যরেখা বিদ্যমান থাকবে না। তখন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এসব ক্ষেত্রের ব্যর্থতাকেই মুসলিম নারীরা নিজেদের ব্যর্থতা ও অনগ্রসরতার কারণ ভাবতে থাকবে। তাদের চোখে তখন আল্লাহপ্রদত্ত মানদণ্ডের পরিবর্তে পুঁজিবাদী মানদণ্ডকেই সঠিক ও বিবেচনাযোগ্য মনে হবে। আর এসব কিছু মুসলিম নারীদের চোখে মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতাকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের কাছে কাজটিকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছে। অথচ কাজটি ছিল সঠিক শক্তিশালী ও আদর্শবান ব্যক্তি ও সভ্যতা তৈরি করা। এমন একটি জাতি তৈরি করা, যারা নিজেদেরকে সম্মান করতে জানবে। নিজেদের মূল্যায়ন করতে শিখবে। রবের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সফল হবে। নিজেদের পারিবারিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে। কিন্তু নারী যখন দ্বিতীয় আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রটিকেই তার সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি মনে করবে, তখন তার প্রথম ও মৌলিক ক্ষেত্রের সফলতাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেখানে বিরাট শূন্যতা তৈরি হবে। তখন সে নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক ও নিজের সাথে রবের সম্পর্ককে গুলিয়ে ফেলবে। পশ্চিমাদের ফিল্ম, মিউজিক আর ড্রামা তার মাঝে তখন প্রভাব ফেলতে শুরু করবে। একই সাথে তার কাছে পরিবারব্যবস্থা ও বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব কমে আসবে। এগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে করবে। নিজের মাঝে সে তখন পুরুষের প্রতিপক্ষ হওয়ার মানসিকতা চাষাবাদ করবে। প্রথম ক্ষেত্রে যারা সফল, সেসব নারীদেরকে সে উপহাস করবে। যেসব নারী তাদের পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সফল, সন্তান প্রতিপালনে সফল—তাদেরকে তারা বেকারের খাতায় গণনা করবে। তারপর অন্য তরুণীদেরকে বলবে, বের হয়ে এসো। এসো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কর্মাঙ্গনে যোগদান করো। ব্যর্থতা আর বেকারত্বের অনুভূতি থেকে মুক্তি লাভ করো। তার কথা শুনে অন্য তরুণীরা উচ্চশিক্ষা আর কাজের ময়দানে বেরিয়ে পড়বে। অথচ তারা দুর্বল, ভীত, পেরেশান ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। কাজ তাদের কাছে এমন একটি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, যার জন্য তারা নিজেকে ও নিজের ঈমানকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। ফলে মৌলিক ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা দিনদিন বাড়তেই লাগল। তার এই কাজ তখন তার জন্য অপদস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। খুব সহজেই পুঁজিবাদী আর স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের গোলামে পরিণত হলো। কারণ কাজের জন্য তাকে সেই পরিবেশে প্রবেশ করতে হলো, যার নিয়ন্ত্রণ এসব বাজে লোকদের হাতে। তারাই সেখানে শর্তারোপ করে ও সেখান থেকে ফায়দা লুটে।

এ সবকিছুই নারী করে গেল নিজেকে প্রমাণ করার জন্য। তাকে বোঝানো হলো, ঘরের ভেতরে সে ব্যর্থ। তার মৌলিক কাজগুলো কোনো কাজই নয়। এসব কথায় সে বিভ্রান্ত হলো। তাকে যারা এ পথে নামাল, তারা তার সামনে বিভিন্ন কৃত্রিম সংকট ও সমস্যা উপস্থাপন করল। কাজের জন্য তাকে শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হবে বলে বোঝাল। সেগুলোকে পরোয়া না করার উপদেশ বিলিয়ে গেল। এভাবে নারীকে নিজেদের করায়ত্ত করে তারা নিজেদের সুবিধা লুটে নিল। আর নারী নিজেকে ও নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সেই কল্পিত সফলতার পিছু ছুটতে লাগল। দিনশেষে সে পশ্চিমা নারীর মতোই দুর্ভোগ নিয়ে বাড়ি ফিরল।

নারী যখন আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার জন্য সেখানে পদার্পণ করে, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে মৌলিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি ছিল তার জন্য আনুষঙ্গিক ও ঐচ্ছিক। সেখানে পদার্পণ করেই সে নিজের লক্ষ্য, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও আত্মপরিচয়ের কথা ভুলে যায়। ফলে সে নিজের উপর অবিচার করে। নিজের দুর্বল চিত্তটিকে ভুল স্থান ও ব্যক্তির কাছে অর্পণ করে। এসব নারীরা কখনো কখনো বিয়ে করছে এবং তাদের দ্বারা গঠিত পরিবারের অবস্থাও তাদের মতোই হচ্ছে। ফলে তার জাতির মাঝে তার মতো ব্যক্তির সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখানে এসে অনেক নারী ও তরুণী আমাদেরকে বলবে,

- কিন্তু আমি তো একই সাথে দুটি সফলতার সমন্বয় করতে পারি। মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারি এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারি।

: আপনার প্রশ্নের জবাব আমরা ভবিষ্যতের কোনো আশঙ্কা প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রদান করব না। বরং চাক্ষুষ বাস্তবতাই আপনাকে দেখাব। আপনার মতো যারা এভাবে নিজের আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে তাদের বাস্তবতা কী হয়? নারী যখন প্রচলিত কোনো কোম্পানির চাকরিতে যোগদান করে এবং আট ঘণ্টা কাজ করে তখন তার শরীরে আর কতটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকে? তার জন্য তখন মৌলিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার আর কতটুকু সুযোগ থাকে? পারিবারিক কাজে তখন সে শক্তি পায় না। পরিবার গঠনে তার ভূমিকা তখন শিথিল হয়ে পড়ে। অথচ পরিবার গঠন ও সন্তান লালনপালনে তার কোনো বিকল্প নেই। দিনভর অফিসে কাজ করে ঘরে ফেরা নারী তার পারিবারিক দায়িত্বগুলো চাইলেও পালন করতে পারে না। বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হয়, এখন থাকুক। পরে করব। অথচ অফিসের কাজে সে কোনো বিলম্ব করে না। বছরের পর বছর একই সময়ে অফিসে প্রবেশ করে এবং একই সময়ে অফিস থেকে বের হয়। আর পরিবারের কাজকে

সে স্থগিত করে দেয় এবং বিলম্বিত করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে মৌলিক বিষয়ের চেয়ে আনুষঙ্গিক বিষয়ই তার কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়ে যায়। কখনো কখনো তার মাঝে মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। তার প্রভাব তার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের উপর পড়ে। পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার মানে সব সময় বিবাহবিচ্ছেদ নয়। বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়াও বহু পরিবার আজ একই ছাদের নিচে সম্পর্কহীন জীবনযাপন করছে। কখনো কখনো সেই সম্পর্কগুলো বিবাহবিচ্ছেদের চেয়ে নিকৃষ্ট আকার ধারণ করছে।

অল্পসংখ্যক নারী কখনো কখনো উভয় ক্ষেত্রে সফলতার মাঝে সমন্বয় করতে পারে। কিন্তু এই সংখ্যাটা খুবই দুর্লভ। যার উপর ভিত্তি করে সাধারণভাবে বিধান প্রয়োগ করা চলে না। এটাকে মূলনীতি বানিয়ে সমাজ চলতে পারে না। এই দুর্লভ সফলতার উপর ভিত্তি করে কোনো সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাহলে কীভাবে এ ব্যাপারে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে? অথচ মিডিয়া আমাদের সামনে তৃতীয় ক্ষেত্রে নারীর সফলতাগুলোর কথা জোরালোভাবে প্রচার করে। যে সফলতাকে আমরা বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা বলতে পারি। মিডিয়া নারীকে উদ্বুদ্ধ করছে মডেল হতে। অভিনেত্রী হতে। সাংবাদিক হতে। কোম্পানির পরিচালক হতে। যখন কোনো নারী এমন কিছু হয়ে দেখায় তখন সকল নারীর সামনে তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সমাজের নারীরা তখন তাদের সাথে নিজেদেরকে তুলনা করতে শুরু করে। তাদের মতো হতে না পারলে নিজেদেরকে ব্যর্থ ও বেকার মনে করে। আর সমাজের সকল নারীর জন্য তা অর্জন করা কীভাবে সম্ভব হবে? সবাইকে তো দুর্লভ ও বিচ্ছিন্ন স্বভাব দিয়ে তৈরি করা হয়নি। এসব দেখে তরুণীরা এই বিচ্ছিন্ন সফলতা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথম ও মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা ও কর্তব্যের কথা অবলীলায় ভুলে যায়। অথচ সামাজিক সভ্যতা এভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যথার্থ ছিল যে, নারী একটি স্তরে পুরোপুরি সফল না হয়ে তার পরবর্তী স্তরে পদার্পণ করতে পারবে না। নতুবা তার অবস্থা হবে সেই ডাক্তারের মতো, যে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীকে কোনোপ্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়াই স্পর্শ করে। সে দাবি করে যে, মানুষের চিকিৎসা করা খুব ভালো ও উপকারী কাজ।

হ্যাঁ, উম্মাহর মাঝে দুর্লভ ও বিরল প্রতিভার অধিকারিণী অনেক নারীও ছিলেন। যেমন : খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। যাকে সমকালীন পরিভাষায়ও সফল নারী বলা যায়। তিনি তার সম্পদ দিয়ে দাওয়াতের মিশনকে এগিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু একই সময়ে তিনি তার মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতেও সফলতার উপমা ছিলেন। তাই একজন মুমিন নারী সব সময় তার নবীর এই হাদিস স্মরণ রাখবে,

اعط كل ذى حق حقه

'প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দাও।'[১৪৬]

স্মরণ রাখবে,

وهى مسؤولة عن رعيتها

'নারীকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১৪৭]

তাই সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন সফলতাকে প্রাধান্য দেবে না, যা তার উপর দায়িত্ব হিসেবে আরোপ করা হয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার পুরোপুরি বুঝিয়ে না দিয়ে সে আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রেও মনোযোগী হবে না। নতুবা তার অবস্থা হবে সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মতো, যে ঋণ আদায় না করে মানুষকে দান করে বেড়ায়। মৌলিক বিষয়ে সফল নারী কখনো কখনো তার বাড়িতে বসে বা বাড়ির বাইরে পার্টটাইম বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, যদি সে নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালনে নিশ্চয়তা দিতে পারে। কিন্তু মৌলিক কাজের উপর তাকে প্রাধান্য দিতে পারে না। বড় একটি সময় সেখানে অতিবাহিত করতে পারে না। মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে বা সন্তানদের সময় দিতে তাকে অবশ্যই পারিবারিক দায়িত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। যদি সে তার দায়িত্ব পালন করে এবং সন্তানদের সুশিষ্টাচার নিশ্চিত করে কিছু সময় আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য দিতে চায়, তাহলে তার জন্য সে সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো তাড়াহুড়ো চলবে না। কারণ, এটা তার মৌলিক দায়িত্ব। আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন না করতে পারলে সে নিজেকে ব্যর্থ বা বেকার মনে করবে না। কারণ মৌলিক ক্ষেত্রে সে যে দায়িত্ব পালন করছে তা জগতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এ ক্ষেত্রে কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর কোনো বিকল্প নেই। আরও একবার বলতে চাই, এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মাঝে পার্থক্য কেন? পার্থক্যে কারণ হলো, ইসলাম পুরুষের উপর স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ আবশ্যক করে দিয়েছে। তাদের সুরক্ষা, উপযুক্ত বাসস্থান ও নিরাপদ বসবাসের ব্যবস্থার করার দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে। এসব ক্ষেত্রে পুরুষের সফলতা তার মৌলিক সফলতার অন্তর্ভুক্ত। যদি সে এসব ক্ষেত্রে ত্রুটি করে, তাহলে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের ব্যাপারে নারীকে যা বলা হয়েছে পুরুষকেও একই কথা বলা হবে এবং উভয়ের

১৪৬. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ২১২১
১৪৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮২৯

শ্রেষ্ঠত্ব মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতার ভিত্তিতে বিবেচিত হবে। পুরুষ জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করবে মানুষের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর দাসত্বের মর্ম নিজের জীবনে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। তাই পুরুষ কর্মসংস্থানে সম্পদের মোহে, নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে বা অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার মানসিকতায় যোগদান করবে না। বরং সে কর্মসংস্থানে যোগ দেবে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণ জোগানের উদ্দেশ্যে। তাদের হক সঠিকভাবে আদায় করার নিয়তে। তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্তে। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সে যদি সময় ব্যয় করে, তাহলে সে সেই নারীর মতোই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে, যে নিজের মৌলিক কাজে অবহেলা করেছে।

এতটুকু শোনার পর আপনার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উদিত হতে পারে। কেউ হয়তো বলতে পারেন, আমাদেরকে বিয়ে এবং পরিবার গঠনে আগ্রহী করে তোলার জন্য আপনি এসব কথা বলছেন না তো? এভাবে কি আপনি আমাদেরকে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করতে চান? নারী তাহলে শুধু ঘরের কাজ নিয়েই পড়ে থাকবে? যদি স্বামী ও সন্তানদের সাথে তার ভালো না লাগে, তাহলে সে কী করবে? তার শরিয়তসম্মত কাজে আপনি কি এত দোষ খুঁজে পান? আপনারা সন্তান প্রতিপালনের কথা বলেন। আপনাদের কথার মর্ম হলো, অন্যকে আলোকিত করার জন্য নিজে মোমবাতি হয়ে জ্বলে যাও। আচ্ছা, নারীর কাজ ও তার যোগ্যতাই কি তার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়?

আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমরা সামনে দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আজকের বক্তব্যের সারংশ হলো, আপনি একজন মুসলিম নারী। আপনার আলাদা বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য রয়েছে। আপনি সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে নিজেকে প্রমাণ করুন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুন। এখানেই আপনার প্রকৃত সফলতা। এটাই আপনার প্রতিযোগিতার স্থান। এখান থেকেই আপনার ব্যক্তিত্ব সঠিক, সুন্দর ও শক্তিশালী আকার ধারণ করবে। আপনি একজন সফল ও সুখী মানুষে পরিণত হবেন। আপনি নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারবেন। নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। সন্তুষ্ট করতে পারবেন আপনার রবকে।

বিয়ে ও কল্পিত প্রেম

যখন আমরা নারীকে বলি, নিজেকে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে বিমুখ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আর অফিসে ঘুরে বেড়িয়ো না তখন তার মস্তিষ্কে যা আসে তা হলো, আমরা যেন তাকে বলছি, বোন, বিয়ে করো, ঘরে বসে স্বামীর মনোরঞ্জন করো আর সন্তান প্রতিপালন করো। না, আমরা এমনটি বলছি না। আমরা যেমন তাকে নিজেকে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে বিমুখ হতে নিষেধ করছি তেমনই তাকে বিশ্ববিদ্যালয় আর অফিস থেকে বিমুখ হয়ে বিয়ে করে ফেলতে বলছি না। কিন্তু যে বিয়ে করে নিয়েছে তাকে আমরা অবশ্যই পরামর্শ দিতে পারি, যাতে সে একজন সফল স্ত্রী ও সফল প্রতিপালনকারী মা হয়ে উঠতে পারে। তবে যে এখনো বিয়ে করেনি এবং তার মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে সফলতা অর্জন করতে পারেনি, অর্থাৎ নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক ও নিজের সাথে রবের সম্পর্ককে দুরস্ত করতে পারেনি, তার বিয়ে অধিকাংশ সময়ই মৌলিক ক্ষেত্রে সফলতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সে তখন ভুল পথে নিজেকে খুঁজে বেড়ায় এবং নিজেকে ও পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক বলতে অনেক ব্যাপক কিছু বিষয়কে বোঝায়। যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এক কথায় শ্রোতার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি নিয়ে এই পর্বের শেষের দিকে আমরা কিছু কথা বলব। নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার কিছু পথ ও পন্থা বাতলে দেবো। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে চয়নকৃত কিছু অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরে আপনাদের জ্ঞান ও আত্মোপলব্ধিকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আজকের নারীরা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ব্যাপারে অচেতন। সাম্রাজ্যবাদীরা এ সুযোগে তাদের ভেতর কল্পিত রোমান্সের বীজ বপন করে দিয়েছে। হলিউডের বিভিন্ন মুভি আর চরিত্র দিয়ে তাদের মনে প্রেমের সম্পর্কের একটি চিত্র দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাই আজ মুসলিম নারীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সুখী বা তৃপ্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে কল্পিত সেই প্রেম ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। কারণ, এ নারী নিজের সাথে নিজে অন্তরঙ্গবোধ করে না। তার রবের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে মনে করে, বিয়ে হলো তার কল্পিত সেই প্রেমের শরিয়তসম্মত পন্থা। এর মাধ্যমেই সে তার সুখ খুঁজে পাবে। এই মানসিকতা নিয়ে সে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে। এসব বাস্তবতা বিবর্জিত স্বপ্ন আর কল্পনা নিয়ে সে নতুন

জীবন শুরু করে। আর সঙ্গীর কাছে আশা করে, সে তার মনের শূন্যতাকে রোমান্টিক মুভির সেই নায়কের মতো করে পূর্ণ করে দেবে। এভাবেই তার সারা জীবন কেটে যাবে।

ওদিকে বাস্তবতা হলো, বিয়ে তার কল্পিত সেই সম্পর্কের শরয়ি সংস্করণ নয়। বিয়ে যদি সঠিক ও সফলও হয়, তবুও তা তার কল্পিত সেই চিত্রের সাথে মিলবে না। হয়তো প্রাথমিকভাবে একটি নতুন সম্পর্কে মধুরতা থাকবে, কিন্তু তা হলিউডের সেই কল্পিত রোমান্সের রূপ ধারণ করবে না। তারপর উভয়কে স্বাভাবিক জীবনে অনুপ্রবেশ করতে হবে। জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। পারিবারিক ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়তে হবে। সম্পর্কের বিভিন্ন দাবি ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর আমাদের সমাজে তো এই বাস্তবতা আরও জটিল। এখানে মানুষকে উপার্জনের জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। জীবনের প্রয়োজনে তাই স্ত্রী চাইলেও স্বামীর পক্ষে ঘরে সময় দেয়া সম্ভব হয় না। এতকিছুর পরেও একটি সফল বিয়েতে সুন্দর সম্পর্ক থাকে। সকল দায়বদ্ধতা ও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ভালোবাসা ও প্রেম অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু যে নারী তার মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে তখন মানসিক শূন্যতা অনুভব করতে শুরু করে। তার কল্পিত সব স্বপ্ন ও আশাকে ব্যর্থ হতে দেখে সে হতাশ হয়। নিষিদ্ধ সম্পর্ককে ধোঁকাবাজ মিডিয়া তার সামনে যেভাবে মধুময় করে ফুটিয়ে তুলেছিল বাস্তবে হালাল সম্পর্কের মাঝে সে তা খুঁজে পায় না। আর সেসব নিষিদ্ধ সম্পর্কের পরিণতির চিত্র তো আমরা আপনাদেরকে 'ইসলাম ও নারীর প্রতি সহিংসতা' পর্বে কিছুটা দেখিয়েছি। পশ্চিমা মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত আমাদের সেসব মেয়েদের বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের আশানুরূপ হয় না। তাকে সেখানে এমন কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়, যা পালন করার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুতই করেনি। ফলে বিয়েটা তার জন্য আপদ হয়ে যায়। অবশেষে সে সেখান থেকে পালানোর পথ খোঁজে। সেখান থেকে পালানোর জন্য যে নিজেকে প্রমাণ করার রাস্তা বেছে নেয়। এভাবে নিজেকে সে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের জালে আটকে ফেলে। তখন তার কাজ হয় অন্যদের দৃষ্টিতে নিজেকে সফল প্রমাণ করা, সমাজের তৈরি মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলা ইত্যাদি। সেখান থেকে সে এমন কিছু প্রশংসা ও মূল্যায়ন আশা করে, যা সে তার বৈবাহিক সম্পর্কে খুঁজে পায়নি। কখনো কখনো তার তাকওয়া আরও নিম্নস্তরে নেমে যায়। তখন সে তার কর্মক্ষেত্রের বস, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বা সহকর্মীদের সাথে নিষিদ্ধ সম্পর্কে জড়িয়ে কল্পিত সেই রোমান্সের স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। এভাবেই সে নিজের থেকে পালিয়ে বিয়ের কাছে আশ্রয় নেয়। তারপর বিয়ে থেকে পালিয়ে ডিগ্রি অর্জন, কর্মক্ষেত্র গ্রহণ বা পুঁজিবাদীদের অন্য কোনো দুর্গে আশ্রয় নেয়। এ অবস্থায়

পারিবারিক সম্পর্ককে নামেমাত্র অব্যাহত রেখে যদি সে সন্তানও জন্ম দেয়, তাহলে সে সন্তান হয় তার মতোই দুর্বল চিত্তের। হয় আত্মপরিচয়হীন ও বঞ্চিত।

বিয়ে হলো মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজন পূরণের জন্য জবাবদিহিমূলক সম্পর্কের নাম। জৈবিক চাহিদা ও মানসিক শূন্যতা পূরণ করে জীবনকে অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এই সম্পর্কটি দান করেছেন। এই মানসিক প্রয়োজনগুলোকে এখন মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণ ও তরুণীদের কাছে অস্বাভাবিক ও বাস্তবতা বিরোধী বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে তাদের মাঝে একটি কল্পিত মানসিক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। তারা ভাবছে, এই শূন্যতা পূরণের বৈধ পথ হলো বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পর যখন বাস্তবতার সাথে তাদের সেই কল্পিত চিত্রের অমিল প্রকাশ পেতে থাকে তখনই তারা বিয়ের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং জীবন থেকে পলায়নের পথ খোঁজে। তাই এখন সমাজের বহু মা-বাবার কাছ থেকে শোনা যায়, তাদের সন্তানরা বিয়ের পর বলছে, আমি বুঝেশুনে বিয়ে করিনি। বাস্তবে দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই উভয়ের পক্ষ থেকে এমন কিছুর সম্মুখীন হয়, যা সে কখনো আশাই করেনি। তাই নিজেকে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে পলায়ন করে বিয়ে করাটা গ্রহণযোগ্য কোনো কাজ নয়। কারণ, বিয়েটা কোনো আত্মসংশোধন নয়। এটা কোনো কল্পিত চাহিদা পূরণের বৈধ মাধ্যম নয়। এটা কোনো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নয়। এটা কোনো মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে মানসিক শূন্যতা তৈরি হয় তা পূর্ণ করার ব্যবস্থাও নয়। নয় এটা হলিউডের চিত্রিত রোমান্সের শরিয়তসম্মত পন্থা। বরং বিয়ে একটি নিয়ামত। আল্লাহ অনুগ্রহ করে যা আমাদেরকে দান করেছেন। এটা প্রশান্তি, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন। এটা সেই পরিবারব্যবস্থার ভিত্তি, যার উপর নির্ভর করে শত্রুদের বিরুদ্ধে উম্মাহর বিজয়। কিন্তু বিয়ে থেকে সঠিক উপকারিতা লাভ করতে হলে আমাদের প্রথমে আল্লাহর অনুগত হতে হবে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের সময়ের অধিকাংশ তরুণ ও তরুণী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর। এ ব্যাপারে তাদের অচেতনতা এতটাই গভীর যে, বিয়ের অনুষ্ঠানের রাতেও তারা এমন সব কাজে লিপ্ত হয় যা নিকৃষ্টতম নাফরমানির অন্তর্ভুক্ত। নিজের মৌলিক দায়িত্ব তথা নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তারা নতুন জীবন শুরু করে। তারপর সুখময় জীবনের আশায় রাতদিন অতিবাহিত করে। বরং সেই কল্পিত সুখ আর রোমান্সের আশায় থাকে। হ্যাঁ, এসব করা ছাড়াও যারা সঠিকভাবে দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করে তাদের মাঝেও পারিবারিক কলহ তৈরি হয়। কিন্তু তার পরিমাণ বেশি নয়। তার পরিস্থিতিও ব্যাপক নয়। সংখ্যাও এতটা বেশি নয় যে, সমাজের সামনে তা ফলাও করে প্রচার করতে হবে।

বিয়ের আগেই আপনার প্রয়োজন নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়া। উপকারী ইলম অর্জন করে নেয়া। নিজের সাথে ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে এতটা দৃঢ় করে নেয়া, যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভূত হয়। প্রয়োজন নিজের জীবনের লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে নেয়া। নিজের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে বুঝে নেয়া। যেমনটি আমরা আগের পর্বে আলোচনা করেছি। বিয়ের আগেই আপনার মন ও মানসিকতাকে পরিপক্ব ও সমৃদ্ধ করে নেয়া উচিত। যাতে আপনি নিজের অবস্থানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে পারেন। বিয়ের আগেই আপনার এসব প্রয়োজন। তাহলে আপনি বিয়ের পর আপনার সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও সুন্দর গুণাবলির মাধ্যমে নিজেও সুখী হতে পারেন এবং সঙ্গী বা সঙ্গিনীকেও সুখী করতে পারেন। আপনার পরবর্তী প্রজন্মও যেন আপনার থেকে এই সৌন্দর্য লাভ করতে পারে। পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই এসব গুরুত্বপূর্ণ।

বিয়ে হওয়া উচিত স্বামী ও স্ত্রীর সেই লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম, যা তারা আল্লাহর দাসত্বের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের জীবনের জন্য নির্ধারণ করেছে। আপনি যদি আপনার মৌলিক দায়িত্ব পালনে সফল হন, তাহলে আপনি বিয়ে করুন বা না করুন কিংবা যদি তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীও হন, তাহলেও আপনি নিজের মাঝে দায়িত্ব পালনের স্বাদ ও প্রশান্তি অনুভব করবেন। আপনার এই স্বাদ ও প্রশান্তি অবশ্যই সেই কল্পিত রোমান্স ও অবাস্তব প্রেম থেকে দামি ও মূল্যবান হবে। আপনার জীবন হবে সুন্দর। ঠিক যেমনটি রব বলেছেন :

﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾

'অবশ্যই আমি তাকে দান করব পবিত্র জীবন।'[১৪৮]

তারপর আখিরাতে তো আপনার জন্য চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অপেক্ষা করছেই।

আমরা বিয়েকে কঠিন করে দিতে চাচ্ছি না। বরং তাকে সফল করতে চাচ্ছি। আমরা বলছি না যে, বিয়ে করার আগে সবাইকে আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার মতো ঈমান অর্জন করতে হবে। আমরা জানি, মানুষের মন অত্যন্ত দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের যুবক ও যুবতিদের উচিত আমরা যা উল্লেখ করলাম তার সর্বনিম্ন স্তর হলেও অর্জন করা। বিয়ের পূর্বেই এসব বিষয়ে নিজেকে সচেতন করা। আমরা বলি না যে, বিয়ে সুন্নাহ। তাই বাকি সব ফরজ ও সুন্নাহ আদায় করার পর বিয়ে করতে হবে। কিন্তু আত্মশুদ্ধি আমাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। তবে আমরা

---

১৪৮. সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭

বলছি না যে, বিয়ে করার পূর্বে আত্মশুদ্ধির সুনির্দিষ্ট একটি স্তর কাউকে পাড়ি দিতে হবে। বলছি না যে, এসব শর্ত অর্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়েকে স্থগিত করে দিতে হবে। জীবনের প্রয়োজনকে থামিয়ে দিতে হবে। বরং আত্মশুদ্ধি ও আত্মপরিচয় অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা তো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। আমরা এভাবেও বলছি না যে, আমরা যা উল্লেখ করেছি সেগুলো অর্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ে মুলতুবি করে দাও। সাময়িকভাবে তাকে স্থগিত রাখো। আগে আমাদের যুবক ও যুবতিদের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে নাও। বরং আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া তো সুদীর্ঘ। কিন্তু আমরা খুব জোরালোভাবে বিয়ের পূর্বে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা চাই প্রত্যেকেই তার স্বভাব, বৈশিষ্ট্য, ক্রটি ও অভ্যেস সম্পর্কে অবগত হোক। তার অগ্রসরতা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করুক। কল্যাণের প্রতি ধাবিত হোক এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করুক। আত্মশুদ্ধির এই প্রক্রিয়া শুরু হোক বিয়ের আগেই। অন্তত সর্বনিম্ন স্তরটি অর্জিত হোক। তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হোক।

আমাদের এখানে যুবক ও যুবতিরা সাধারণত একটি নিজস্ব বাসস্থানের ব্যবস্থা না হলে বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় না। সেখানে জীবনযাপনের জন্য সামান্য ও অতিপ্রয়োজনীয় কিছু আসবাবের ব্যবস্থা বিয়ের আগে তারা যেভাবেই হোক করে ফেলে। সবকিছু হয়তো জোগাড় করতে পারে না। কিছু জিনিস ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়। তাই আমি বলতে চাই, এমনই ভাবে তার বিয়ের আগে আত্মশুদ্ধিরও জরুরি পাঠটুকু গ্রহণ করে নিক। তার অতিপ্রয়োজনীয় ও অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অর্জন করে নিক। তারপর ধীরে ধীরে প্রক্রিয়া অনুযায়ী অগ্রসর হোক। এ ক্ষেত্রে বিয়ের পর একে অপরের সহযোগী হোক। কিন্তু তারা বিয়ের আগে অন্তত এ অঙ্গনে পা ফেলুক। তারপর উভয়ে মিলে সম্মিলিত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিক। আজ নয় কাল, এভাবে কাজটিকে বিলম্বিত করে দিলে যা হবে তার ব্যাপারেই আমরা আগে থেকে সতর্ক করে যাচ্ছি। তারপরও যারা এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তাদেরকে আমরা বলি, আপনি আপনার পরিবারসহ তাওবা করে নিন। কারণ, তাওবার দুয়ার সব সময়ই উন্মুক্ত।

এখন প্রশ্ন হলো, আত্মশুদ্ধির এই প্রক্রিয়া আমরা কোত্থেকে শুরু করব?

যারা বিয়ে করেছে, যারা এখনো বিয়ে করেনি, নারী ও পুরুষ সকলের উদ্দেশে আমার নসিহত হলো, প্রথমে কিছু পড়ে নিন ও জ্ঞান অর্জন করে নিন। বিশেষত আমাদের ভাই মনোবিজ্ঞানী ডক্টর আব্দুর রহমান জাকির প্রণীত 'মাআ নাফসি' গ্রন্থটি পড়তে পারেন। আপনি 'কনাতুন্নাফসিল মুতমাইন্নাহ' চ্যানেলটি টেলিগ্রামে ফলো করতে পারেন। শায়েখ

আনাসে শেখ তাকরিম চ্যানেলটি পরিচালনা করেন। তিনি উসুলে দীন ও মনোবিজ্ঞান উভয় বিষয়ে তাখাসসুস করেছেন। আমাকে এই পর্বটি তৈরি করতে তিনি অনেক বেশি উৎসাহিত করেছেন।

শেষ কথা। কোনো কোনো বোন হয়তো বলবেন, আমি কোনো বিভ্রান্ত ব্যক্তি বা এমন কিছু নিয়ে অনুসন্ধান করছি না। আমি স্পষ্টভাষায় বলে দিচ্ছি, স্বামী ও সন্তানদের সাথে থাকতে আমার ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে অফিসিয়াল কাজ ও চাকরি করতে। এটা কি আমার সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নয়?

আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমরা সামনের পর্বে দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমি বাড়ির চাকরানি নই

এক. নারী কি স্বামী ও সন্তানদের জন্য শুধু চাকরানির মতো ঘরের কাজ করে যাবে?

দুই. তোমরা কি আমাদেরকে 'প্রজন্মের প্রতিপালনকারী' বলে উপহাস করতে চাও? এ কথার আড়ালে কি আমাদের চাকরানি বানাতে চাও?

তিন. নিজে জ্বলে অন্যকে আলো বিলানোই কি নারীর কাজ? নারী কি এভাবে জ্বলে জ্বলে তার স্বামী-সন্তানকে আলো বিলিয়ে যাবে?

চার. ইসলাম কি চায় আমি একজন রাঁধুনি, ধোপানি আর পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে জীবনটা কাটিয়ে দেবো? আমি কি আমার সারাদিন আর শরীর সব শক্তি অন্যের জন্য ব্যয় করে যাব? অবশেষে নিজেকে বা সমাজকে দেয়ার মতো কোনো সময় আর আমার হাতে থাকবে না? এমনকি কখনো কখনো ইবাদতও ঠিকমতো করতে পারব না।

পাঁচ. প্রতিদিন স্বামী ও সন্তাদের জন্য রান্না করাই কি আমার কাজ? তাদেরকে যদি কোনো দিন খাবার হিসেবে শুধু রুটি আর দুধ দিই, তাহলে স্বামী এসে বলবে, তুমি তোমার কাজে অবহেলা করছ।

ছয়. স্বামীর কি অধিকার আছে বাড়ির কাজ করার জন্য আমাকে চাপ প্রয়োগ করার? আমাকে কি সে তার খাবারের বাসন ও পরিধানের কাপড় ধুতে এবং তার সবকিছু গুছিয়ে রাখতে চাপ প্রয়োগ করতে পারে? আর যদি আমি তা না করি, তাহলে কি সে আমাকে ভর্ৎসনা করতে পারে?

সাত. আমার ছেলেমেয়েরা কি সারাদিন নিজেদের মনমতো যা খুশি করে বেড়াবে আর বাড়িঘরের পরিবেশ নষ্ট করে যাবে, আর আমি দিনভর তাদের সেবা করে যাব?

আট. বোন হিসেবে কি একজন তরুণীর কর্তব্য তার ভাইদের সেবা করা? আর তা কি এ জন্য যে, সে একজন নারী আর ভাইয়েরা পুরুষ?

নয়. স্বামীর পরিবারের সেবা করা কি স্ত্রীর কর্তব্য?

দশ. এমন কোনো পরিস্থিতি কি আছে, যখন নারীর জন্য তার স্বামীর পরিবারের সেবা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়?

এগারো. যদি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয় এবং বাধ্য হয়ে স্বামীকে সহায়তা করার জন্য নারীকে কাজ করতে হয়, তাহলে কি ঘরের কাজে স্বামীরও স্ত্রীর সাথে অংশগ্রহণ করা কর্তব্য নয়? নাকি সে বসে বসে শুধু বলে যাবে, এটা তোমার কাজ। তুমিই এটা করো। আর স্ত্রী নিজের সুস্থতা ও বিশ্রাম সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে এসব কাজ করে যাবে?

আজ আমরা যে কথাগুলো বলব আশা করি তা পারিবারিক সম্পর্কের সংশয় ও দ্বন্দ্বগুলো দূর করে দেবে।

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾

'সুতরাং আপনি সেই বান্দাদের সুসংবাদ দিন, যারা বক্তব্য মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করে এবং তার মাঝে সুন্দর বক্তব্যগুলোর অনুসরণ করে।'[১৪৯]

আমরা তাদেরকে সুসংবাদ দেবো যে, এই কথাগুলো তাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবে এবং পারিবারিক জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।

আজ আমরা নারীর সামনে ঘরের কাজকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করব না। চমকপ্রদ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে তাকে ঘরের কাজে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব না। বরং আমরা বলব, বর্তমান সময়ে মুসলিমদের ঘরের অবস্থান খুবই বিভ্রাটময় ও অসন্তোষজনক। আসুন আমরা চেষ্টা করি তার কারণগুলো উদ্‌ঘাটনের—যাতে আমাদের পারিবারিক জীবনকে সংশোধন করতে পারি।

---

১৪৯. সূরা ঝুমার, ৩৯ : ১৭-১৮

এই গল্পের শুরুর কথা হলো, আল্লাহ মানুষকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন। যদি তারা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে, তাহলে জীবন হবে পবিত্র ও সুন্দর। আর যদি তারা সে লক্ষ্যের বিপরীতে চলে, তাহলে জীবন হবে অনটনপূর্ণ। যেকোনো মুসলিমকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? তাহলে সে জবাব দেবে, ইবাদতের জন্য। সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শোনাবে :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

'আর আমি মানুষ ও জীনকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।'[১৫০]

কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমই 'ইবাদত' শব্দটি শুনলে সালাতের মুসল্লা আর মসজিদের কথা কল্পনা করে। তাদের মস্তিষ্কে ইবাদতের সেই ব্যাপক অর্থটি আসে না, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের পরিবারগুলো বেড়ে ওঠা উচিত। আল্লাহর দাসত্ব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রজ্জু।

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।'[১৫১]

আমরা যদি এই রজ্জুটিকে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে আমাদের প্রক্রিয়াগুলো সঠিক হয়ে যাবে, সংকটগুলো কেটে যাবে এবং সম্পর্কগুলো পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। সকলেই তখন একটি ম্যাগনেটের সদৃশ হয়ে যাবে, ধাতব টুকরোগুলো তার দিকেই ফিরে যাবে। আর যখন এই লক্ষ্যটি নষ্ট হয়ে যাবে, তখনই সমস্যা শুরু হবে। ফলে প্রক্রিয়াগুলো উল্টে যাবে। মহান লক্ষ্যটি নষ্ট হয়ে যাবে। প্রত্যেকেরই তখন ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য তৈরি হবে। পুরুষ বলবে, আমি নিজেকে প্রমাণ করতে চাই। খুবই স্বাভাবিক যে নারী তখন বলবে, আমিও নিজেকে প্রমাণ করতে চাই।

- আমি আমার চাহিদা পূরণ করতে চাই।

: আমিও আমার চাহিদা পূরণ করতে চাই।

এভাবেই বদলে যাবে পরিবেশ। তৈরি হবে বিচ্ছেদ। শুরু হবে বিবাদ। ভেঙে পড়বে পরিবারব্যবস্থা। সবকিছুকে স্বাভাবিক করে নিজেদের মাঝে সম্প্রীতি তৈরি করতে হলে

১৫০. সূরা জারিয়াত, ৫১ : ৫৬
১৫১. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৩

সর্বপ্রথম আমাদেরকে ইবাদতের ব্যাপক অর্থটি আত্মস্থ করতে হবে। ইবাদতের ব্যাপক অর্থ হলো, আল্লাহ যে বক্তব্য, কাজ ও বিশ্বাসকে পছন্দ করেন তা-ই ইবাদত। আল্লাহর শরিয়তকে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হলো এই ব্যাপকতার দাবি। সৃষ্টিজগতে বিদ্যমান আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতা অবলোকন করা, সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও তার উৎস সম্পর্কে ধারণা নেয়া এবং তাকে উম্মাহর কল্যাণে ব্যবহার করা—এগুলো সবই ইবাদত। আল্লাহ বলেন :

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

'তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তোমাদেরকে আবাদ করিয়েছেন।'[১৫২]

উম্মাহকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করা, শিল্পবিপ্লব সাধন করা, দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা, চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে কাজ করা—এগুলো সবই ইবাদত। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

'আর যে ব্যক্তি তাকে জীবন দান করল, সে যেন গোটা মানবজাতিকে জীবন দান করল।'[১৫৩]

সত্যপন্থীদের পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা, মানবতার সামনে সঠিক দীনকে উপস্থাপন করা, ইসলামের উপর উত্থাপিত অপবাদগুলোর জবাব দেয়া ইত্যাদি সবই ইবাদত। আল্লাহ বলেন :

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

'এমনই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী জাতি। যাতে তোমরা মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো এবং রাসূল হতে পারেন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী।'[১৫৪]

সন্তানদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, তাদের মাঝে আত্মসম্মান, আত্মপরিচয় ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের বীজ বপন করা, মজলুমদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, রাষ্ট্রব্যবস্থার

---

১৫২. সূরা হুদ, ১১ : ৬১
১৫৩. সূরা মায়েদা, ৫ : ৩২
১৫৪. সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩

গোলামি থেকে মানবতাকে মুক্তি দান করা সবই ইবাদত। আল্লাহ বলেন :

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾

'যাদেরকে আমি জমিনের নিয়ন্ত্রণ দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে।'[১৫৫]

এই মহান লক্ষ্যগুলো আমাদের চোখের সামনে থাকা উচিত এবং সেগুলো অর্জনে ধাপে ধাপে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আমাদের পা যদিও জমিনে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত আসমানের উচ্চতায়। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এতটাই সুউচ্চ যে, পার্থিব জগতের এই পরিবেশে বসেও আমরা যেন জান্নাতের সুবাস অনুভব করতে পারি। তাই এসব লক্ষ্যকে সব সময় আমাদের চোখের সামনে রাখা উচিত। যখনই হিম্মত কিছুটা কমে আসবে, তখনই আমরা এগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবো। ফলে নতুন করে আমাদের মাঝে জেগে উঠবে উদ্দীপনা। এই হলো ব্যাপক অর্থে ইবাদতের মর্ম। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য রহমতস্বরূপ।

يا عبادى إِنَّكُم لن تبلغوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِى ولن تبلغوا نفعِى فتنفعونِى

'হে আমার বান্দারা, তোমরা আমার ক্ষতি করা পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে। আর তোমরা আমার উপকার করা পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না যে, আমার উপকার করবে।'[১৫৬]

﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ﴾

'যে ব্যক্তি পথপ্রাপ্ত হলো সে নিজের কল্যাণের জন্যই পথপ্রাপ্ত হলো।'[১৫৭]

আল্লাহর দাসত্ব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রজ্জু। কেউ এটাকে ত্যাগ করলে তার পরিবারের সুখ দুর্ভোগে বদলে যায়। যেই সন্তানকে আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে দান করছেন এবং তাকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বলে নামকরণ করেছেন, তা আযাবে পরিণত হয়। যদি ভূমিকার এই কথাগুলো আমাদের বুঝে আসে তাহলে আমরা সমস্যার

১৫৫. সূরা হজ্জ, ২২ : ৪১
১৫৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৭৭
১৫৭. সূরা নামল, ২৭ : ৯২

কারণ, তার প্রতিকার ও বহু প্রশ্নের জবাব এমনিতেই পেয়ে গেছি। এসব বিষয় যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের জানা থাকে এবং তারা তা মেনে চলে, তাহলে নারীর ঘরে কাজ করার বিষয়টি কোনো আলোচ্য বিষয়ই নয়। আর যদি তার উল্টোটা হয়, তাহলে এটাই অনেক বড় বিষয়। কখনো কখনো তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

স্বামী ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করা কি নারীর উপর আবশ্যক? প্রশ্নটি খুবই পরিচিত ও আলোচিত। এই প্রশ্নের জবাবে সাধারণত সবাই ফিকহি ইখতিলাফের কথা আলোচনা করে। ইমাম আবু হানিফা, শাফিয়ি, মালিক ও আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহর বক্তব্য তুলে ধরে এবং যেকোনো একটি বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করে।

থামুন, প্রশ্নটিকে একটু অন্যভাবে বলুন। স্ত্রীর উপর কী আবশ্যক তার স্বামীর সেবা করা? যে স্বামী নিজের চাহিদা পূরণ করার জন্য সারাদিন বাইরে কাজ করে। দিনশেষে ঘরে এসে স্ত্রীর সাথেও ঘরের কোনো কাজে হাত দেয়াকে সে লজ্জাজনক মনে করে। যে ধারণা করে, শুধু পুরুষ হওয়ার কারণেই স্ত্রী তার সেবা করবে। নারীর জন্য কি আবশ্যক তার সন্তানদের সেবা করা? যে সন্তানরা নিজেদের ইচ্ছেমতো যা খুশি করে বেড়ায়। মুভি দেখে আর গেইম খেলে যাদের দিন কাটে। সারাদিন খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া যাদের কোনো কাজ নেই। অথচ তারা ধারণা করে, তাদের মায়ের কর্তব্য হলো তাদের সেবা করে যাওয়া। এটিকে তারা মাতৃত্বের স্নেহের মতোই আবশ্যকীয় মনে করে। এভাবে প্রশ্নটি করা হলে তার জবাব খুবই স্পষ্ট হবে। আর তা হবে, না, কোনোভাবেই না।

ফিকহি ইখতিলাফের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের উচিত প্রকৃত চিত্রটি তুলে আনা। নতুবা উম্মাহর ইমামদের ফিকহি ইখতিলাফ আমাদের সময়ের পরিবারব্যবস্থার এই বিকৃতরূপের উপর প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। ফলে শরিয়াহর মূল উদ্দেশ্য ইনসাফ ও সত্য ব্যাহত হবে। আমাদের সময়ের চিত্র যদি তাদের সামনে তুলে ধরা হতো, তাহলে তারা এটাকে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। তাই তাদের কোনো ফাতওয়াকে প্রকৃত প্রেক্ষাপট থেকে তুলে এনে আমাদের সময়ের বিকৃত কোনো প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা একটি অজ্ঞতা। এটি বিজ্ঞ কোনো ফকিহ করতে পারেন না।

বিপরীতভাবে আপনি যদি প্রশ্ন করেন, নারীর জন্য কি ঘরের কাজ করা আবশ্যক? যাতে সে তার স্বামীর জন্য সহায়ক হতে পারে। সেই মানুষটার জন্য প্রশান্তি হতে পারে, যে তার ও তার সন্তানদের চাহিদা পূরণ করার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করছে। যে মানুষটা তাকে নিরাপদ ও পবিত্র রাখতে পৃথিবীর যেকোনো পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। যে তাকে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে দূরে রেখে নিজে সব

প্রতিকূলতাকে মাথা পেতে নিয়েছে। যাতে পশ্চিমা নারীর মতো পরিণতি তাকে বরণ করতে না হয়। নারীর জন্য কি আবশ্যক ঘরের কাজ করা? এমন একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে, যারা সকলে মিলে একটি মহান লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পথ চলছে। যে পরিবারের সন্তানরা তার সামনে অনুগত। যারা ভবিষ্যতে তাদের মায়ের জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। যারা বড় হয়ে তাদের মা-বাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে এবং তাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের উৎস মনে করবে। নারীর জন্য কি সেই স্বামীর সংসারের দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক, যে দিনশেষে ঘরে এসে হাসিমুখে তার সাথে ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করবে? যদি প্রশ্নটি এভাবে করা হয়, তাহলে তার জবাবের জন্য আর অপেক্ষায় থাকতে হবে না। বরং নারী নিজেই নিজের জবাব খুঁজে নেবে। অথচ উভয় প্রশ্ন একই শব্দে করা হয়েছিল। কিন্তু উভয়ের জবাবে আকাশ ও জমিনের মতো পার্থক্য প্রকাশ পেল। আর এর মাধ্যমেই আপনি বুঝতে পারবেন, কেন নারীর ঘরে কাজ করার মাসআলাটি ইসলামের সোনালি যুগে মতভেদপূর্ণ ছিল। আর এমন ফিকহি মতামতও তখন বিদ্যমান ছিল যে, ঘরের কাজ করার আবশ্যকীয়তা বিয়ের কারণে নয়। তখনকার নারীরা স্বামীর সেবা করে স্বাদ অনুভব করতেন। নিজের পরিবার ও ঘরের দায়িত্ব পালন করা তাদের কাছে ছিল গর্বের বিষয়। ফলে তাদের সন্তানরা হয়তো আলিম, নয় সেনাপতি বা বড় কোনো মুজাহিদ হতো। আর সন্তানদেরকে নিয়ে তাদের বুক গর্বে ভরে উঠত। তারা ভাবতেন, উম্মাহকে তারা একজন মুজাহিদ, একজন আলিম বা একজন কমান্ডার উপহার দিতে পেরেছেন। এই কাজটি করে তারা সত্যিকারের স্বাদ অনুভব করতেন। তাই আপনি উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম আলিম বা সেনাপতিদের উত্থানের পেছনে একজন নারীর অবদান খুঁজে পাবেন। তখনকার সময়ে মুসলিমরা পরিবারের সকলে একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবনযাপন করতেন। 'আমি ঘরের কাজ করব না' এ কথাটি তখনকার সময়ে একজন নারীর মুখ থেকে বের হওয়া মানে হলো সে বলতে চাচ্ছে, আমি কোনো লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে চলব না। বরং আমি আমার প্রবৃত্তির পিছু ছুটব। কিংবা আমি অন্য কারও জন্য কাজ করব, কিন্তু আমার সেই স্বামী ও সন্তানদের জন্য কাজ করব না—যারা একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবনযাপন করছে।

ঘরের কাজের বিষয়টি তখনই পরিবারের সদস্যদের মাঝে মতভেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখনই সকলে মিলে একটি মহান লক্ষ্যে জীবনযাপন করা পরিত্যাগ করেছে এবং পারিবারিক জীবন থেকে আল্লাহর দাসত্বের ব্যাপক অর্থটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো বোন হয়তো বলবেন, আপনার কথা সুন্দর। কিন্তু আমার স্বামী ও সন্তান তেমন নয়—যেমনটি আপনি বলেছেন। আমি আপনাকেই বলছি হে মুসলিম রমণী,

আপনি নিজেকে শুধু একজন চাকরানি বানিয়ে রাখবেন না। আপনিই আপনার স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করবেন, উভয়ে মিলে একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরস্পর সহযোগী হয়ে জীবনযাপন করতে। আপনি যদি বিবাহিত না হন, তাহলে মহান লক্ষ্যে একত্রে জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক এমন একজন স্বামী নির্বাচন করুন। নারীর ভেতরে এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। তারা চাইলেই পুরুষকে বদলে দিতে পারে। তাই আপনি আপনার পরিবারের সামনে সেই মহান লক্ষ্যগুলোর কথা বেশি বেশি আলোচনা করুন। আপনি যখন একটি নতুন কাপড় তৈরি করবেন বা একটি নতুন খাবার পরিবারকে খাওয়াবেন তখন যদি আপনার উদ্দেশ্য থাকে সেই মহান লক্ষ্যটিকে বাস্তবায়ন করা, তাহলে ভাবুন তো আপনার কাছে কাজটি কতটা আনন্দদায়ক হবে? কাজটি করে আপনি কতটা তৃপ্তি পাবেন? আপনি চাইলে অবশ্যই আপনার পরিবারটাকে আবারও নতুন করে সাজাতে পারেন। এ জন্য প্রয়োজন আপনার ধৈর্য ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

কিন্তু না, আপনি আপনার স্বামী ও সন্তানদের থেকে কোনোপ্রকার প্রত্যুত্তর বা আগ্রহ পেলেন না। তারা আসলেই আপনাকে শুধু একজন চাকরানি ভাবছে। তারা চায়, আপনি শুধু তাদের সেবা করবেন আর তারা তাদের নিজেদের মতোই চলতে থাকবে। কিংবা আপনার স্বামী জোর করে আপনাকে দিয়ে তার পরিবারের সেবা করাতে চায়। আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং জোর করে আপনার উপর চাপিয়ে দিয়ে। যেন সে বলতে চায়, এটা আপনার দায়িত্ব। এখানে আল্লাহ আপনাকে এই কাজগুলো বাধ্য হয়েও করে যেতে আদেশ করেন না। তবে আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখানে আপনাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। তাই আপনাকে আমরা পরামর্শ দেবো, আপনি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। আপনার স্বামীর সাথে সদাচার করুন। তাকে সুন্দর ব্যবহার উপহার দিন। এর পাশাপাশি আপনি আপনার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালন করার চেষ্টা করে যান—যেগুলোর ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। নিজের উপর নিজের অধিকার ও রবের অধিকারগুলো আদায় করার চেষ্টা করুন। আপনি স্বেচ্ছায় যতক্ষণ খুশি এ পরিস্থিতিতে স্বামীর সাথে থাকতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি যদি আপনার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এসব কাজ সামাল দিতে গিয়ে আপনি যদি শারীরিকভাবে ক্ষতির শিকার হন কিংবা মানসিকভাবে আক্রান্ত হন অথবা আল্লাহর কোনো বিধান আদায় করার ক্ষেত্রে যদি তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় (যেমন : সালাত, জরুরি ইলম অন্বেষণ ইত্যাদি), তখন কি আমরা আপনাকে বলব, না, আপনি আরও ধৈর্যধারণ করুন, আত্মত্যাগ করুন, মোমের মতো জ্বলে অন্যকে আলো বিলিয়ে যান? না। বরং এ পরিস্থিতিতে এসব মেনে নেয়া আপনার জন্য বৈধই নয়। এখানে এসে আমরা আপনাকে আবারও সেই দায়িত্ব

ও কর্তব্যের কথা বলব, যা বলেছিলাম 'আত্মপরিচয়ের সন্ধানে' শিরোনামের পর্বটিতে। আপনার নিজ সত্তাই আপনার কাছে সর্বাধিক প্রাধান্যযোগ্য। আপনাকে নিজের হিসেবই সবার আগে দিতে হবে। আল্লাহ বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾

'তোমাদের উপর কর্তব্য নিজেকে রক্ষা করা।'[১৫৮]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

'তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।'[১৫৯]

সবার আগে আপনার নিজের সত্তা। নিজের সত্তাকে ধ্বংস করা এবং নিজের মৌলিক দায়িত্বে অবহেলার করা আপনার জন্য বৈধ নয়। এসব বিষয়ে অবহেলা করে আপনি অন্যের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবেন না; যদিও তা হয় মাতৃত্বের টানে। কারণ এটা সেদিন আপনার কোনো উপকারে আসবে না,

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

'যেদিন মানুষ পলায়ন করবে ভাই থেকে, মা ও বাবা থেকে, স্ত্রী ও সন্তান থেকে। প্রতিটি মানুষেরই সেদিন থাকবে এমন বিষয়, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে।'[১৬০]

আপনি, আপনার স্বামী, আপনাদের সন্তানরা এবং আপনাদের সকলের জীবন বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আপনি জগতের আর কারও মালিকানাধীন নন যে, তার জন্য আপনি আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নষ্ট করবেন। তার জন্য আপনি আপনার রব কর্তৃক আরোপিত মূল দায়িত্বে অবহেলা করবেন। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انما الطاعة فى المعروف

'আনুগত্য শুধু নেককাজের ক্ষেত্রে।'[১৬১]

---

১৫৮. সূরা মায়েদা, ৫ : ১০৫
১৫৯. সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৬
১৬০. সূরা আবাসা, ৮০ : ৩৪-৩৭
১৬১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৭২৫৭

- কিন্তু কখনো কখনো তো নারীর ইচ্ছাধিকারও থাকে না। কঠোর স্বামী তাকে চরমভাবে বাধ্য করে। নারীর পরিবার তাকে সমর্থন করে না এবং তাকে আশ্রয়ও দেয় না।

: আহ্! আল্লাহ আপনার সহায় হোন। এটা আপনার প্রতি মানুষের অবিচার। শরিয়ত আপনার প্রতি অবিচার করেনি। আপনার এই বিশ্বাসই এই সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ। শরিয়তকে আপনি আপনার পক্ষে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করুন। আপনার পরিবার ও স্বামীকে বলুন, আমরা সবাই তো মুসলিম। তাহলে আসুন, আমরা আল্লাহপ্রদত্ত সমাধানের দিকে ফিরে যাই। তারপর আপনি আপনার অধিকার ও ইচ্ছাধিকারের কথা তাদেরকে শোনান। আর এ ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আপনার মহাপবিত্র রবের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। তাই তাঁর প্রতি ও তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। বর্তমান সময়ে বাড়ির কাজ যে পদ্ধতিতে চলছে তা আসলেই কঠিন ও অসহ্যকর। আমরা আপনার সামনে এগুলোকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে আপনার মনোরঞ্জন করতে চাই না। বরং আমরা এ ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো নির্ধারণ করতে চাই এবং তার সমাধানে উদ্যোগী হতে চাই। যথাযথ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আনতে চাই। বাড়ির কাজ কীভাবে সমস্যায় রূপ নিল তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা পাঁচটি বিষয় পেয়েছি।

১. সম্মিলিত মহান লক্ষ্যের অনুপস্থিতি। ২. সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সন্তানকে লালনপালন করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবহেলা। যার ফলে সন্তানরা আজ রুক্ষ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ৩. তাদের আবদার একের পর এক বেড়েই চলছে। ৪. পুরুষেরা কখনো কখনো বাড়ির কাজে অংশগ্রহণ করতে অহংবোধ করছে। ৫. পরিবারের সকলে ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে পার্থক্য ভুলে যাচ্ছে। ফলে নারীর উপর এমন কিছু কাজ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে যার ক্ষেত্রে মূলত তার ইচ্ছাধিকার ছিল। যে কাজটি নারী অনুগ্রহ ইহসানের ভিত্তিতে করত সেটিকে তার উপর কর্তব্য বলে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাতে ত্রুটি করলে তার উপর অবহেলার অভিযোগ আনা হচ্ছে। কিন্তু নারীকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে, ইসলাম মূলত এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি করেনি। বরং পারিবারিক জীবনে ইসলামের অনুপস্থিতির কারণেই এই সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে। ইসলাম পরিবারকে একটি সম্মিলিত মহান লক্ষ্য দান করেছে। যে লক্ষ্য অর্জনে বাবা, মা ও সন্তান সবাই সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করবে। তারা বাড়ির কাজে খুশিমনে ও আনন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করবে। ইসলাম পিতা-মাতাকে সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালনের আদেশ করেছে এবং সন্তানদেরকে পিতা-মাতার সাথে সদাচার ও তাদের সেবা করার আদেশ করেছে। ইসলাম সকলকে দুনিয়ায় অতিরিক্ত বিলাসিতা

করতে নিষেধ করেছে। অল্পে তুষ্ট থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে সন্তানদের অতিরিক্ত আবদার খুব সহজেই কমে আসবে। ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর সাথে বাড়ির কাজে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার পাশাপাশি ইনসাফ ও অনুগ্রহের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং স্ত্রীকে ইনসাফ-বর্হিভূত ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার দিয়েছে। আজকাল কিছু মানুষ যেসব কাজকে নারীর উপর আবশ্যক মনে করে তার অনেক কিছুই ইসলামি মতে সে করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। যখন উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের বিপরীত চলতে শুরু করেছি তখনই ঘরের কাজ অনেক ভারী বোঝা ও দুঃসহ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। তাই খুব স্বাভাবিক যে, নারীরা এখন মন থেকে ঘরের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না। আমরা আমাদের জীবনে ইসলাম থেকে যতটা দূরে সরে গেছি ততই আমাদের মাঝে সমস্যা তৈরি হয়েছে; আর কিছু লোক এই সমস্যার দায় বিস্ময়করভাবে ইসলামের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। অথচ এই সমস্যাগুলো তৈরি হওয়ার একমাত্র কারণ হলো আমাদের জীবনে ইসলামের অনুপস্থিতি। মহান লক্ষ্যটি কী হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। যে নারী তার স্বামী ও সন্তানদের জন্য খাবার তৈরি করে, তাদের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশের ব্যবস্থা করে—সে তার কাজে অবশ্যই স্বাদ অনুভব করবে, যদি সে এই কাজগুলো একটি মহান ও পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে করে।

আমি একটি পবিত্র পরিবারের কথা জানি। যারা একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবনযাপন করছে। স্বামী একজন ডক্টর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজের কাজের প্রতি তিনি আস্থাশীল। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি আর্টিকেল লিখে থাকেন। ছাত্রদের কাছেও তিনি বেশ জনপ্রিয় শিক্ষক। তাদেরকে তিনি উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেন। তাদের মাঝে ইসলামি মূল্যবোধের চাষাবাদ করেন। পাশাপাশি তিনি বিধবা ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। তার স্ত্রী তারই ছাত্রী। বিয়ের পর তিনি স্বামীর কাছ থেকে ইলমুল হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেছেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন। তার স্বামীও এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেছেন। সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারেও তারা উভয়ে খুব যত্নশীল। যা তাদের বাড়ির পরিবেশ, তাদের সন্তানদের চরিত্র, দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে তাদের সফলতা দেখলেই বোঝা যায়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ফেমিনিস্টদের জবাব দেয়ার জন্য এই মহীয়সী নারী লিখেছেন, 'আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি স্বীকার করছি যে, আমি একজন নারীর মতো থাকতেই ভালোবাসি। এখনো আমার পরিবারের দেখভাল ও তাদের ভালোলাগাগুলো খুশিমনে পূরণ করতে ভালো লাগে। বাসার কাপড়গুলো গোছাতে, ধুতে এবং ভাঁজ করে রাখতে ভালো লাগে। ছোট্ট বাচ্চাদের নখ কেটে দিতে ভালো লাগে। তাদের পড়ালেখা করাতে এবং জ্ঞান শেখাতে ভালো লাগে। এখনো আমার ভালো লাগে ঘর গোছাতে, ঘরে সুগন্ধি ছড়াতে

এবং জানালার কাচগুলো মুছতে। যখন লেপগুলো রং মিলিয়ে গুছিয়ে রাখি, তখন আমার নিজেকে খুব সুখী মনে হয়। বাচ্চারা যখন আমার পাশে একত্র হয় তখন আমার বুকটা ভরে ওঠে। আমি চাই, বাইরের পৃথিবীর সকল ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে তারা আমার কাছে মমতার আশ্রয় খুঁজে পাক। স্বামীকে যখন দিনশেষে বাড়ি ফিরে প্রশান্তি নিয়ে ঘুমাতে দেখি, তখন সত্যিই নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হয়। আমাকে দেখে যখন তিনি হেসে ফেলেন, তখন বড় প্রশান্তি লাগে মনে। এ সবকিছুকেই আমি উপভোগ করি। আচ্ছা, তাহলে কি আমি স্বাভাবিক নই? নাকি আমি অস্বাভাবিক? তবে এসব কিছুর মানে এই নয় যে, আমি আমার অধিকার সম্পর্কে জানি না। এসবের মানে এই নয় যে, সামাজিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে আমার কোনো অবদান থাকবে না।' তার স্বামীও তার এই লেখায় চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন। যা তাদের জীবনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলছে। এ বিষয়গুলোতে আমরা উদ্বুদ্ধ করি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আদবের সাথে থাকে। যখন চারিদিকে নেতিবাচক খবর ও উদাহরণ ছড়িয়ে পড়েছে, যুবক ও যুবতিরা বিয়ের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে তখন আমরা এসব ইতিবাচক উদাহরণও আলোচনা করতে চাই। উল্লেখিত পরিবারটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, তারা সকলেই সম্মিলিতভাবে একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে পরিবারের নারীরাও ঘরের কাজ করে স্বাদ পাচ্ছে এবং তাতে তৃপ্ত হচ্ছে।

ঘরের কাজ সমস্যায় পরিণত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ আমরা উল্লেখ করেছিলাম, সন্তানদের প্রতিপালনে মা-বাবার অবহেলা। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা সামনের পর্বটিতে সন্তান প্রতিপালন নিয়ে কথা বলব। তবে এখানে আমরা ঘরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা বলে নিতে চাই। মা-বাবার দায়িত্ব হলো, সন্তানকে তার লক্ষ্য নির্ধারণ, ব্যক্তিত্ব গঠন, দায়িত্ববোধ তৈরি করা ও নিজের আত্মপরিচয় লাভে সহায়তা করা। তাকে বোঝানো যে, তুমি একজন মুসলিম। তুমি আল্লাহর আনুগত্য করবে। মা-বাবার সাথে সদাচার করবে। তাদের সহায়তা করবে। তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও জান্নাত আশা করবে। মা-বাবা তাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা ও অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা শৈশব থেকেই দিয়ে যাবে। তাকে বোঝাবে, অন্যকে বলার আগে নিজেই কাজটি করতে হয়। কাজটি মা ও বাবা উভয়েরই করতে হবে। তাহলে এসব ছেলে এবং মেয়েরা ঘরের কাজে মায়ের সহযোগী হবে। কারণ, তারা শৈশব থেকেই দায়িত্ববোধের উপর বড় হয়েছে। তারা তাদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখে। তবে এগুলো তারা কখনোই নিজ থেকে শিখবে না। মা হিসেবে আপনাকে তাদের শেখাতে হবে, ভালোবাসা দিতে হবে এবং তাদের জীবনকে ভরিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই সন্তানরা যদি একজন চাকরানির হাতে বা চাইল্ডকেয়ারে বড় হয় আর আপনি আপনার মৌলিক

দায়িত্ব তথা সন্তানদের প্রতিপালন করাকে বাদ দিয়ে অন্যসব কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করাটা আপনার জন্য হবে দিবাস্বপ্নের মতো। তাই যে নারী নিজেকে সন্তানদের প্রতিপালনকারী বানায়নি, সে প্রকারান্তরে নিজেকে ঘরের চাকরানি বানিয়ে ফেলেছে। বিশেষত এ ক্ষেত্রে সে ও তার স্বামী উভয়েই যদি অবহেলা করে, তাহলে তার ফলাফল আরও ভয়াবহ হয়। যে সন্তানের জন্য তার মা আত্মা ও বিবেকের খোরাক জোগায় না, যার থেকে সন্তান পরিপূর্ণ স্নেহ পায় না, যার সাথে সন্তানের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়—সে সন্তান অবশেষে বেশি খায়, বেশি ঘুমায় আর অনর্থক কাজে নিজের সময় নষ্ট করে বেড়ায়। তখন সে মায়ের জন্য সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে আপদ হয়ে দাঁড়ায়।

এখান থেকেই তৃতীয় সমস্যা তৈরি হয়। পরিবারের সদস্যদের মাঝে বস্তুগত চাহিদা বেড়ে যায়। তাদের আবদার দিনদিন বড় হতে থাকে। একসময় তা পরিবারের জন্য চাপ ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, 'হে আয়েশা, তোমাদের কাছে কি কিছু আছে?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কাছে খাওয়ার মতো কিছুই নেই।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে আমি আজ সিয়াম পালন করব।'

এমনই সরল ছিল তাদের জীবন। কোনো সংকট যে জীবনের সুখ কেড়ে নিতে পারত না। প্রতিবেলায় নতুন নতুন রান্না না হলেও খাবারের দস্তরখানে কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করত না। রান্নার কারণে বাড়িতে কখনো সমস্যা তৈরি হতো না। এটাই হলো সেই পরিবারের দৃষ্টান্ত, যারা একটি সম্মিলিত মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে জীবনযাপন করে।

চতুর্থ সমস্যা হলো, ঘরের কাজ করতে স্বামীর অসম্মানবোধ। এখানে আমরা অসম্মানবোধ শব্দটি ব্যবহার করলাম। এখানে সাধারণত শারীরিক পরিশ্রম মুখ্য বিষয় থাকে না। বরং একজন নারী তখনই মানসিকভাবে যন্ত্রণাবোধ করে যখন দেখে যে, তার স্বামী নিজের সবকিছু গোছানো ও দেখভাল করাকে শুধু স্ত্রীর দায়িত্ব বলে মনে করে। একবারের জন্যও তার সহায়তায় এগিয়ে আসে না। সে মনে করে, এটা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। এমন স্বামীদেরকে আমরা বলতে চাই, ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন, আমাদের মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে কী করতেন? তিনি বললেন,

كَانَ يَكُونُ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِى خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

'তিনি তাঁর পরিবারের কাজে অংশ নিতেন—অর্থাৎ তাদের সেবা করতেন—তারপর যখন সালাতের সময় হয়ে আসত তখন সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন।'[১৬২]

অন্য আরেকটি হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উম্মুল মুমিনিন বলছেন,

ما كان إلَّا بَشَرًا مِن البشَرِ كان يَفْلِي ثوبَه ويحلُبُ شاتَه ويخدُمُ نفسَه

'তিনি সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড় পরিষ্কার করতেন। বকরির দুধ দহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।'[১৬৩]

এই হলো জগতের সবচেয়ে বড় মানুষের বৈশিষ্ট্য। তিনি যে কাজে ব্যস্ত থাকতেন আপনি তারচেয়ে বড় কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন না। এই কাজগুলো তিনি মাঝে মাঝে দুই-একবার করতেন না। বরং এটা তাঁর অভ্যেস ছিল। তিনি তাঁর পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করতেন। কারণ তিনিই তো বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهلِهِ وأَنا خَيْرُكُمْ لأَهلِي

'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে, যে তার পরিবারের সাথে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের সাথে উত্তম।'[১৬৪]

তাই আপনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, বাড়ির সবচেয়ে ছোট কাজটি হলেও নিয়মিত করার চেষ্টা করুন। এতে আপনার স্ত্রীর মন ভালো থাকবে। আপনার সন্তানরা এখান থেকে শিখবে। আপনার স্ত্রী ও সন্তানরা বুঝবে যে, আপনি ঘরের কাজ করতে অসম্মানবোধ করেন না। বরং ব্যস্ততার কারণে হয়তো খুব বেশি কাজ করার সুযোগ পান না।

'আত্মপরিচয়ের সন্ধানে' পর্বটিতে এক বোন মন্তব্য করেছেন, নারীর উপর ঘরের কাজ ও সন্তানদের দায়িত্ব ফরজের মতো করে চাপিয়ে দেয়া হয়। কখনো কখনো স্বামীর পরিবারের দায়িত্বও তাকে নিতে হয়। এ ব্যাপারে শরিয়তের দলিল কী? ঘরের কাজ ও সন্তানদের দায়িত্ব কি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান নয়? আমরা তাকে বলব, বোন, শরিয়ত নারীর উপর সব দায়িত্ব বহন করা আবশ্যক করে দেয়নি, যেমনটি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু একইভাবে এমনও বলা যায় না যে, ঘরের কাজ ও সন্তানদের

---

১৬২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৭৬
১৬৩. মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ২৬১৯৪; সহিহ।
১৬৪. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৮৯৫

দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান। বরং এর মাঝে রয়েছে কিছু বিভাজন। পরিবার যখন বড় হয় এবং পথ চলতে থাকতে, তখন তার অনেক প্রয়োজন ও দাবি তৈরি হয়। খরচ, সুরক্ষা, বাসস্থান, প্রতিপালন ও ঘরের কাজ ইত্যাদি। খরচ, সুরক্ষা ও বাসস্থান এই তিনটির দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর। প্রতিপালন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব। তাহলে ঘরের কাজটি কার দায়িত্ব? বিশেষত স্বামী যখন সারাদিন তার দায়িত্ব পালনে কাটিয়ে দেয়। এ জন্যই আমরা বলি, নারী তার সাধ্যমতো ঘরের কাজ আঞ্জাম দেবে এবং স্বামী তার সহায়ক হবে। যেসব ভারী কাজ স্ত্রীর জন্য কষ্টকর, তা স্বামী করে দেবে। আর এ সবকিছুই হবে ভালোবাসা, প্রশান্তি ও সন্তুষ্টিসহ। নারীকে সব সময় বাড়ির কাজে ব্যস্ত রাখা শরিয়তের উদ্দেশ্য নয়। তার উপর এই কাজটি সালাত ও সিয়ামের মতো কঠোরভাবে শরিয়ত চাপিয়ে দেয় না। বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হলো, জীবনের চলার গতি যেন সুন্দর ও সুষম হয়। এ জন্য নারী হলো ঘরের ভেতরে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব তার নিজের ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে ঠিক তেমনই তার স্বামী ও সন্তানদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যারা মানসিকভাবে ও কখনো কখনো শারীরিকভাবে নারীর সহায়ক। আর এই দায়িত্ব অবশ্যই শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রায় আবশ্যক। তথাকথিত বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা ও আকাশচুম্বী আবদার অনুযায়ী নয়। এখান থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন, ফকিহরা কেন বলেছেন যে, ঘরের কাজ বিয়ের অংশ নয়। তাদের দৃষ্টিতে বিয়ে হলো স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে হালাল প্রেমময় সম্পর্কের নাম। তাই তাদের দৃষ্টিতে বিয়ের চুক্তির মাঝে ঘরের কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়। নারীর উপর তা ফরজে আইনও নয়। তার মানে ফকিহগণ নারীকে এ কথাও বলেননি যে, এখন বাড়িতে যা হওয়ার হবে, আপনি তা দেখতেও যাবেন না। এ ক্ষেত্রে তারা স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে বর্ণিত নসগুলো উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ স্বামীর আদেশকৃত যেসব বিষয়ে পরিবার ও সন্তানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং নারীর জন্য তাতে কোনো ক্ষতিও নেই এবং তা হারামও নয় এমন সব আদেশের ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি সদাচারের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। আর যদি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে ওঠে এবং বাধ্য হয়ে নারীকে স্বামীকে সহায়তার জন্য কাজ করতে হয় এবং তা স্বামীর অনুমতিক্রমে বা কখনো কখনো তার অনুরোধে হয়ে থাকে, তাহলে কি তা ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বামীর দায়বোধকে আরও বাড়িয়ে দেয় না? নাকি সে স্ত্রীকে বলে দেবে, এটা তোমার সমস্যা। তুমিই সমাধান করো? অথচ এখানে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রশ্ন আসে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালনের প্রশ্ন আসে। তাই আমরা বলি, যদি স্ত্রী পরিবারের খরচ চালাতে কাজ করে, তাহলে তা তার পক্ষ থেকে পরিবার ও স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ ও ইহসান।

কারণ, পরিবারের খরচ জোগানো তার উপর আবশ্যক নয়। তারপরও যদি সে তা করে, তাহলে এটা তার পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ। এ ক্ষেত্রে স্বামীরও কর্তব্য, স্ত্রীর জীবনের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা করা। সে যেন তার মৌলিক দায়িত্বগুলো পালনেরও সুযোগ পায়। যেন সে তার অনুগ্রহের বদলা হিসেবে স্বামীর কাছ থেকেও অনুগ্রহ লাভ করে।

ঘরের কাজ সমস্যায় পরিণত হওয়ার পঞ্চম কারণ হলো, ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝে পার্থক্যরেখা জানা না থাকা। বিয়ে হলো একটি পারিবারিক সম্পর্ক। ইসলামে যার ভিত্তি হলো অনুগ্রহ। অর্থাৎ প্রত্যেক দিক থেকেই অপরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রদান করা হবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব ও অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করে তার চেয়ে অতিরিক্ত অপরকে না দেয়া বিয়ের দাবির পরিপন্থী। কারণ ইসলাম বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা কোনো পুলিশ নিয়োগ দিয়ে রাখবে না, যে প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করতে পাহারা দেবে। বাড়ির ভেতর কোনো হিসাবরক্ষক ও বিচারকও থাকবে না। কেউ এসে বলবে না, স্বামী! এটা তোমার দায়িত্ব। এটা এখনই তুমি পালন করো। স্ত্রী! এটা তোমার দায়িত্ব। তুমি এখনই এটা পালন করো। এটাকে তুমি এখানে রাখো, আর তুমি ওটাকে ওখানে রাখবে না। এভাবে কেউ এসে তদারকি করবে না। পরিবারের মাঝে এসব রুক্ষ নিয়মকানুনও চলবে না। বরং ইসলাম বলে, পরিবার গঠিত হবে সদাচার, ভালোবাসা, দয়া ও পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহের ভিত্তিতে। তাই প্রতিটি সদস্যই একে অপরের সেবা করতে অঘোষিত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু একই সাথে ইসলাম বাস্তবতাকে তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিকতা ও তার ইচ্ছার দিকটিও বিবেচনা করেছে। তাই ইসলাম বলেছে, স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের প্রতি এমনভাবে দায়িত্ব পালন করবে, যাকে অনুগ্রহ বলা হয়। তবে উভয়েরই জানা থাকতে হবে, কোনটি তার অনুগ্রহ আর কোনটি ইনসাফ। যাতে করে, কখনো যদি কোনো কারণে অনুগ্রহের মানসিকতা ও পরিবেশ বদলে যায় তখন যেন কেউ অবিচারের শিকার না হয়। যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কোনো বিবাদ হয়, তাহলে তারা যেন ইনসাফের দিকে ফিরে আসতে পারে এবং প্রত্যেকেই অপরের প্রতি তার দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিতে পারে।

স্বামীর পরিবারের সেবা করা—এটা স্ত্রীর অনুগ্রহ। যদি কোনো স্ত্রী তা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। আর যদি কোনো স্ত্রী তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে স্বামীর রাগ হওয়ার কিছু নেই। এ জন্য সে স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করতে পারে না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে না। কারণ, এটা তার জন্য শরিয়ত কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব নয়। শরিয়তই স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ফয়সালা করবে। স্বামী যদি এ জন্য রাগান্বিত

হয়, তাহলে তার রাগ শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য স্ত্রীকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিও করতে হবে না। একই কথা বোন কর্তৃক ভাইদের সেবার ক্ষেত্রেও। এখানেও প্রশ্নটি আংশিক। যদি তার ভাইয়েরা গেমস খেলে আর মুভি দেখে সময় কাটায় আর বোনের সেবাকে নিজেদের অধিকার মনে করে, তাহলে তার এককথায় উত্তর হলো, না। বোনের জন্য তাদের সেবা করা আবশ্যক নয়। ইসলাম নারীকে পুরুষের সেবিকা বানায়নি, যেমনটি কিছু লোকের ধারণা। বরং বোন যদি নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে ও নিজের লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হয় এবং পরিবারের দায়িত্বগুলো পালন করে তখন বিপরীত দিক থেকে এই প্রশ্ন আসতে পারে, এই ভাই—যে কোনো লক্ষ্য ছাড়া জীবনযাপন করে, নিজের মনমতো যা খুশি করে বেড়ায়—তার কি কর্তব্য নয় বোনের কাজে সহায়তা করা? যাতে সে কাজগুলো ঠিকভাবে করতে পারে এবং নিজের মৌলিক দায়িত্বগুলোও পালন করতে পারে। আর যদি ভাইয়েরা বোনের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় আর বোন সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কোনো পোশাক তৈরি করে দেয় বা খাবার রান্না করে খাওয়ায়, তাহলে এটা বোনের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। যা করার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাধিকার রয়েছে। কিন্তু সে বাধ্য নয়। একই রকমভাবে তরুণীর কাছে কাম্য হলো, সে তার মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করবে। ছোট ভাইদের দেখাশোনা করবে। কারণ তারা এতটুকু ছোট যে, দেখাশোনা না করলে তাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এভাবেই জীবন চলবে। চলবে ইহসান, সদাচার ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে। তারপরও যদি মতভেদ হয়ে যায়, তাহলে ইনসাফের সীমানায় ফিরে আসবে সবাই। যদি অনুগ্রহ করতে গিয়ে নারী কষ্টে পড়ে যায়, তাহলে সে ইনসাফের সীমানায় ফিরে আসবে। কিন্তু নিজেকে নষ্ট করবে না। কারণ নারীকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, সে পরিবারের সেবা করতে গিয়ে নিজেকে শেষ করে দেবে। সারা জীবন শুধু স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ বিলিয়েই যাবে। এসব করতে গিয়ে নিজেকেই সে নিজের অধিকার প্রদান করতে পারবে না। বরং তাকে বলা হবে, 'সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধিকার দিয়ে দাও।'

তাই সে নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন না করে অন্যের উপর অনুগ্রহ করতে যাবে না। একই কথা আমরা পুরুষকেও বলব। নারীর উপর যেমনিভাবে এমন কিছু কাজ চাপিয়ে দেয়া হয় যা শরিয়ত তার উপর আবশ্যক করেনি, ঠিক তেমনিভাবে পুরুষের উপরও এমন অনেক খরচ চাপিয়ে দেয়া হয় যা শরিয়ত তার উপর আবশ্যক করেনি। বহু স্ত্রী এমন আছে যারা মনে করে, তাদের অতিরিক্ত সাজগোজ আর অসম আবদার পূরণ করা স্বামীদের জন্য আবশ্যক। এটা স্বামীর উপর শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক নয়। যদি সে তা না করে, তাহলে তাকে অবহেলাকারী বলে সাব্যস্তও করা হবে না। যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সম্মত হয়, তাদের জীবন উভয়ের অনুগ্রহের ভিত্তিতে

চলবে, তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। আর যদি উভয়ে ইনসাফের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে চায়, তাহলে অবশ্যই উভয় দিক থেকে ইনসাফ হতে হবে। এমনটি চলবে না যে, একজন ইনসাফ করবে আর অপরজন অনুগ্রহ করে যাবে। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দর্শন। যারা পারিবারিক সমস্যা সমাধান করেন তাদের এটা জানা থাকা উচিত। নতুবা স্বামী ও স্ত্রী কেউই তার বিচারে খুশি হতে পারে না। আর উভয়েই এই অনুভূতি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, সে অবিচারের শিকার হচ্ছে। কখনো কখনো স্ত্রী স্বামীর উপর অভিমান করে এবং এমন কোনো কাজ বন্ধ করে দেয়, যা সে অনুগ্রহের ভিত্তিতে করত। জবাবে স্বামীও এমন কিছু করে। কিন্তু অনুগ্রহ ও ইনসাফের বিষয়টি তাদের মাথায় না থাকার কারণে উভয়ের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে খুব কঠিন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। উভয়কেই বোঝা উচিত যে, অনুগ্রহের ভিত্তিতে যেসব কাজ করা হয় তা বন্ধ হয়ে গেলে চাপাচাপি বা খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানোর কিছু নেই। তবে ইনসাফের বেলায় কারও পক্ষ থেকে ত্রুটি না হওয়া উচিত। কিন্তু এসব বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে অনেকেই অনুগ্রহভিত্তিক কাজটি বন্ধ করে দেয়ার প্রত্যুত্তরে ইনসাফভিত্তিক ও আবশ্যকীয় কাজটিও বন্ধ করে দেয়। ফলে উভয়েই এক দীর্ঘ অবিচারের প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং শয়তান তাদেরকে দেখে হাসাহাসি করে।

যদি এ সবকিছুই আমাদের বুঝে আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারব, ইসলাম সব সময় অনুগ্রহের কথা বলে; দর কষাকষির কথা নয়। পরস্পর সহযোগিতার কথা বলে; স্বার্থপরতার কথা নয়। ইসলাম সকল হৃদয়কে একটি সম্মিলিত মহান লক্ষ্যপানে অগ্রসর করতে চায়। মহান আল্লাহর দাসত্বকে সকলের মাঝে বাস্তবায়ন করতে চায়। পারিবারিক সম্পর্ককে অনুগ্রহ ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ ক্ষেত্রে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত স্মরণ রাখতে পারি। তিনি আমাদেরকে নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরা সমাধান করে নেয়ার উদ্দেশ্যে এবং পারিবারিক ঝামেলা বাইরের মানুষ পর্যন্ত গড়ানো থেকে বিরত রাখতেই এ কথা বলেছেন,

والَّذی نفسُ محمَّدٍ بیدِہ لا تُؤدِّی المرأۃُ حقَّ ربِّها حتّٰی تؤدِّیَ حقَّ زوجِها

'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নারী তার রবের অধিকার আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর অধিকার আদায় করে।'[১৬৫]

---

১৬৫. সুনানু ইবনি মাযাহ, হাদিস নং : ১৮৫৩; হাসান।

তিনিই আবার বলেছেন,

فاستوصوا بالنساء خيرا

'আমার পক্ষ থেকে নারীদের ব্যাপারে কল্যাণের অসিয়ত গ্রহণ করো।'[১৬৬]

আমাদের নবী নারীকে তার স্বামী সম্পর্কে বলেছেন,

انظرى أين أنتِ منه؟ فإنَّما هو جنتُكِ و نارُكِ

'তুমি দেখো, তুমি তার কোথায় অবস্থান করছ? নিশ্চয় সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।'[১৬৭]

আবার তিনিই বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهلِهِ وأنا خَيْرُكُمْ لأهلِي

'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের সাথে উত্তম।'[১৬৮]

তিনি পুরুষদের উত্তম হওয়ার মানদণ্ড স্ত্রীর সাথে উত্তম হওয়াকে নির্ধারণ করে দিলেন। এটাই ইসলাম।

ان الله اعطى كل ذى حق حقه

'আল্লাহ প্রত্যেকে তার অধিকার প্রদান করেছেন।'[১৬৯]

যদি এসব কিছু আপনার বুঝে আসে, তাহলে আপনি আপনার নবীর এই বক্তব্যও বুঝতে পারবেন,

إذا خَطَب إليكم مَن تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه، فزَوِّجُوه

'যদি তোমাদের নিকট এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয়, যার দীনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।'[১৭০]

---

১৬৬. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫১৮৫, ৫১৮৬
১৬৭. মুসতাদরাকু হাকিম, হাদিস নং : ২৭৬৯; হাসান।
১৬৮. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৮৯৫
১৬৯. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ২১২১
১৭০. সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ১০৮৪

একজন ব্যক্তি মহান লক্ষ্যের ব্যাপারে আপনার সঙ্গী হবে এবং আপনার সাথে মিলে আল্লাহর দাসত্বকে জীবনে বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। আপনি কেন তাকে গ্রহণ করবেন না?

আর যুবকরা এ হাদিসের অর্থ বুঝতে পারবে,

فاظفر بذات الدين تربت يداك

'তুমি দীনদার নারীকে বিয়ে করে সফল হও, যদিও তোমার হাত ধূলিমলিন হয় না কেন।'[১৭১]

দীনদার নারী—যে আপনার সাথে এসব কিছুতে অংশীদার হবে। ফলে আপনাদের পরিবার প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সঠিক স্তম্ভের উপর। তারপর আল্লাহ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

'যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, তাহলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।'[১৭২]

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

'আর আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে সত্য ও ইনসাফ দ্বারা। তাঁর বাণীকে বদলে দেয়ার মতো কেউ নেই। আর তিনিই সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী।'[১৭৩]

সন্তান প্রতিপালন

এক. কেন জন্মগতভাবেই আমাকে সন্তান প্রতিপালনের জন্য সৃষ্টি করা হলো?

দুই. সন্তানরা কি আসলেই নিয়ামত? অথচ শৈশবে তারা আমার শরীর ও মানসিকতার জন্য বোঝা। তারপর যখন তারা একটু বড় হয় তখন তারা আমাকে রেখে নিজেদের আলাদা পৃথিবীতে বসবাস শুরু করে। তারপর যখন তার স্বনির্ভর হয় এবং পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন আমাকে একা ফেলেই চলে যায়। তারা আমাকে সেই স্বামীর কাছে ফেলে যায়—তাদের কারণেই যার সাথে আমার দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

---

১৭১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫০৯০
১৭২. সূরা নূর, ২৪ : ৫৪
১৭৩. সূরা আনআম, ৬ : ১১৫

তিন. আমি জানি, সন্তানরা বিদ্যালয় থেকে কিছুই শিখছে না। তারপরও তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে আমি কিছুটা বিশ্রাম নিই। যেন তাদের অনুপস্থিতিতে কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এমনটি করা কি যৌক্তিক?

চার. বলা হয়, নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তার সন্তানদের প্রতিপালন করা। সুতরাং শুধু প্রতিপালন হলেই তো হলো। তার মানে কি আমি আমার সময়, স্বাস্থ্য, ইচ্ছে ও সুখ সবই এর জন্য বিসর্জন দেবো?

পাঁচ. সন্তানদের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে বিরাট অঙ্কের বেতন পরিশোধ করা কি তাদেরকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়?

ছয়. আমি যদি সন্তানদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব তা থেকে মুক্ত হতে চাই, তাহলে তাদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময় কোন কোন বিষয়ে আমাকে যত্নশীল হতে হবে?

সাত. সেই দুই ডাক্তারের গল্প কী, যারা ক্যান্সারের রোগীদের লবণ ও পানি দিত? তাদের গল্পের সাথে প্রতিপালনের বিষয়টির যোগসূত্র কী?

আট. আপনারা আমাদেরকে সন্তানদের ভিডিও গেইম ও কার্টুন দিতে নিষেধ করেন। তাহলে আমরা কীভাবে তাদের অবসরের শূন্যতা পূরণ করব? আমরা কি তাদের অবসরের শূন্যতা পূরণ করতে গিয়ে নিজের জন্য বরাদ্দ সময়টুকুও বিসর্জন দেবো?

নয়. যদি স্বামী ও সন্তানদের সাথে ভালো না লাগে; বরং ইবাদত, সাংস্কৃতিক কাজ ও দাওয়াতি কাজেই আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, তাহলে এটা কি মহান লক্ষ্য নয়?

দশ. আমার স্বামী সন্তানদের প্রতিপালনে আমার কোনো সহায়তা করে না। আমি একাই এই বোঝা বহন করে যাব? এটাই কি ইনসাফ?

এগারো. আমার ছেলে বা মেয়েকে আমি সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে বখে গেছে। এ জন্য আমি খুবই দুঃখিত। এখন আমার কী করণীয়?

বারো. প্রতিপালনের বিষয়টিকে কেন এত গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়? বিষয়টি কি সহজ নয়? প্রতিটি সন্তানই তো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

শুরুর কথা হলো, আল্লাহ সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করেছেন একটি লক্ষ্যে। আর তা হলো ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদত করার লক্ষ্যে, যে ব্যাপারে আমরা গত পর্বে কথা বলেছি।

এই ইবাদতের জন্য প্রয়োজন কিছু সম্মানিত অন্তর। যে সম্মানের প্রকাশ আল্লাহ ঘটিয়েছেন রুহের জগতের ফেরেশতাদের মাধ্যমে মানুষকে সিজদা করিয়ে। তারপর সকল কিছুকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

'আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছু। নিশ্চয় তাতে রয়েছে নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।'[১৭৪]

সকল কিছুই আপনার জন্য। আপনার সেবায় নিয়োজিত। যাতে আপনি আপনার সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারেন। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারেন। এ জন্য তিনি আপনার হৃদয়কে সম্মানিত করেছেন। যাতে আপনি মহান লক্ষ্যটি অর্জনে অগ্রসর হতে পারেন। যাতে আপনি সম্মানিত হতে পারেন এবং জমিনের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারেন, যা আল্লাহর ওয়ালিদের জন্য উপযুক্ত। এ জন্যই,

﴿مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾

'যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করল, সে নিজের কল্যাণের জন্যই হিদায়াত লাভ করল।'[১৭৫]

এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে পথচলার উপকারিতা আপনিই ভোগ করবেন। আর চিরস্থায়ী জান্নাতে তো আপনার জন্য অনন্ত অসীম নিয়ামত অপেক্ষাই করছে। বিপরীতে যে তার অস্তিত্বের লক্ষ্য সম্পর্কে অচেতন থাকবে এবং নিজের লক্ষ্যকে ভুলে যাবে, সে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে।

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾

'আর তোমরা হোয়ো না তাদের মতো, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের আত্মপরিচয়।'[১৭৬]

---

১৭৪. সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৩
১৭৫. সূরা বানি ইসরাইল, ১৭ : ১৫
১৭৬. সূরা হাশর, ৫৯ : ১৯

তিনি তাদেরকে নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারা নিজেদেরকে সেই মানুষে রূপান্তর করতে পারে না, যারা মহান লক্ষ্যেকে সামনে রেখে কাজ করে। যখন আমার স্মরণে থাকবে যে, আমার অস্তিত্বের লক্ষ্য হলো ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদত এবং স্মরণে থাকবে তার ফলাফলের কথা—তখন আমার সকল কাজই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের পক্ষে সহায়ক হবে। এমনকি স্বভাবগত কাজ (যেমন : বিয়ে ও সন্তান জন্মদান ইত্যাদিও) একই লক্ষ্যে হবে। আল্লাহ্ দাসত্বের একটি সৌন্দর্য হলো, তা আমাদের জন্য সন্তান গ্রহণের স্বভাবগত প্রক্রিয়াকেও সম্মানিত করে দিয়েছে।

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

'আর যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দান করুন স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য হতে চক্ষুর শীতলতা। আর আমাদেরকে বানান মুত্তাকিদের নেতা।'[১৭৭]

সন্তানরা হবে আমাদের জন্য পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে চোখের শীতলতা। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাদের জন্য চোখের শীতলতা আযাবে পরিণত হবে।

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

'সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান যেন আপনাকে মোহগ্রস্ত না করে। আল্লাহ্ শুধু চান এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে। আর কাফির অবস্থায় তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'[১৭৮]

আমার সন্তান আমার মৃত্যুর পর আমার দায়িত্ব পালন করে যাবে। তার মাধ্যমে আমি কল্যাণ লাভ করব।

او ولد صالح يدعو له

'কিংবা নেক সন্তান। যে তার জন্য দোয়া করবে।'[১৭৯]

---

১৭৭. সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪
১৭৮. সূরা তাওবা, ৯ : ৫৫
১৭৯. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৬৩১

কিন্তু তারা যাতে তেমনটি হতে পারে, তাই আমাকে তাদের মাঝে একজন সুন্দর ও সম্মানিত মানুষ তৈরি করতে হবে; ঠিক যেমন আল্লাহ চান। এটার নামই তারবিয়াত বা প্রতিপালন।

এসব কিছুই আমাদেরকে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। তাদের প্রতিপালনকে আমাদের মৌলিক কাজের একটি অংশে পরিণত করে। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন আমরা এসব ক্ষেত্রে আমাদের মহান লক্ষ্য তথা ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদতের কথা ভুলে যাই। তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব। যদি স্বামী তাতে অবহেলা করে, তাহলে তার বিধান কী হবে? তার জবাব আমরা দেবো। কিন্তু শুরুতেই আমরা স্ত্রীর উদ্দেশে কথা বলতে চাই। অধিকাংশ নারীই যখন 'তারবিয়াত' শব্দটি শোনে তখন তার সামনে পুরোপুরি বাস্তবতা ফুটে ওঠে না। তারা ভাবে তারবিয়াত মানে হলো, আমার সন্তানরা বিদ্যালয়ে যায়। আমি তাদের জন্য একজন লোক রাখার ব্যবস্থা করেছি। যাতায়াত ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। এরচেয়ে বেশি আর কীই-বা করতে পারি? আমি যেমন বড় হয়েছি তারাও তেমন বড় হয়ে উঠবে। তাই আসুন আজ আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তারবিয়াত বা প্রতিপালন বলতে আসলে কী বোঝায়? তারপর নির্ণয় করার চেষ্টা করি, তারবিয়াত কি আমাদের সন্তানরা স্কুল কিংবা সমাজ থেকে শিখতে পারে কি না?

১. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে গড়ে তুলবেন লজ্জাশীলতা, উদারতা, আত্মমর্যাদা, দয়া, মহানুভবতা, আত্মসম্মান, জুলুমের প্রতিবাদ, আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হওয়া, হারামের প্রতি ঘৃণা, অন্যায়ে বাধা প্রদান, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গুণাবলির উপর। যে গুণাবলিগুলোকে বস্তুবাদী পৃথিবীর মানুষেরা আজ মোটেও মূল্য দিচ্ছে না। এমনকি শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া, কার্টুন কোথাও এগুলোর গুরুত্ব আপনি দেখতে পাবেন না। সেখানে আপনি এমন কিছু উপকরণ পেয়ে যাবেন, যা লজ্জাশীলতাকে নষ্ট করে দেয় এবং নির্দয়তা তৈরি করে।

২. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে শেখাবেন, সে কীভাবে চিন্তা করবে। কীভাবে সে সঠিক প্রশ্ন করবে। কীভাবে নিজের মত প্রকাশ করবে। কীভাবে সে সঠিক জ্ঞান ও অনর্থক তথ্যের মাঝে পার্থক্য করবে। তার সামনে কোনো চিন্তা পেশ করা হলে তাকে কীভাবে গ্রহণ করবে। কীভাবে তার দীনের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের চালানো প্রোপাগান্ডা থেকে বাঁচবে। কীভাবে নিজের চিন্তাকে সে জীবনে বাস্তবায়ন করবে।

৩. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। কীভাবে সে তার আত্মপরিচয়কে সংরক্ষণ করবে এবং পরিবেশ, সমাজ ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে—আপনি তাকে তা শেখাবেন। কীভাবে সে তার উম্মাহকে সম্মানিত করবে তার রূপরেখা আপনি তার সামনে তুলে ধরবেন। আপনি তাকে শেখাবেন, তুমি তোমার মতো বড় হও। অন্যের মতো হওয়ার চেষ্টা কোরো না। অন্যরা যা করেছে তা করতে না পেরে হতাশ হোয়ো না। এমন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ কোরো না, যা তোমার সামঞ্জস্য নয়। কারণ, প্রত্যেকেরই পৃথক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। এটা বোঝা ছাড়া আপনার সন্তান কখনো তুষ্ট হতে পারবে না এবং সুখীও হতে পারবে না।

৪. তারবিয়াত মনে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে তার অস্তিত্বের প্রধান প্রশ্নগুলোর উত্তর শেখাবেন। কে আমি? কে আমাকে সৃষ্টি করেছে? কোথায় আমার ঠিকানা? কী আমার অস্তিত্বের লক্ষ্য? কেন আমি মুসলিম হলাম? কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তার প্রমাণ কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের দলিল কী? কীভাবে কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষিত হলো?

৫. তারবিয়াত মানে হলো, আপনার বাইশ বছরের সন্তানটি জীবনের ষোলোটি বছর শিক্ষাঙ্গনে অতিবাহিত করে যা শেখেনি আপনি তাকে তা শেখাবেন। সে জানত না কীভাবে সে চিন্তা করবে? কীভাবে সে বিবেচনা করবে? তাই একটি ছোট্ট ভিডিও বা একটি সংক্ষিপ্ত আর্টিকেল তাকে তার দীন থেকে সহজেই বিচ্যুত করে দিতে পারে। চিন্তার সঠিক পন্থা ও বিবেচনার বিশুদ্ধ মানদণ্ড তার কাছে না থাকার ফলে সে যেকোনো সময়েই পথহারা হতে পারে। অথচ সে নিজেকে ভাবে, আমি শিক্ষার্থী। হতে পারে সে ইঞ্জিনিয়ার। হতে পারে ডাক্তার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু সে এখনো চিন্তা করতেই শেখেনি।

৬. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে তার জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। তাদেরকে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে জানাবেন। যাতে তারা অনুভব করে, পৃথিবীর বুকে তাদের জাতির গভীর শেকড় রয়েছে এবং এ তারা তাদের উম্মাহকে নিয়ে গর্ব করে। যাতে তারা অপপ্রচারকারীদের প্রোপাগান্ডায় হীনম্মন্য না হয় এবং তাদের অন্ধ অনুসারী হয়ে বসে না থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সামান্য কোনো বিতর্ক দেখে তারা যেন বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে।

৭. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে নিজেকে এই প্রশ্নটি করতে শেখাবেন, কেন আমি এই কাজটি করব? প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি করতে তাকে অভ্যস্ত করবেন। যাতে সে অন্ধ অনুসারী বা উদ্দেশ্যহীন হয়ে না পড়ে।

৮. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার শিশু বাচ্চাটির মাঝে যেকোনো কিছু মোকাবেলা করার যোগ্যতা তৈরি করবেন। ফলে সে মিডিয়া বা যেকোনো অপপ্রচার সম্পর্কে সচেতন থাকবে। আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, কীভাবে আমার পিতা (রহিমাহুল্লাহ) আমাদেরকে আমাদের দেখা বিভিন্ন বিষয়কে নির্ণয় করতে শেখাতেন। যার প্রভাব আমাদের জীবনে অসামান্য।

৯. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে উপকারী জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন। তাদেরকে বই পড়া ও যেকোনো বিষয়ের মূল উৎস অনুসন্ধান করার প্রতি আগ্রহী করবেন। তাদের স্লোগান হবে,

احرص على ما ينفعك

'তোমার জন্য যা উপকারী তার প্রতি আগ্রহী হও।'[১৮০]

এভাবে তারা আত্মিক পূর্ণতা অনুভব করবে এবং মানসিক শূন্যতা দূর করবে। ফলে অবসরের শূন্যতা দূর করতে তাদেরকে ইউটিউবারদের অখাদ্যের শরণাপন্ন হতে হবে না। ভিডিও গেইম আর কার্টুন নিয়ে সময় কাটাতে হবে না।

১০. তারবিয়াত মনো হলো, আপনি আপনার সন্তানকে আধুনিক কালের বিভিন্ন উপকরণের সঠিক ব্যবহারের প্রেরণা জোগাবেন। যাতে সে একজন মুসলিম হিসেবে সফল হতে পারে। সে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখবে। সম্পদের বণ্টন শিখবে। প্রচারণার পদ্ধতি শিখবে। নেতৃত্ব ও সংগঠনের কাজ শিখবে। এভাবে সে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে।

১১. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে নেককার সঙ্গীদের সাথে যুক্ত করে দেবেন। তাদেরকে উপযুক্ত বন্ধু ও সাথি বাছাই করে দেবেন। প্রয়োজনে আপনি তার বন্ধুদের মায়েদের সাথে সম্পর্ক করবেন। যাতে তাদের মানসিকতা ও চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে পারেন।

১২. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবেন। পরিবারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা

---

১৮০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৬৪

প্রদান করবেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানাবেন। নিজের ভাই ও বোনদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে শেখাবেন।

১৩. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানদেরকে যেকোনো বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাবেন এবং যেকোনো কাজের ফলাফলকে মেনে নিতে শেখাবেন। জীবনে কোথাও কোথাও হোঁচট খেতে হয় এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়—এই বিশ্বাস তার মাঝে স্থাপন করবেন। কীভাবে সেসব প্রতিকূলতাকে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে মোকাবেলা করতে হয় তা শেখাবেন। তাদেরকে বোঝাবেন, এখানে আমরা শুধু শান্তি উপভোগ করতে আসিনি। এটা পরীক্ষার স্থান। প্রতিদানের স্থান নয়।

১৪. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেবেন। তার মাঝে কুরআন বোঝা ও তা দ্বারা দলিল পেশ করার যোগ্যতা গড়ে তুলবেন। বিশেষত আরবী ভাষার প্রতি তার মাঝে বিশেষ ভালোবাসা তৈরি করবেন।

১৫. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে শেখাবেন, আল্লাহর শরিয়তই মুমিনের জীবনের ফয়সালাকারী। এ ছাড়া আর কোথাও মুমিনরা কোনো সমাধান তালাশ করবে না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এটা খুবই জরুরি। কারণ, এখন আল্লাহর শরিয়তকে অল্প কিছু বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা ও মানুষের প্রণীত বিধানকে সম্মান করার সংস্কৃতি চালু হয়েছে।

১৬. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানের কাছে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহিদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরবেন। আল্লাহকে সম্মান করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার বীজ বপন করবেন। আল্লাহর ভালোবাসাকে সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিতে শেখাবেন। তাওহিদকে বিকৃত করে এমন প্রতিটি বিষয় থেকে তাকে দূরে রাখবেন।

১৭. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য হতে শেখাবেন। উম্মাহর যেকোনো অবস্থাকে সে গুরুত্ব দিতে শিখবে। উম্মাহর জন্য সে ভাববে। উম্মাহর জন্য কাজ করবে।

১৮. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করবেন। তাদেরকে গুরুত্ব দেবেন। তাদের সমস্যাগুলো শুনবেন। নতুবা আপনি তাদের মাঝে মহান লক্ষ্যটি তৈরি করতে সফল হবেন না।

১৯. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানদেরকে বয়সের প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করবেন।

২০. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানকে বিপদের মোকাবেলা করতে শেখাবেন। নিজেদের ব্যক্তিত্ব তৈরি করার পথে যত বিপত্তি আসবে তা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করবেন। ঠিক যেমনিভাবে তাদের কোনো শারীরিক সমস্যার সমাধানে আপনি সচেতন হন, এ ক্ষেত্রে আপনাকে তার চেয়ে বেশি সচেতন হতে হবে।

২১. তারবিয়াত মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানদের জন্য বাস্তব আদর্শ হয়ে উঠবেন। উল্লেখিত সকল বিষয়ের ব্যাপারে সন্তানদের আদেশ করার পূর্বে আপনি নিজেই সেগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবেন। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আপনার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া এক ফোঁটা অশ্রু আপনার সন্তানদের হৃদয়ের বিদ্যালয়ের এক শ ক্লাসের চেয়েও বেশি প্রভাব সৃষ্টি করবে। ফজরের সালাতের প্রতি আপনার গুরুত্ব আপনার সন্তানদের হৃদয়ে তার গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। যা বিদ্যালয় কোনো দিন তাদেরকে শেখাতে পারবে না। তাদের পিতার অনুপস্থিতিতে আপনি যখন আপনার দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করবেন, তা দেখে তারাও সকল অবস্থায় নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান হবে। পিতা-মাতার প্রতি আপনার সদাচার ও সেবা তাদেরকে আপনার প্রতি সদাচার ও সেবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। সন্তানদের সামনে কোনো বই পড়া বা তাদের সাথে কোনো বই পাঠে অংশগ্রহণ করা তাদেরকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। তারপর আর তাদের শূন্যতা পূরণ করতে আপনাকে সময় দিতে হবে না। তারাই তাদের প্রকৃত খোরাক বাছাই করে নেবে।

মোটকথা, তারবিয়াত মানে হলো আপনি একজন মানুষকে তার লক্ষ্য তথা ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্বের দিকে পৌঁছে দেবেন। যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

আশা করি এতটুকু আলোচনায় আপনার বুঝতে পেরেছেন, তারবিয়াত মানে কী? মানুষ তৈরি করার অর্থ কী? বুঝতে পেরেছেন এই হাদিসের মর্ম—

وهي مسؤولة عن رعيتها

'আর নারী তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১৮১]

---

১৮১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮২৯

বুঝতে পেরেছেন এই হাদিসের মর্মও যা আমাদেরকে দায়িত্বের গুরুত্ব বোঝাচ্ছে,

ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ، إلَّا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ

'যে বান্দাকে আল্লাহ কোনো জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন আর সে কল্যাণকামিতা দিয়ে তা বেষ্টন করেনি, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[১৮২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ করুন, 'সে কল্যাণকামিতা দিয়ে তা বেষ্টন করেনি'। তার মানে হলো, আপনি আপনার সন্তানদের সকল স্থানে বেষ্টন করে রাখবেন। শুধু বেশি বেশি উপদেশ দিয়ে আর ভুল ধরে নয়। তাহলে তাদের মাঝে আপনার প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি করবে। বরং আপনি বাস্তব আদর্শ হয়ে তাদেরকে প্রেরণা জোগাবেন। তাদেরকে ক্ষতিকারক বস্তু থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। এ ব্যাপারে আপনি ভালোবাসা ও স্নেহসহ বদ্ধপরিকর থাকবেন। চারিদিক থেকে তাদের দিকে ধেয়ে আসা ফিতনা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলায় আপনি তাদের পাশে থাকবেন।

আপনি চাইলেই আপনার সন্তানদের মাঝে আমানত তৈরি করতে পারেন। আপনি নিজে তাদের জন্য আমানতের বাস্তব দৃষ্টান্ত হতে পারেন। যেমনটি হুজাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

إنَّ الأَمانَةَ نزَلَتْ في جَذْرِ قُلوبِ الرِّجالِ، ثمَّ نزَلَ القُرآنُ، فعلِمُوا من القُرآنِ، وعلِمُوا من السنَّةِ،

'নিশ্চয় আমানত মানুষের হৃদয়ের গভীরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তারা কুরআন শিখেছে। অতঃপর তারা সুন্নাহ শিখেছে।'[১৮৩]

আমানত হলো নিজের সাথে সততা। এই গুণটি যদি আপনি আপনার সন্তানের মাঝে তৈরি করে দেন, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তারা উপকৃত হতে পারবে। আর যদি তার মাঝে আমানতের উপস্থিতি না থাকে, তাহলে কোনো কিছুই তার কাজে আসবে না। তারা শুধু নিফাকের একটি সংখ্যা হিসেবে বাকি থাকবে।

সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহকে তার মা বললেন, তুমি ইলম অন্বেষণ করো। তোমার জন্য আমার হাতের কাজই যথেষ্ট (তিনি কাপড় বুনতেন এবং পোশাক তৈরি করতেন)।

---

১৮২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৭১৫০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৪২
১৮৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৪৩

প্রতি দশটি হাদিস লেখার পর তুমি যদি তোমার হাঁটাচলায়, সহনশীলতায় ও গাম্ভীর্যে অতিরিক্ত কিছু অনুভব না করো, তাহলে জেনে রাখো, এই ইলম তোমার ক্ষতি করছে। উপকারে আসছে না।[১৮৪]

তিনি তাকে বলেননি, তুমি এমন কিছু করো যা নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি। তুমি তোমার চাচাতো ভাইদের ছাড়িয়ে যাও। বরং তিনি বললেন, তোমার ইলম দিয়ে চরিত্রের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করো।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুমুল্লাহ শৈশবেই এতিম তথা পিতৃহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের উভয়েই মায়ের প্রতিপালনে বড় হয়েছেন এবং ইলম ও আমলে উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মা! আপনি পারেন সন্তানকে এভাবে গড়ে তুলতে। কারণ তারা আপনার সন্তান। বিদ্যালয়, কোচিং বা সমাজ কেউই আপনার বিকল্প হতে পারে না। তাই তো ইসলাম মায়েদের সম্মানিত করেছে এবং তাদের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত রেখে দিয়েছে।

এসব কিছুর পর এবার ভেবে দেখুন, তারবিয়াত বা প্রতিপালন আসলে কী? আজকের বস্তুবাদী সভ্যতা সুন্দর মানুষ গড়ার এই সংস্কৃতি তথা তারবিয়াতকে আমাদের সামনে খুবই হালকা করে উপস্থাপন করছে। বলছে, এটা শেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। অথচ নিছক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য তারা জীবনের বিশটি বছর অতিবাহিত করে দিতে উদ্বুদ্ধ করছে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানদের সবচেয়ে বড় যে নেতিবাচক বার্তা দিচ্ছি তা হলো, ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদত আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়। তারা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এই অচেতনতা তৈরি করে দিয়েছে। ব্যাপারটি ফুটে উঠেছে 'আত্মপরিচয়ের সন্ধানে' পর্বটিতে এক বোনের মন্তব্যে। তিনি লিখেছেন, 'আমি নিজেকে এই বস্তুবাদী চিন্তার শিকার বলে মনে করি। আমার তারবিয়াত হয়েছে এই কথা দিয়ে, শুধু পড়াশোনা করো। তোমার কাছে আমরা শুধু একাডেমিক দক্ষতা কামনা করি। যাতে তুমি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারো এবং বিশেষ কোনো বিভাগে ভর্তি হতে পারো। আমি তেমনটিই করেছি। তারপর কোনো রকম মানসিক প্রস্তুতি বা পরিবার পরিচালনা, স্বামীর সাথে আচরণ ও সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে আমার এই আফসোস যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারিনি। আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে বলেছে, আমার মূল্য ঠিক ততটুকুই যতটুকু আমার একাডেমিক শিক্ষা। তারা

---

১৮৪. তারিখু জুরজান লিস সাহমি : ৪৪৯-৪৫০

আমাকে বলে, কর্মাঙ্গনে গিয়ে আমি যেন আমার যোগ্যতা প্রমাণ করি। আর বাড়ির কাজ তো এমনিতেই হয়ে যায়। এটা তো করার মতো কিছু নয়। সব মেয়েই এগুলো করে। তাই তার কোনো গুরুত্ব নেই। নেই কোনো ফলাফল। এগুলো নিয়ে কেউ তোমার জন্য গর্ব করবে না।' আরেক বোন আমাকে লিখেছেন, তার স্বামী তাকে এ কথা বলে লজ্জা দেয়, 'কেন তুমি অমুকের মতো উপার্জন করো না?' সব মহিলার ঘরেই তো সন্তান থাকে। দেখুন, কীভাবে আমাদের মানসিকতা বদলে যাচ্ছে এবং ঘরে নারীর কাজকে কীভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে? নারীকে ঘরের কাজে দেখে তাকে বলা হচ্ছে চাকরানি, ধোপা, ঝাড়ুদার, বাবুর্চি ইত্যাদি। তা ছাড়া পরিবারের লোকেরা ও সন্তানরা তাকে মনে করে, সে চাকরিজীবীর মতোই এসব করতে বাধ্য। বাবারা চায় না তাদের মেয়েরা স্বামীর কাছে গিয়ে বাড়ির কাজ করুক। কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানকে যেভাবে কল্যাণকামিতা দিয়ে বেষ্টন করে রাখতে বলেছেন তার কারণে? নাকি তাদের মস্তিষ্কে পশ্চিমারা অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে?

আপনি বলবেন, বিদ্যালয় তো সন্তানকে অনেক কিছু শেখাচ্ছে। কিন্তু বিদ্যালয় কি উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো শেখাচ্ছে? নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বিপরীত কিছু শেখানো হচ্ছে? যা কিছু তারা বই থেকে পড়ছে তার বাস্তব নমুনা কি তারা বিদ্যালয়ে দেখতে পাচ্ছে? আপনি যদি আপনার সন্তানকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে চান, তাহলে আশা করি আপনি উপরের একুশটি বিষয়ের একটি লিস্ট নিয়ে যাবেন। তারপর বিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।

আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, এই লক্ষ্যগুলোর কয়টি আমরা পূরণ করতে পারি? পূরণ করতে গেলে আপনি আমাদেরকে প্রক্রিয়া বাতলে দেবেন? আপনার উত্তরে আমি বলব, আসুন আরব বিশ্বের বড় একটি দেশের বিখ্যাত একটি হাসপাতালে দুইজন বড় ডাক্তার কী করছেন সে গল্প শুনে আসি। তাদের কাছে ক্যান্সারের রোগী আসে। তারা তাদেরকে কোনো ওষুধ দেন না। আর রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত ওষুধ তারা কালোবাজারে বিক্রি করে দেন। রোগীকে শুধু নরমাল স্যালাইন দিয়ে বিদায় করেন। অর্থাৎ শুধু লবণ আর পানি দিয়ে দেন। ব্যাপারটি বেদনাদায়ক নয়? আজকের বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম শিশুর সাথে এমনটিই করা হচ্ছে। তাদের প্রয়োজন অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির রোগ থেকে নিজেদের মানবতাকে পরিশুদ্ধ করা। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষা সিলেবাসেই যা দেয়া হচ্ছে তা হলো নরমাল স্যালাইন। অর্থাৎ লবণ আর পানি। বরং অধিকাংশ সময়েই যা দেয়া হচ্ছে তা হলো বিষ। অথচ মা-বাবারা ভাবছেন, তারা তাদের সন্তানদেরকে এসব বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। ঠিক যেমন

আগের ঘটনায় রোগীকে নরমাল স্যালাইন বা বিষ দিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর রোগীর স্বজনরা ভাবছে, তাদের রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে।

আপনারা বলতে পারেন, তারবিয়াত সম্পর্কে আপনার কথাগুলো বাস্তবসম্মত নয়। আপনার কথামতো তো প্রত্যেক মায়ের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়, উল্লেখিত সকল বিষয়ে আলিমা হয়ে যাওয়া। জবাবে আমি বলি, আপনি শুধু ভিত্তিটা স্থাপন করে দেবেন। আপনার সন্তানের পা দুটো শুধু সঠিক রাস্তায় রেখে দেবেন। তারপর আপনার কাজ শুধু তাকে সাহায্য করা এবং সাহস জোগানো। সে হয়তো কোনো সংশয়ে পড়ে গেছে। আপনাকে এসে যেন সে সবার আগে বলতে পারে—এমন সম্পর্ক রাখুন তার সাথে। তাকে বলুন, এসো, আমরা দুজনে মিলে এটার সমাধান বের করি। তাকে আপনি সঠিক শিক্ষা অর্জন করার স্থান, উৎস ও ব্যক্তিদেরকে দেখিয়ে দিন। আপনার সন্তান কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। আপনি তাকে নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। এখানেও আপনাকে একই ভূমিকা পালন করতে হবে।

আপনি বলতে পারেন, আপনি দেখছি প্রতিপালনের দায়ভার পুরোটাই মায়ের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছেন। তাহলে বাবা কী করবে? জবাবে আমি বলব, এটা আসলে কোনো দায় বা বোঝা নয়। বরং এটা সম্মান। প্রতিপালন, আত্মশুদ্ধি, মানব গড়া এগুলো নবী আলাইহিমুস সালামদের কাজ। কর্মীর সম্মান নির্ণয় করা হয় কাজের সম্মানের ভিত্তিতে। ঠিক যেমন সংসারের খরচের বোঝা পুরুষের কাঁধে দেয়া হয়েছে, যার ফলে তাকে দিনের অনেকাংশ সময়ই স্বাভাবিকভাবে ঘরের বাইরে কাটাতে হয়। ঠিক তেমনই আপনি আপনার সন্তানের সাথে যে সময়টুকু কাটালেন তা আপনি পরিবারের স্বার্থেই কাটালেন। উপার্জনের জন্য পুরুষ বাইরে থাকার যে সময়টুকু পায় তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু আপনার কাজটি করার জন্য আপনার সময় সীমাহীন। এসব কিছুর পর আমরা বলব, অবশ্যই প্রতিপালন ও তারবিয়াত স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের যৌথ দায়িত্ব। কিন্তু তার জন্য উভয়ের প্রতিই উভয়ের সহযোগিতামূলক মানসিকতা প্রয়োজন। 'আমি চাকরানি নই' পর্বে কিছু ভাই আপত্তি করেছেন যে, আপনি বলতে চান, আমরা কাজ শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরব আর নারীরা ঘরে বসে বসে আমাদের আদেশ করবে? আমি তাদের উদ্দেশে বলব, প্রিয় ভাই! আপনাকে ঘরের কাজে স্ত্রীর সহযোগিতা করতে বলা হচ্ছে এবং অনেক বেশি বেশি স্ত্রীর কাছে সেবার আশা না করতে বলা হচ্ছে, যাতে স্ত্রী মহান লক্ষ্যটি বাস্তবায়নেও সময় দিতে পারেন। আর তা হলো মানবগঠন। এ কাজেও তাকে সহায়তা করা আপনার দায়িত্ব ছিল। আপনি শুধু এসব অজুহাতে তারবিয়াতের বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারেন—আপনি তাদের জন্য বাইরে কাজ করেন, তাদের

খাবার জোগানোর জন্য পরিশ্রম করেন, জীবনের বোঝা অনেক ভারী ইত্যাদি। এমন তো নয় যে, বাড়িতে এসে আপনি সময়টুকু অবসরে কাটাচ্ছেন। তাই সন্তানদের সময় দিচ্ছেন না। বরং আপনি তো মোবাইল ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। পূর্বে আমরা পরিবারের উপর পুরুষের যে কর্তৃত্বের কথা বলেছি তার দাবি হলো, বাবা পরিবারের সকলের আদর্শ হবেন এবং প্রত্যেককে তার অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। এ জন্য তাকে সর্বপ্রথম নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা নিজের দায়িত্বভুক্ত ব্যক্তিদেরকে কল্যাণকামিতা দ্বারা বেষ্টন করতে পারেনি তাদের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

'সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[১৮৫]

কথাটি যেন আপনাকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এমন বিশেষ কিছু কাজ রয়েছে, যা পুরুষ ছাড়া অন্য কারও জন্য সাজে না। এটাই সেই শ্রেষ্ঠত্বের অংশ যা আল্লাহ কতিপয়কে কতিপয়ের উপর দান করেছেন। এ ধরনের কাজ নারীকে দিয়ে করানো খুবই নিন্দনীয়। তা নারীর প্রতি অবিচারের নামান্তর। তাই পুরুষের দায়িত্ব হলো, প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীর সহযোগী হওয়া এবং তাকে সঠিক নির্দেশনা দেয়া। যদি পুরুষ তার দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে নারী তাকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দেবে। কিন্তু তাতেও যদি পুরুষ সচেতন না হয়, তাহলে কি নারী তার সন্তানকে প্রতিপালন করা ছেড়ে দিতে পারে? বাবা যদি সন্তানদেরকে টিকা খাওয়াতে নিয়ে না যায়, তাহলে কি মা-ও বসে থাকে? নাকি সে তার স্নেহের আতিশয্যে সন্তানদের টিকা খাওয়াতে নিয়ে যায়? মা কি তখন বলে, বাবা দায়িত্ব পালন করেনি, আমি একা বোঝা বইতে পারব না। তাহলে সন্তানদের আত্মিক সুস্থতা কি দৈহিক সুস্থতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়? আত্মা ছাড়া শুধু দেহ দিয়ে কি মানুষ হতে পারে? জানি, বলা যতটা সহজ করা ততটা সহজ নয়। কিন্তু বোন! আপনি এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান আশা করুন। আপনি আপনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন এবং অতিরিক্ত বোঝা বহন করে ইহসান করেছেন।

কেউ হয়তো বলবেন, আপনি তারবিয়াতের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন আমি নিজেই তার অনেক কিছু অর্জন করতে পারিনি। তাহলে কীভাবে সন্তানদের সেগুলো শেখাব? নিজে না শিখে কি কাউকে শেখানো যায়? আমি বলব, আপনি সঠিক বলেছেন। প্রথমে

---

১৮৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৭১৫০

আমাদের নিজেদেরকে উপরে উল্লেখিত সেই বিষয়গুলো অর্জন করতে হবে। তারপর আমাদের সন্তানদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। এটাই জীবনের পরিক্রমা। প্রতিনিয়ত শিখতে হবে এবং পরিশ্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে আমি সব সময়ই কথা বলি এবং আমি নিজেও এমনটিই করি। তবে তারবিয়াতের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে কিছু সিরিজ ও কিছু বইপত্রের সন্ধান দিতে পারি—যা আপনাদের প্রয়োজন পূরণ করবে এবং সামনে পথ দেখাবে। আপনারাও এ ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করুন। কারণ, এগুলো জীবনের স্বরবর্ণের মতো। যা ছাড়া জীবনে চলা যায় না।

আপনাকে সূচনা করতে হবে, মানবগঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করার মাধ্যমে। আমরা যখন সন্তানদের প্রতিপালনে মনোযোগী হব তখন প্রকারান্তরে নিজেদের আত্মসংশোধন ও সঠিক ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজটিও করে ফেলব। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আত্মাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু তার দোষ ও ত্রুটিগুলো এবং তাকে পরিচর্যা করার সুন্দর ফলাফলগুলো আমরা আমাদের সন্তানদের মাঝে দেখতে পাব। এটা যেন সৃষ্টির প্রজ্ঞারই একটি অংশ ও জীবনের একটি বিধান যে, তারবিয়াতের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা নিজের অবস্থা বুঝতে পারি। আমরা নিজেদের মাঝে ওয়াহির সিঞ্চনে যে সুন্দর বীজগুলো বপন করি তার ফলাফলগুলো সন্তানদের মাধ্যমে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

কেউ হয়তো বলবেন, তারবিয়াতের বিষয়টি কি এর চেয়ে সহজ হওয়া উচিত ছিল না? প্রতিটি সন্তানই কি ফিতরাত তথা সুস্থ মানবীয় স্বভাবের উপর জন্মলাভ করে না? মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রথম প্রজন্মটি কি উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় বেড়ে উঠেছে? তবুও তো তারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম প্রজন্ম। উত্তরে আমরা বলব, মুসলিম বিশ্বের একটি ভয়ংকর সমস্যা হলো, তারা যখন সামরিক আগ্রাসন থেকে নিরাপদ থাকে তখন ভাবে, তারা তাদের মাঝে স্বাধীন। কারণ, তারা শত্রুসেনাদেরকে নিজেদের সড়কে টহল দিতে দেখছে না। কিন্তু তারা অনুভব করতে পারে না যে, শত্রুরা তাদেরকে মানসিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, নৈতিকভাবে পরাধীনতার শেকলে বন্দী করে রেখেছে। ফলে তারা তা থেকে মুক্তির জন্য সচেষ্টও হয় না। কথাটি কোনো এক ভাই কবিতার মাধ্যমে এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

আমি বলি, আমাদের প্রতিটি দেশই শত্রু অধ্যুষিত
শত্রুবাহিনী সেখানে মার্চ করুক বা না করুক।
কী লাভ বলো, যদি শুধু ভূমি থাকে শত্রুমুক্ত
আর হৃদয় ও শরীর থাকে শত্রু অধ্যুষিত?

তাই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ফিরে আসবে সেদিনই
যেদিন আমাদের প্রতিটি মানুষের দেহ ও আত্মা স্বাধীন হবে।

মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রথম প্রজন্মটি ফিতরাত ও সুস্থ মানবীয় স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা আল্লাহর দাসত্বের ব্যাপকতা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবনযাপন করেছেন। এই লক্ষ্যই তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই তারা যেকোনো কাজকে কোনোপ্রকার ভণিতা ছাড়াই সঠিকভাবে করতে পেরেছেন। ওয়াহির মাধ্যমে তাদের অন্তরগুলো ছিল সমৃদ্ধ। তারা তাকে নিঃশর্ত বিশ্বাস করেছেন। অতীতের অজ্ঞতাকে ঘৃণা করেছেন। সেগুলোকে তুচ্ছ মনে করেছেন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। অতীতের সকল মানদণ্ড ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে আল্লাহপ্রদত্ত মানদণ্ডের সামনে সঁপে দিয়েছেন। কখনো কখনো তাদের কাছে অতীত জাহিলিয়াতের কোনো আচরণ ফিরে এসেছে। কিন্তু তারা তাকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন এবং তা থেকে পবিত্র হয়ে গেছেন। তারা কোনো অপরাধ করে ফেললেও বুঝতে পারতেন যে, তা অপরাধ। বিপরীতে আজকের পৃথিবীতে জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্ম সুস্থ মানবীয় স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করছে ঠিকই। কিন্তু শত্রুদের চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আগ্রাসন তাদের সেই স্বভাবকে দুর্বল করে দিয়েছে। বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার ও অপসংস্কৃতি দ্বারা তাকে আহত করেছে। ফলে সত্য ও মিথ্যা তাদের সামনে দ্ব্যর্থবোধক হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহর দাসত্বের ম্যাগনেট তাদের আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই তারবিয়াতের বিষয়টি আমাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে গেছে। কারণ আমরা তারবিয়াতের মাধ্যমে এমন কিছু হৃদয়কে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করছি, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালারা যাকে প্রতিনিয়ত জাহান্নামের দিকে আহ্বান করছে। কুরআন ছিল এমন এক বার্তা যা মানবমনে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করত। অথচ আজ আরবের অধিকাংশ মানুষের জন্যই তা বোঝা কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে। তাই সঠিক তারবিয়াতের মাধ্যমে আপনার সন্তানের সুস্থ মানবীয় স্বভাবের উপর পড়ে থাকা মরিচাগুলো দূর করুন। তাদের সামনে সেই মহান লক্ষ্যটি উপস্থাপন করুন, যা তাদেরকে সকল বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে ঐক্যবদ্ধ করে দেয়।

কেউ হয়তো বলবেন, আপনার কথা শুনে তো আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা হচ্ছে। আমার মাঝে হতাশা বাসা বাঁধছে। আমি আপনাকে বলব, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এই উম্মাহর শেষ অংশের অবস্থা এমনটি হবে; এটাই আল্লাহর তাকদির। হারাম সহজ হয়ে যাবে। ইসলাম প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। আর এগুলো সবকিছুই হবে মুসলিমদের একটি প্রজন্মের হাত ধরে। মুসলিমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর অন্য গ্রহ থেকে কেউ এসে আল্লাহর দীনকে সাহায্য করবে—এমনটি হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদগুলো এই বিশ্বাসটিই আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেয়। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের সন্তানদের মাঝে তারবিয়াতের মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের বীজ বপন করে মুসলিম উম্মাহর সেই বিজয় ছিনিয়ে আনব। চূড়ান্ত বিজয় মুত্তাকিদেরই হবে। আজকের সন্তানরা যেভাবে তারবিয়াত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তা কীভাবে আশা করা যেতে পারে? অথচ আজকের মা-বাবারা ভুলেই গেছে যে, সন্তানকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করা নিজেদের জীবনের প্রধান লক্ষ্যেরই অংশ। আর তা হলো, ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্ব। তরুণ ও তরুণীরা বিয়ে করে। তারা সন্তান জন্ম দেয়। কারণ, সবাই তা করছে। এরচেয়ে বেশি কিছু ভাবে না। কখনো কখনো তারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব উপভোগ করার জন্যও সন্তান নেয়। বাড়িতে বাচ্চাদের শোরগোল শোনার জন্য মা-বাবা হয়। এভাবেই প্রতিটি পরিবারের সূচনা হয়। তারপর মা ও বাবা বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদীদের তৈরি করা তথাকথিত সফলতার পিছু ছুটতে থাকে। আর সন্তানরা তার পরিণতি ভোগ করে। কোনো কোনো মা-বাবা সন্তানদের সঙ্গ দিতে পর্যন্ত বিরক্ত হয়। নিজের ইচ্ছে ও প্রবৃত্তি বাস্তবায়নের পথে তাদেরকে প্রতিবন্ধকতা মনে করে। কারণ, সন্তানদের সময় দিতে গেলে নিজের তা বাস্তবায়ন করা যায় না। ফলে সন্তানদেরকে সময় দেয়াকে তারা অনর্থক কাজ ও সময় নষ্ট মনে করে। কারণ তা তাদের তথাকথিত সেই সফলতা লাভের পথে বাধা; সন্তানরা যার কোনো অংশ নয়। ফলে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তারা চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। সন্তানরা মা-বাবার মাঝে থেকেও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ তাদের প্রতিপালনের বিষয়টি মা-বাবা উপভোগ করে না। তারপর শুরু হয় পরস্পরকে দোষারোপ করা আর বিবাদে জড়িয়ে পড়ার অধ্যায়। সন্তানরা সেসব দৃশ্য অবলোকন করে। তারা দেখে, মা-বাবা কীভাবে তাদেরকে একটি ভারী বোঝা মনে করে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। এখানে এসে অধিকাংশ মা-বাবা কী করবে? তারা সন্তানকে সবচেয়ে ভয়ানক ঘুষটি দিয়ে ফেলে। সন্তানদেরকে তাদের মনমতো চলার স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; যদিও তা তাদের জন্য ক্ষতিকর হয় না কেন। তখন মা-বাবা প্রত্যেকের নীরব ভাষা হয়, সন্তান! তুমি আমার কাছে এসো না। আমার সময় নষ্ট কোরো না। কী চাও তুমি? খাবার? নাও, যা খুশি তুমি খাও। নাও, যত খুশি তুমি খরচ করো। মোবাইল, ট্যাব, আইপ্যাড, প্লে স্টেশন যা তুমি চাও নিয়ে নাও। তাও আমার থেকে দূরে থাকো। আমাকে বিরক্ত কোরো না। যে সন্তান অজ্ঞতা ও আত্মিক শূন্যতায় চরমভাবে ভুগছে তার হাতে এমন কিছু তুলে দেয়া হয়, যা তার ক্ষতি করে। কোনো উপকারে আসে না।

গত পর্বের আলোচনায় এক বোন মন্তব্য করেছেন, 'আমার স্বামী ভালো। সে দায়িত্বশীল। কিন্তু সে তার সন্তানদের প্রতিপালনে অংশগ্রহণ করে না। তবে তাদের চাহিদাপূরণ,

আবদারপূরণ ও যেকোনো ধরনের উপকরণ দিয়ে তাদের মনস্তুষ্টিকরণে অবহেলা করে না। তার বক্তব্যমতে, তার সন্তানরা যেন অন্যদের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে না করে। অন্যদিকে সন্তানদেরকে তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করা, তাদেরকে উত্তম আদর্শ শেখানো, সালাতের প্রতি তাগিদ দেয়া, অহেতুক বস্তু থেকে তাদেরকে বিরত রাখা, উপকারী ইলমের প্রতি আগ্রহী করা ইত্যাদির প্রচেষ্টা আমাকে তাদের চোখে বাড়ির সবচেয়ে খারাপ সদস্যে পরিণত করেছে। স্বামীর স্নেহ, সহজতা ও উদারতার সামনে আমি তাদের চোখে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার সাথে এমনটি হচ্ছে। জানি না কতদিন আমাকে এই কঠিন সমস্যাটির মোকাবেলা করতে হবে? বাচ্চারা দায়িত্ব পালন করা ও কাজ করার তুলনায় খেলতে ও সময় নষ্ট করতে ভালোবাসবে এটাই তো স্বাভাবিক।' এই বোনের উদ্দেশে আমি বলব, আপনি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার পাশাপাশি এভাবেই কিছুদিন চালিয়ে যান। স্নেহ ও গুরুত্বের সাথে কাজগুলো করতে থাকুন। আর আপনার সম্মানিত স্বামীকে বলুন, তিনিও যেন আপনার সাথে আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আর আপনার এই ধৈর্য ও পরিশ্রমের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট অবশ্যই আপনার জন্য বিরাট প্রতিদান অপেক্ষা করছে।

হতে পারে, সামান্য একটু অবহেলার কারণে আপনার সন্তানের জীবনে বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। অনেক সময় পুরুষরা নারীদেরকে বলে, তোমরা সন্তানদের প্রতিপালনে গুরুত্ব দাও। কিন্তু বলে না যে, সে গুরুত্ব কীভাবে হবে? তখন নারীরা ভাবে, সন্তানদের জন্য নিজেকে শেষ করে দেয়া এবং নিজেকে বিলীন করে দেয়াটাই হয়তো তার কাছে পুরুষের কাম্য। নারী তখন ভাবে, সন্তানদের পড়ালেখার সুযোগ করে দেয়া, তাদের বিদ্যালয়ের বাড়ির কাজ করানো, বিদ্যালয়ের পড়া ঠিকভাবে শেখার জন্য তাদের পেছনে চ্যাঁচানো, তাদের বিছানা করে দেয়া এটাই হলো তাদের প্রতি গুরুত্ব। আর সে এর মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। অথচ সে একেবারে ভুল জায়গায় নিজের শ্রমকে ব্যয় করছে। ফলে সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে এবং সন্তানদেরও কষ্ট দিচ্ছে। আর ভাবছে, সে ভালো কিছু করে যাচ্ছে।

আমরা যখন ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দাসত্বকে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করব তখন আমাদেরকে মানবগঠনের সঠিক রূপরেখা সম্পর্কেও অবগত হতে হবে। তা ছাড়া আমাদের গুরুত্ব হবে কষ্টদায়ক।

অনেকেই বলেন, আমি চাই আমার সন্তান জীবনে সফল হোক। কিন্তু সফলতার মানে কী? সফলতার মানদণ্ড কী? আপনি যদি চান আপনার সন্তানদেরকে পড়ালেখায় সহায়তা করবেন, তাহলে তাদের কাছে পড়ালেখাকে পছন্দনীয় করে উপস্থাপন করুন।

তাদেরকে শেখান, কীভাবে তারা প্রতিদিনের পড়া শিখবে। কীভাবে তারা বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করবে। কীভাবে সমাধান করবে এবং সমন্বয় করবে। এভাবে বলবেন না, এসো, তোমার কাজটা আজ আমি করে দিই। অথচ এমনটিই সাধারণত সবাই বলে। প্রতিদিনের পড়া আদায় করতে না পারার বোঝাটা তাদেরকে বইতে দিন। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি করবেন না। কিন্তু সন্তানদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না। বাড়ির পরিবেশকে আতঙ্কময় করবেন না। আপনি যখন মায়ের চরিত্র থেকে শাসকের চরিত্রে চলে আসবেন তখন সন্তান আপনার অবস্থান হারিয়ে ফেলবে। এ জন্য আপনাকে আরও ধৈর্যশীলা, সহনশীলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণক হতে হবে। কিন্তু আপনি যদি সহজেই অস্থির হয়ে যান, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে পেরেশান হয়ে যান, দুয়েকটি বিষয় নিয়ে মহাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেন, তাহলে সন্তান ও স্বামী উভয়ের সাথেই আপনার দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে। কত নারী এমন আছে যারা সন্তান জন্ম দেয়ার পর শুধু মা হয়ে যায়, স্ত্রী থাকে না। সন্তানের কারণে তারা স্বামীর সাথে দূরত্ব তৈরি করে ফেলে। দিনশেষে দেখা যায়, তারা নিজেদেরকে ব্যর্থ মা, ব্যর্থ স্ত্রী ও ব্যর্থ নারী ভাবতে থাকে। এর বাজে প্রভাব পড়ে সন্তানদের উপর। তাদের কাছে মা একটি ব্যর্থ জীবনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। সেখান থেকে তারা পরিবারব্যবস্থার উপর বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। বিয়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। এমনকি তাদের এই অনীহা সেই ইসলামের উপর গিয়ে পড়ে—যে ইসলাম বিয়ের কথা বলেছে, বিয়েতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বিয়ে ছাড়া যৌনাচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এভাবেই ছেলেমেয়েরা শরিয়ত-বর্হিভূত সম্পর্কের মাঝে নিজেদের মানসিক শূন্যতা পূরণ করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কারণ, তারা ব্যর্থ বিয়ের দৃষ্টান্ত আর বৃদ্ধি করতে চায় না। 'নিজেকে জ্বালিয়ে সন্তানদের আলো দাও' এই স্লোগানটি ভুল স্লোগান। আমাদের দীন আমাদের শেখায়, তোমার উপর তোমার নিজ সত্তার অধিকার রয়েছে। সুতরাং তুমি প্রত্যেক অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অধিকার প্রদান করো। আপনি যতই পুড়তে থাকুন, সন্তানদের জীবন আলোকিত করতে পারবেন না। বরং এই পোড়া ছাই দিয়ে তাদের জীবন বিবর্ণ হয়ে যাবে। তাই পুড়বেন না; বরং স্থিরতা ও স্থিতিশীলতা দিয়ে নিজের জীবন ও তাদের জীবন আলোকিত করুন। সন্তানদের প্রতিপালনের মাঝেও নিজের সত্তাকে তার অধিকার প্রদান করুন। নিজের সত্তার সাথে সহজতা করুন ও তাকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিন। স্বামীর সাথেও সহজ থাকুন ও তাকে তার অধিকার প্রদান করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার সন্তানদের প্রতিপালনের বিষয়টি তারপরও আপনি সুন্দরভাবে সামলে নিতে পারবেন। সমাজ যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে রেখেছে সে অনুযায়ী আপনার সন্তানদের সফলতার সাথে আপনার সফলতাকে সম্পৃক্ত করবেন না। যেমন : পড়ালেখায় তাদের সফলতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন ইত্যাদি। অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

আপনার কাছে আপনার জীবনে ও সন্তানদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর অধিকার। সুতরাং আপনি সঠিক বিবেচনা ও সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তব নমুনা হয়ে যান। তাহলে তা আপনার সন্তানদের দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতা অর্জনে সহায়তা করবে। তারাও আপনার মতো সুখী ও সফল হবে।

কেউ হয়তো বলবেন, আমি আল্লাহর দাসত্বকে আমার জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছি। কিন্তু আমি আমার সন্তানদের আল্লাহর দাসত্ব ও আখিরাত নিয়ে চিন্তিত। অথবা আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়েছি সন্তানরা বড় হয়ে যাওয়ার পর। তারপরও আমি চেষ্টা করেছি আমার সন্তানদের সচেতন করতে। কিন্তু তারা আমার ডাকে কোনো সাড়া দেয়নি। এখন আমি খুব ব্যর্থতা অনুভব করি। বিষয়টি আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আমরা আপনাকে বলব, এখানে শরিয়ত একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং নির্দেশনা দিয়েছে, সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা যেন আপনার নিজের কাজের প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে না দেয়। তাদের জন্য আফসোস করে নিজেকে পোড়াতে শরিয়ত আপনাকে বারণ করে। কারণ, এটা আপনাকে কষ্ট দেবে এবং পরবর্তীকালে আপনার সন্তানরা এ নিয়ে কষ্টে ভুগবে। তাই কিতাবুল্লাহ আপনাকে এখানে এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾

'আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারেন না। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।'[১৮৬]

কুরআন আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আল্লাহর নবী নূহ আলাইহিস সালামও নিজের সন্তানকে রক্ষা করতে পারেননি। বরং আল্লাহর ফয়সালায় বাস্তবায়ন হয়েছে। তাই সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তা যেন আপনার নিজের মুক্তির চিন্তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। যদি আপনার সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্মের কেউ নষ্ট হয়ে যায়, অচেতন লোকদের মতো জীবনযাপন করে, তাহলে আপনি তাদেরকে নিয়ে ভাবতে পারেন। তাদেরকে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। শয়তান যেন অন্যের চিন্তা আপনার মাঝে প্রবেশ করিয়ে নিজের বিষয় থেকে আপনাকে অচেতন না করে ফেলে।

কেউ হয়তো বলবেন, আপনি যা বলছেন তার যৌক্তিকতা নিয়ে আমি পরিতৃপ্ত। কিন্তু মানসিকভাবে আমার স্বামী ও সন্তানদের সাথে ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে

---

১৮৬. সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬

ইবাদত, সাংস্কৃতিক কোনো কাজ অথবা দাওয়াতি কাজ। এগুলো কি সুউচ্চ লক্ষ্য নয়? আমি তার উদ্দেশে বলব, আমাদের দীন আমাদেরকে শেখায়, আমরা যা উপভোগ করি শুধু তা-ই সব সময় করে যাওয়া আমাদের জন্য উচিত নয়। বরং প্রথমে আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর পর্যায়ক্রমকে উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া এবং আল্লাহর পছন্দের চেয়ে নিজের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া প্রবৃত্তির অনুসরণেরই নামান্তর—এমনকি আপনার পছন্দের বিষয়টি যদি নেককাজও হয়। এটাই আল্লাহর এই আয়াতের মর্ম :

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

'আর যে তার রবের সামনে উপস্থিতিকে ভয় করে এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।'[১৮৭]

আল্লাহ শরিয়ত আপনাকে আদেশ করে, আপনার সন্তানদের প্রতি লক্ষ রাখতে এবং এ ব্যাপারে নিজের নফসের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে; যদিও তা আপনি উপভোগ না করেন। একই রকমভাবে শরিয়ত আপনার সন্তানদের আদেশ করে, আপনার বার্ধক্যের সময়ে আপনার সেবা করতে; যদিও তারা তা উপভোগ না করে এবং যদিও তারা এতে বিরক্ত হয় না কেন। এমনকি আপনার সেবাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ইবাদতও শরিয়ত তখন সমর্থন করে না। জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হতে ইচ্ছুক মুয়াবিয়া সুল্লামি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

الزَمْ رِجلَها فثمَّ الجنَّةُ

'তুমি তোমার মায়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকো। সেখানেই জান্নাত রয়েছে।'[১৮৮]

আবিদ জুরাইজকে আল্লাহ এ জন্য পরীক্ষায় ফেলেছিলেন যে, তিনি তার মায়ের ডাক না শুনে সালাতে মগ্ন ছিলেন—যেমনটি বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ওয়াইস আল কারনিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ও দর্শন থেকে বঞ্চিত করেছিল তার মায়ের সেবা। উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে যেসব ইবাদত থেকে মায়ের সেবা প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। যেমন : জিহাদুত ত্বলাব, নফল সালাত ও হিজরত। কিন্তু আল্লাহ এসব ইবাদতের চেয়ে মায়ের সেবাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। সম্ভবত উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে এসব ব্যক্তিরা এমন ছিলেন, যাদের উপর তাদের মায়ের সেবা

---

১৮৭. সূরা নাযিয়াত ৭৯ : ৪০-৪১
১৮৮. সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস নং : ২৭৮১; হাসান।

নির্ভর করে। যেই আল্লাহ আপনি উপভোগ না করা সত্ত্বেও সন্তানদের প্রতিপালন করতে আদেশ করেন, তিনিই সন্তানদেরকে তারা উপভোগ না করা সত্ত্বেও আপনার সেবা করা ও আপনার জন্য অবনত হওয়ার আদেশ করেন।

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾

'আর তাদের উভয়ের জন্য তোমরা অবনত করে দাও দয়ার ডানা।'[১৮৯]

ইউরোপের বয়স্ক লোকদের সাথে যা হচ্ছে, বিশেষত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে যা দেখা যাচ্ছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

প্রিয় বোন, আপনি যদি নিজের পছন্দের উপর আল্লাহ পছন্দকে প্রাধান্য দেন এবং সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে সন্তান প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে অচিরেই দেখবেন, কাজটি আপনি উপভোগ করতে শুরু করেছেন। এক সময় দেখবেন, যেকোনো কাজের চেয়ে আপনার কাছে তা বেশি ভালো লাগছে।

আশা করি এতটুকু আলোচনা হওয়ার পর আপনি বুঝতে পেরেছেন, তারবিয়াত মানে কী? এটি একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। যার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য। কারণ, এটি হলো মানবগঠন। যে মানব আল্লাহর জান্নাতে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। জাহান্নামের ইন্ধন হবে না।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

'হে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর।'[১৯০]

আপনার সন্তান জাহান্নাম থেকে আপনার রক্ষাকবচ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَن يَلِي مِن هذِهِ البَنَاتِ شيئًا، فأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ، كُنَّ له سِتْرًا مِنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি এই কন্যাসন্তানদের কাউকে প্রতিপালন করবে এবং তাদের প্রতি সদাচার করবে, তারা জাহান্নাম থেকে তার জন্য পর্দা হবে।'[১৯১]

---

১৮৯. সূরা বানি ইসরাইল, ১৭ : ২৪
১৯০. সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৬
১৯১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৯৫

আপনার সন্তান মৃত্যুর পর আপনার ভরসা।

إنَّ اللهَ ليرفعُ الدرجةَ للعبدِ الصالحِ فى الجنةِ فيقولُ يا ربِّ من أينَ لى هذا فيقولُ باستغفارِ ولدِكَ لكَ

'আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করবে দেবেন। তখন সে বলবে, আমি কোথেকে এ মর্যাদা লাভ করলাম? আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তান ইস্তিগফার করার কারণে।'[১৯২]

তা ছাড়া এই সন্তান পার্থিব জগতের আপনার চোখের শীতলতা, যদি আপনি তাকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করেন।

প্রিয় বোন, প্রক্রিয়াটি সহজ নয়। কিন্তু তার ফলাফল খুবই বড়। কখনো আপনি তাতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন। কখনো খুব ভারী বোঝা মনে হবে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন :

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

'যারা আমার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে, তাদেরকে আমি আমার পথসমূহ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারীদের সাথেই আছেন।'[১৯৩]

আল্লাহ আপনার সাথে আছেন। তিনি আপনার ভুলগুলো শুধরে দেবেন এবং আপনাকে সাহায্য করবেন। আর আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বিরাট মর্যাদা। একজন প্রশ্ন করল,

مَن أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أَبُوكَ

'হে আল্লাহর রাসূল, আমার উত্তম সাহচর্যের কে বেশি অধিকার রাখে? তিনি বললেন, তোমরা মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।'[১৯৪]

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ

---

১৯২. সুনানু ইবনি মাযাহ, হাদিস নং : ৩৬৬০

১৯৩. সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৬৯

১৯৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৭১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৪৯

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

'আপনার প্রতিপালন আদেশ করেন, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারও উপাসনা কোরো না। আর মা-বাবার সাথে সদাচার করো। যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তাদের একজন বা উভয়েই, তাহলে তাদেরকে তুমি 'উফ্' শব্দটিও বোলো না এবং ধমকের সুরে কথা বোলো না। আর তাদের সাথে তুমি বলো সম্মানজনক কথা। আর তাদের উভয়ের জন্য তুমি অবনত করো দয়ার ডানা আর বলো, 'হে রব, তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন তেমনই।"[১৯৫]

"আর বলো, হে রব, তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন তেমনই।"

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেখতে দেখতে আমরা সিরিজের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এলাম। আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয় নারীর শিক্ষা ও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। এ পর্বে আমরা বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করব। প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আমরা নারীর মৌলিক কোনো আলোচনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য একটি বিষয়কে আলোচ্য বিষয় বানালাম? উত্তর হলো, আমরা আসলে মৌলিক বিষয় থেকে স্থানান্তরিত হইনি। আমরা এ পর্বে শুধু দেখার চেষ্টা করব, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কি আসলেই নারীর প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম? এই শিক্ষাব্যবস্থা কি তার অস্তিত্বের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাকে কোনো সাহায্য করে? এই শিক্ষাব্যবস্থা কি তার জন্য উপকারী? এটা কি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী ও আত্মতৃপ্ত করতে পারে? তবে আজকের আলোচনাটি ব্যাপক পরিসরে—যা নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

প্রথমেই আমরা ওয়াহি অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব। যাতে আমাদের সামনে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপর বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেবো। কারণ আমাদের আসলে জানা উচিত, কে আমাদেরকে এই সজ্জিত ক্লাস রুমে নিয়ে এল, যেখানে আমরা আমাদের জীবনের

---

১৯৫. সূরা বানি ইসরাইল, ১৭ : ২৩-২৪

বারো থেকে চৌদ্দ বছর অতিবাহিত করি। যেটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আমাদের জানা উচিত, ভুয়া ডাক্তার, ধোঁকাবাজ ইঞ্জিনিয়ার, চোর ব্যবসায়ী, ঘুষখোর চাকরিজীবী, নাস্তিক প্রফেসর, ফেমিনিস্ট ডক্টর ইত্যাদি সমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা কী?

সর্বপ্রথম আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে আয়াত অবতীর্ণ করেন তা হলো :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

'পড়ুন সেই প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'[১৯৬]

হে মানুষ, পড়ো এবং জানো সৃষ্টি ও জীবন সম্পর্কে। তোমার রবের নামে সেগুলোকে অনুধাবন করো। বিশ্বাস রাখো যে, তোমার একজন রব আছেন। যিনি তোমাকে প্রতিপালন করেন। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন একটি রক্তপিণ্ড হতে। তারপর তোমাকে বিভিন্ন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। কলম দিয়ে লিখতে শিখিয়েছেন। তিনি তোমাকে দান করেছেন সুস্থ মানবীয় স্বভাব ও বিবেক। যার মাধ্যমে তুমি বাস্তবতাকে অনুসন্ধান করতে পারো। আর এটা সেই মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, যিনি সকল পূর্ণতার অধিকারী। এমন কোনো মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, যে ঘটনাক্রমে কিছু একটা তৈরি করে ফেলেছে। তাই তিনি মহানুভব রব। যিনি শিখিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। শিখিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। পড়ো, নিজে উপকৃত হতে এবং মানুষকে উপকৃত করতে। তোমার জ্ঞান দিয়ে তুমি তোমার স্রষ্টার পূর্ণতার প্রমাণ পেশ করো এবং তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করো। ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সফলতা অর্জন করো।

এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন। যা মানুষকে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করে। ফলে সে তার শক্তিকে মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করে। এই দর্শন মানুষকে তাওহিদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে একক রবের দিকে ধাবিত হয় এবং নিজেও স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী হয়। এই দর্শনকে বুকে ধারণ করে মুসলিমরা এগিয়ে গেল এবং জ্ঞানের জগতে বিরল সব কীর্তি গড়ে তুলল। আমরা আমাদের 'রিহলাতুল ইয়াকিন' সিরিজে মুসলিমদের এমন বহু কীর্তি ও আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছি। মুসলিমদের প্রণীত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার কথাও সেখানে উঠে এসেছে।

---

১৯৬. সূরা আলাক, ৯৬ : ১

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার মাঝে রয়েছে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। যার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

প্রথমত, ইসলাম শিক্ষাকে ইবাদতের দৃষ্টিতে দেখেছে—হোক তা ধর্মীয় শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা। তাই রবের নামে পড়ার এই সংস্কৃতি গোটা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সংস্কৃতির প্রসার ছিল পরিবারে, সমাজে, মসজিদের ইলমি হালকায় এবং ইসলামি যুগে গড়ে ওঠা মাদরাসায়। এর ফলে তৈরি হতো দ্বিতীয় বিষয়টি। আর তা হলো, সম্মিলিত দায়িত্ববোধ। প্রত্যেকেই শিক্ষাকে নিজের দায়িত্ব মনে করত। তাকে রাষ্ট্রের কাঁধে চাপিয়ে দিত না। এই দায়িত্ববোধের কারণে যদি রাষ্ট্রও কোনো বিশৃঙ্খলার শিকার হতো, তবুও ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা সেই বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকত। কারণ সমাজব্যবস্থা তখন গড়ে উঠেছিল এই চিন্তার ভিত্তিতে,

فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عنْ رعيتِه

'তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের সকলকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।'[১৯৭]

তাই প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই চেষ্টা করতেন নিজের দায়িত্বভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত রাখতে। তাই মা-বাবারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দিত ইবাদত মনে করেই। যার ফলে মুসলিম প্রজন্মের মূল অংশ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকত, যদিও কোনো কোনো অংশ তার শিকার হয় না কেন। তারপর সেই মূল অংশ থেকে নতুনভাবে সঠিক ধারার নতুন প্রজন্ম তৈরি হতো। তৃতীয়ত, শিক্ষার মূল উৎসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা। ইসলাম বলে, পড়ো তোমার রবের নামে। অর্থাৎ ওয়াহিই হলো সকল জ্ঞানের মূল উৎস। তাই ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার মানদণ্ড ও মাপকাঠি সুদৃঢ়। যা কখনোই পরিবর্তিত হবে না। তাই রাষ্ট্র যেদিকেই যাক, শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক থাকবে। জ্ঞানচর্চার ধারা ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্বেষীদের থেকে সুরক্ষিত থাকবে। রাষ্ট্র হয়তো কখনো কখনো তাকে প্রভাবিত করতে চাইবে। কিন্তু মূল উৎস থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। বিপরীতে মানুষ শাসকের ভাল-মন্দ বিচার করবে ওয়াহির ভিত্তিতে। আর শাসক না তাতে কোনো দিন স্পর্শ করতে পারবে, না বদলাতে পারবে। বরং সে নিজেও মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে ওয়াহির নির্দেশনাকে অনুসরণ করে। আর যদি সে ওয়াহির বিরোধিতা করে এবং এমন কিছু শেখানোর চেষ্টা করে যা মানুষের উপকারে আসে না, তাহলে তো ইসলাম বলেই দিয়েছে,

---

১৯৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮২৯

لا طاعةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالِقِ

'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্যের কোনো সুযোগ নেই।'[১৯৮]

বরং শাসক যদি ওয়াহির আওতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তার হাত ধরে তাকে আবারও ওয়াহির আওতায় ফিরিয়ে আনা হবে। কারণ, তার ক্ষমতা শর্তহীন নয়। বরং :

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

'যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।'[১৯৯]

চতুর্থত, সম্পদ সমাজের মাঝে ব্যাপ্ত ছিল। তা কোনো বিশেষ শ্রেণির কাছে কুক্ষিগত ছিল না। কোনো শাসকের কাছেও জমা ছিল না। ফলে পুঁজিবাদী চিন্তা থেকে কেউ শিক্ষাকে করায়ত্ত করতে পারত না। আর ইসলাম তো পুঁজিবাদের স্পষ্ট বিরোধিতা করে। ইসলাম বলে :

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

'যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের মাঝে পালাক্রমে ঘূর্ণন না করে।'[২০০]

তাই ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে বিদ্যমান ছিল। ফলে তারা সকলেই ছিল স্বাবলম্বী ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্যের থেকে অমুখাপেক্ষী। তাই আহলে ইলম ও জ্ঞানচর্চাকারীরা নিজেদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন। তারা নিজেরাই স্বাবলম্বী ছিলেন। ফলে রিযিক নিয়ে তাদের কোনো হুমকি ছিল না। তাদেরকে শাসকশ্রেণির কাছ থেকে বেতনের অপেক্ষা করতে হতো না। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাও ছিল না। এই স্বাধীন পরিবেশ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামি আওকাফ তথা ওয়াকফকৃত সম্পদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। বিত্তশালী মানুষেরা তাদের সম্পদের একটি বিশেষ অংশ ওয়াকফ করে দিতেন। যা থেকে উপার্জিত সম্পদ কিছু ব্যক্তিকে রিযিকের চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে নিশ্চিন্তে ইলম অর্জন করার সুযোগ করে দিত। এটা ছিল শাসকশ্রেণির মোকাবেলায় জনগণের বড় একটি শক্তি। যার মাধ্যমে তারা আলিমসমাজকে শাসকশ্রেণির প্রভাব

---

১৯৮. সহিহুল জামে, হাদিস নং : ৭৫২০; সহিহ।
১৯৯. সূরা নিসা, ৪ : ৫৯
২০০. সূরা হাশর, ৫৯ : ৭

থেকে মুক্ত রাখতেন। ফলে সকল ক্ষেত্রে আলিমরা নির্বিঘ্নে বিচরণ করতেন। এমনকি রাষ্ট্রব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়লেও জ্ঞানচর্চা বন্ধ হতো না। যেমন : আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ উপনিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে পরিচালিত হতো। সকল স্তরের মানুষের মাঝে সম্পদের ব্যাপ্তির ফলে গুটিকয়েক ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। বরং শিক্ষার পেছনে ইবাদতের লক্ষ্যটিই সব সময় উপস্থিত ছিল। আর মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিগতভাবে ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদতকে বাস্তবায়ন করা। পঞ্চমত, শিক্ষার ফলাফল বিবেচিত হতো ওয়াহির লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে। কোনো পুঁজিবাদী কোম্পানির স্বার্থ বা বস্তুবাদী সভ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষার ফলাফল বিবেচিত হতো না। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের কল্যাণের ভিত্তিতে শিক্ষার ফলাফল বিবেচিত হতো। তাদের আত্মা, শিষ্টাচার ও চারিত্রিক উন্নতিকেই মানদণ্ড মানা হতো। তাই একজন ফকিহ্ তার যথাযথ মূল্যায়ন পেতেন। একজন তারবিয়াতকারী মা তার যথাযথ মূল্যায়ন পেতেন। অথচ পুঁজিবাদীদের চোখে এসব মানুষের কোনো মূল্যই নেই। কারণ, তারা পুঁজিবাদের সেবাদাস নয়। এই স্বাধীন পরিবেশই শাসকের উপর সাধারণ মুসলিমদের প্রভাব বজায় রাখত এবং তাদের মধ্য থেকেই আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ নির্ধারণ করা হতো। সব সময় একটি স্বাধীন প্রজন্মের অস্তিত্ব পাওয়া যেত। তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করত সমাজের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য। ফলে তাদের নিকট কোনো কিছু গ্রহণ করা বা বর্জন করার মানদণ্ড ছিল সত্য ও মিথ্যা। কারণ, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাসত্ব করতেন না এবং তারা অর্থনৈতিকভাবেও ছিলেন স্বাবলম্বী। তাহলে মোটকথা, ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল পাঁচটি :

১. শিক্ষাকে ইবাদত মনে করা।

২. শিক্ষাকে নিজের মৌলিক দায়িত্ব মনে করা।

৩. শিক্ষার মূল উৎসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা।

৪. ফলাফল বিবেচিত হতো ওয়াহির উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।

৫. সমাজের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য। যার ফলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা শিক্ষা কখনো প্রভাবিত হতো না।

এবার জানার বিষয় হলো, ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত থাকাকালীন ইউরোপে কী হচ্ছিল? এটা জানা এ জন্য জরুরি যে, ঠিক সে সময়ে ইউরোপেও একটি স্বতন্ত্র

শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। তারপর যখন ওয়াহির সাথে আমাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেল এবং ইউরোপিয়ানরা আমাদের দেশগুলো দখল করে নিল, তখন তারা আমাদের উল্লেখিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হলো। তারা কৌশলে ও শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সরিয়ে সেখানে তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করে দিলো এবং আমাদের মস্তিষ্ককে তার অনুগামী করে দিলো।

ইউরোপিয়ানরা প্রথম দিকে সামাজিক বৈষম্যের চর্চা করত। তাদের মাঝে তখন দুটি শ্রেণি ছিল। নেতা ও কর্মী। শিক্ষা ছিল তখন শুধু নেতাশ্রেণির অধিকার। কর্মীশ্রেণিকে যদি কোনো শিক্ষা দেয়াও হতো, তা হতো নেতাশ্রেণির সেবা ও দাসত্ব করার সুবিধার্থে। তারপর এল বিপ্লবের যুগ। ইতালিতে যার সূচনা হয়েছিল ১৪০০ থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এ সময়ে প্রাচীন শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধিত হলো এবং এমন কিছু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো যেখানে মানুষ বসবাস করত শুধু নাগরিক পরিচয়ে। নেতা বা কর্মী বলতে সেখানে কোনো পরিচয় ছিল না। যার ফলে কিছুদিন মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারল। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার নতুন বৈষম্য চলে এল। আর তা হলো পুঁজিবাদের বৈষম্য। যেহেতু দীর্ঘ একটি সময় যাবৎ শিক্ষা শুধু একটি শ্রেণির মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই তাকে সমাজের সকল শ্রেণির মাঝে বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই ইউরোপে তৈরি হলো সরকারি বিদ্যালয়। আর এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের বিশ্বাসকে প্রজন্মের মাঝে বদ্ধমূল করা তথা Indoctrination। তাদের লক্ষ্য ছিল, এসব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। ফলে রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হবে। কারাখানাগুলো সচল হবে এবং এসবের মাধ্যমে অন্যসব রাষ্ট্রের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা ও দখলদারি চালানো সহজ হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি করা হলো কারিগরি বিদ্যালয় তথা Factory model schools। যে স্কুল থেকে দক্ষ কর্মী তৈরি হতো। যাদের কাজ ছিল কারখানায় কাজ করা। এ ধরনের বিদ্যালয় সর্বপ্রথম ১৭১৭ সালে জার্মানির প্রুশিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপর আঠারো শতকের শেষভাগে প্রথম শিল্পবিপ্লব সাধিত হলো। নারীকে ঘর থেকে বের করে আনা হলো এবং তাদের মাঝে জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ বিতরণ করা হলো, যাতে তারা দীর্ঘক্ষণ কারাখানায় কাজ করতে পারে। এর আগে ১৮০৭ সালেই প্রুশিয়ার স্কুলগুলোকে সরাসরি ঘোষণা দিয়ে সরকার নির্ধারিত পাঠক্রম পড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল। জার্মান দার্শনিক জোহান গোটলিব ফিস্তে বলেন, বিদ্যালয় ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে দেবে। এমনভাবে বদলে দেবে যে, আপনি যা চান তার বাইরে সে যেন অন্য কিছু না চায়। এর কারণ ছিল, জার্মানরা ফ্রান্সের সাথে বিবাদে জড়িয়ে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। রাষ্ট্রের সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই নাগরিকদের এভাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল কর্তারা। দার্শনিক ফিস্তের মতে জার্মানির পিছিয়ে পড়ার

পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, ছাত্রদের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার। কারণ তারা তখন ভালো ও মন্দের মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার দূর করে দিলেই তার সমাধান হয়ে যায়। তারা সিদ্ধান্ত নিল, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছাত্রদেরকে তৈরি হবে তা হলো রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকরণ। এ জন্যই ছাত্রদেরকে প্রতিদিন সকালে সেনাবাহিনীর মতো সারিবদ্ধ হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রের পবিত্রতার বাণী গাইতে হবে।

তারপর জার্মানিতে উদ্ভাবিত হলো নতুন ব্যবস্থা। ১৮৩০ সালে ফ্রেডরিখ ফ্রোয়েবলের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হলো কিন্ডার গার্টেন স্কুল। এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অনুপ্রেরণা ছিল, শৈশবে তার মা মারা গিয়েছিল এবং বাবা আরেকটি বিয়ে করেছিল। ফলে সে মা-বাবা উভয়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল। এ ধরনের স্কুলের মাধ্যমে তাই সে স্নেহহারা বাচ্চাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিল। ঠিক এই সময়টিতেই ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করেছিল। যা ইতিপূর্বে মুসলিমদের দখলে ছিল। তখন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিক টমাস মিকোলি ভারতবর্ষের ব্রিটিশদের নির্ধারিত শাসকের নিকট পত্র লিখল। যার শিরোনাম ছিল, ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা। সেই পত্রের মাঝে যা লেখা ছিল তার মাঝে এ কথাটিও ছিল, এ সময়ে আমাদেরকে নিজেদের মাঝে ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যেতে হবে। আমাদেরকে ভারতবর্ষে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে হবে, যারা রক্ত ও বর্ণে যদিও হিন্দুস্থানি হবে; কিন্তু চিন্তাধারা, চরিত্র ও রুচির দিক থেকে তারা হবে ইংরেজ। এমন একটি প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজনে আমাদেরকে রাষ্ট্র কর্তৃক সহায়তা প্রদান করতে হবে। তারপর ব্যাপকাকারে তার প্রসার ঘটাতে হবে। আর এই প্রজন্মটিকে গোটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে শিক্ষিত ও অনুসরণীয় প্রজন্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। এই হলো সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এভাবেই তারা সামরিকভাবে কোনো দেশকে দখল করার পূর্বেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে দখল করে নিত। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান সরকারি বিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনার স্বার্থে টমাস মিকোলির সূক্ষ্ম দর্শনটিকে আপনার মস্তিষ্কে টুকে রাখুন। ইউরোপে যখন এসব কিছু চলছিল তার মাঝেই মুসলিম পক্ষ থেকে বহু জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তা শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 'পড়ো তোমার রবের নামে' এ দর্শন থেকে দূরে সরে গেল। তৈরি হলো নতুন দর্শন—পড়ো রাষ্ট্র ও তার শক্তির নামে। প্রকারান্তরে পড়া শুরু হলো মানুষের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও শক্তির নামে। ১৮৪৩ সালে কারিগরি বিদ্যালয়ের চিন্তাটি রাশিয়া থেকে পুরো ইউরোপ ও আমেরিকায় স্থানান্তরিত হলো। তারপর ১৮৪২ থেকে ১৯১৭ মধ্যবর্তী

সময়ে গোটা আমেরিকায় সরকারি বিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৯২ সালে আমেরিকায় দশ ব্যক্তির সমন্বয়ে 'কমিটি অব টেন' গঠিত হলো—যাদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। যখন এই দশ ব্যক্তি এই শিক্ষাব্যবস্থাটি প্রণয়ন করল এবং তা মুসলিম বিশ্বে প্রসারিত হয়ে গেল তখন আমাদের উচিত প্রশ্ন করা, এই দশ ব্যক্তি কারা? কী তাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য? কেন আমরা তাদের উপর ভরসা রাখব? তারা যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিল তার সাথে কি আমরা একমত? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে আসুন আমরা এই দশজন ব্যক্তির মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি উইলিয়াম টোরি হ্যারিসের জীবন থেকে ঘুরে আসি। যাকে আমেরিকান প্রশাসন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য নির্ধারণ করেছিল। সে একটি আর্টিকেল লিখেছে যার শিরোনাম, 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন' তথা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। এখানে ভারতীয় বলে রেড ইন্ডিয়ানদের বোঝানো হয়েছে। যারা ছিল আমেরিকার আদিবাসী। আসুন আমরা আর্টিকেলটির মূল অংশে চোখ বুলাই। বলে রাখা ভালো যে, আমেরিকার ভূমিতে মূলত বসবাস করত রেড ইন্ডিয়ানরা। ইউরোপিয়ানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে তাদের মাতৃভূমি দখল করে নিল। এটা ছিল এক নির্মম ইতিহাস, যার ব্যাপারে আমরা অন্য সিরিজে কথা বলেছি। ইউরোপিয়ানদের দ্বারা আমেরিকা দখল হওয়ার পরও সেখানের আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে ইউরোপিয়ানদের একটি দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকল। উপরে আলোচিত আর্টিকেলটিতে রেড ইন্ডিয়ানদেরকে কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় এনে আমেরিকার নতুন সভ্যতার অনুসারী বানানো যায় তার পন্থা আলোচনা করা হয়েছে। যাতে তারা আমেরিকার নিয়ন্ত্রক তথা বর্তমানে যারা নিজেদেরকে আমেরিকার আসল নাগরিক বলে দাবি করে তাদের বিরুদ্ধে হুমকি না হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যে সমাধানটি পেশ করা হয়েছে তা হলো, বাধ্যতামূলক একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো। যার ফলে রেড ইন্ডিয়ানদের সন্তানদেরকে শৈশবেই তাদের পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বারো বছরের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাগ্রহণের জন্য নিয়ে আসা হবে। এ ক্ষেত্রে সময়টিও দীর্ঘ হতে হবে। কারণ, দুই থেকে পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তাদের মস্তিষ্কে নিজেদের চিন্তার বীজ ভালোভাবে বপন করা সম্ভব হবে না। ফলে তাদের মাঝে শিক্ষার প্রভাব বেশি দিন অব্যাহত থাকবে না এবং তাদেরকে শিল্পবিপ্লবের অংশ বানানোও সম্ভব হবে না। তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও দখল নিশ্চিত করার জন্য সামরিক বাহিনীতে অর্থ ব্যয় না করে রেড ইন্ডিয়ানদের শিক্ষার পেছনে কিছু অর্থ ব্যয় করলে তা আরও ফলপ্রসূ হবে।

এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের জন্য রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। এভাবেই হাসিমুখে একপ্রকার জোরপূর্বক তাদের

সন্তানদেরকে দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে সাদা চামড়ার লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো চিন্তাধারা তাদের মস্তিষ্কে স্থাপন করছিল, অথচ তাদের পিতা-মাতারা তা বুঝতেও পারছিল না। শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত দশজনের মাঝে একজন হলো উইলিয়াম হ্যারিস। সে শিশুদেরকে সকাল সকাল বিদ্যালয়ে উপস্থিত করার পদ্ধতিটি চালু করল এবং দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে কাটানোর ব্যবস্থা করল। এর পেছনে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল, শিশুদের উদ্যমকে নষ্ট করে দেয়া এবং এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের মা-বাবাকেও নিয়ন্ত্রণ করা। সর্বোপরি সকলের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া। যদি এই লক্ষ্যগুলো সমাজে খুব স্বাভাবিকভাবে বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। নতুবা সেই চিত্রই তৈরি হবে যা বর্তমান চীনে উইঘুরের মুসলিমদের সাথে ঘটছে। তাদের সন্তানদেরকে পরিবার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পরিবার ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তারপর তাদেরকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী এমনভাবে প্রতিপালন করা হয় যে, তারা মানবযন্ত্রে পরিণত হয়। উইলিয়াম হ্যারিস শিক্ষাব্যবস্থার নামে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার এই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সে তার শিক্ষার দর্শন বিষয়ক বইটিতে বলেছে, বর্তমান সময়ে যেকোনো জাতির শতকরা ৯৯ জন মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সীমাবদ্ধ কিছু কাজের মধ্য দিয়েই তারা তাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে আগ্রহী। তারা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া নিয়মকানুনগুলো পালন করতেই বেশি পছন্দ করে। আর এটা হঠাৎ করেই হয়নি। বরং শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্ককে খাঁচাবদ্ধ করে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে যদি আমরা পারিভাষিক শিরোনাম দাঁড় করাই, তাহলে তা হবে, 'ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধকরণ ও তার বৈশিষ্ট্যহরণ'। তারপর সে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিভিন্ন পন্থার কথা উল্লেখ করেছে।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, হ্যারিস, ফেস্তো এদের দিয়ে আমাদের কী কাজ? তারা তো অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। বর্তমান সময়টা দেখুন। কীভাবে পশ্চিমা বিশ্ব চিন্তার স্বাধীনতায় এগিয়ে যাচ্ছে। আপনি যে বিবর্তন বা চিন্তার স্বাধীনতা হরণের কথা বলছেন তা এক সময় হয়তো ছিল; কিন্তু এখন নেই। তাকে আমরা বলব, আপনি বলতে চাচ্ছেন, এটা এখন নেই? তাহলে সেই বিবর্তন ও ব্রেইনওয়াশের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন, বর্তমান বিশ্বের শিক্ষার্থীরা যার শিকার হচ্ছে? ব্রেইনওয়াশের শিকার হওয়ার পর তাদের কাছে এখন ব্যভিচারকে ব্যক্তিস্বাধীনতা মনে হচ্ছে। আর এভাবেই যদি তাদের স্বাধীন ইচ্ছাধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তারপর তাদের ব্রেইনওয়াশ করে সেখানে রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকরণের নীতি ও মানদণ্ড স্থাপন করে দেয়া হয় আর তার জন্য কোনো সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত উৎস না থাকে, তাহলে দিনের পর দিন তা পরিবর্তনই হতে থাকবে। কখনোই তা সুস্থির হবে না।

এবার এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আপনি সঠিক ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সাথে তুলনা করুন। যেখানে ওয়াহিই হলো সকল কিছুর উৎস ও শেষ কথা। যে ওয়াহি সময়ের পরিবর্তনে কখনো পরিবর্তন হয় না ও বদলে যায় না। যে ওয়াহির মাঝে সব সময়ই বিদ্যমান থাকে :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'[২০১]

সকলের ক্ষেত্রে এই একই স্লোগান। আর এই শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয় এমন এক স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী সমাজে, যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা বাস্তবায়িত হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বিভাজন চলে না। অথচ ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার কোনো বিদ্যালয়ে একই শ্রেণিকক্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ শিশুরা একসাথে বসার নিয়ম ছিল না। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাজপথে বহু আন্দোলন হয়। স্লোগান ওঠে, বর্ণবৈষম্য বন্ধ করো। একটি ঘটনার কারণে আন্দোলনটি শুরু হয়। কৃষ্ণাঙ্গ শিশু রবি ব্রেডজেস যখন শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে তখন অন্য শ্বেতাঙ্গ শিশুদের অভিভাবকরা আপত্তি জানায় এবং তাদের সন্তানদের শ্রেণিকক্ষ থেকে বের করে নিয়ে আসে। শিশু রবি একাই শ্রেণিকক্ষে বসে থাকে। এবার ভেবে দেখুন, কীভাবে আমরা এদের থেকে কোনো বিবেচনা ছাড়াই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি? যারা খুব নিকট অতীতেই মানুষের বর্ণ নিয়ে বৈষম্য তৈরি করত। অথচ আমরা সেই জাতি, যাদের স্লোগান হলো :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

'তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যার তাকওয়া সবচেয়ে বেশি।'[২০২]

এ ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

ابو بكر سيدنا و اعتق سيدنا

'আবু বকর আমাদের নেতা। আর তিনি আজাদ করেছেন আমাদের আরেক নেতাকে।'[২০৩]

অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ইথিউপিয়ান দাস বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আজাদ করেছেন।

---

২০১. সূরা আলাক, ৯৬ : ১
২০২. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩
২০৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৩৭৫৪

কেউ হয়তো বলতে পারেন, আপনি শুধু এই শিক্ষাব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলো উল্লেখ করছেন। ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরছেন না। এটা তো পক্ষপাত। তার জবাবে আমরা বলব, এখানে আমাদের লক্ষ্য শুধু শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস তুলে ধরা নয়। বরং আমাদের লক্ষ্য হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তার সাথে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বৈপরীত্যগুলো তুলে ধরা। এই বৈপরীত্যের কারণে মুসলিমদের সন্তানরা কী কী পরিণতি ভোগ করছে তা আলোচনা করা। আমি একা চাইলেই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারব না। তাই আমি চাই সেখান থেকেই আওয়াজ উঠুক, যারা এই শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে আমেরিকার বহুজাতিক শিক্ষাব্যবস্থা সংরক্ষণ কমিটি আমেরিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি বার্তা দিয়েছে। যার শিরোনাম, একটি জাতি হুমকির সম্মুখীন। সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের অনিবার্যতার কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বার্তাটির লেখক জেমস হারফির তাতে লিখেছে, আমাদের সমাজে শিশুদের প্রতিপালনের যে রীতি চলে আসছে, তা একটি রাষ্ট্র ও জাতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলবে। যেকোনো সময় কোনো শত্রুপক্ষ বা আমেরিকার স্বার্থবিরোধী কোনো গোষ্ঠী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লাগাম টেনে ধরে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে সহজেই বিজয়ী হয়ে যাবে। কিন্তু এই বার্তাটি প্রদান করার পরও কি শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করা হয়েছে? তার উত্তর এই ঘটনার আট বছর পর ১৯৯১ সালে প্রকাশিত Dumbing Us Down বইটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। বইটির লেখক জন টেইলর গেটো দীর্ঘ সময় শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছে। তারপর সে এই বইটি লিখেছে। যার নামটি ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, বাধ্যতামূলক চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিকর ও ভীতিকর দিকসমূহ। এই বইয়ে সে আমেরিকায় প্রচলিত সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছে এবং বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ২০০২ সালে বইটির আরেকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমি আপনাদের সামনে সেই বই থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই, যাতে আপনারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারেন। গেটো লিখেছে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই এই গ্রহে মানুষের কোনো কাজে আসে না। এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সফল মনোবিজ্ঞানী তৈরি হয়নি। কোনো সফল কবিও এখান থেকে ভাষা শিখে কবি হতে পারেননি। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিরা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কোনো রকম উপকৃতই হতে পারেননি। জন গেটো আরও লিখেছে, বাস্তবতা হলো, বিদ্যালয়গুলো সরকারের আদেশ কীভাবে পালন করবে তার নির্দেশনা ছাড়া আর কিছুই শেখাচ্ছে না। অর্থাৎ সেই ব্রেইনওয়াশ যার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সে আরও লিখেছে, শিক্ষাব্যবস্থার কাছে কোনো

নির্ভরযোগ্য রূপরেখা নেই। তাদের বিশেষ কোনো লক্ষ্যও নেই। এক ক্লাসের বেল বাজছে আর শিশুরা বই খুলে বসছে। আরেক ক্লাসের বেল বাজার সাথে সাথে তা বন্ধ করে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়াই চলছে স্কুলগুলোতে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, মানুষ আর বানর একই উত্তরাধিকারে জন্ম লাভ করেছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী এক ক্লাসে জানছে, পশুদের সাথে মানুষের জিনগত কোনো মিল নেই। আরেক ক্লাসে এসে জানছে, সে এই পশুদের ভাই। এখান থেকে সে কোনো কিছুই নিজের জীবনের জন্য গ্রহণ করতে পারছে না। কোনো কিছুর প্রতিই সে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না। ফলে সে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে ও নিজেকে প্রতারিত অনুভব করছে। এই দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই এখন ব্যাপকভাবে সারা বিশ্বে চলছে। বিশেষত কিছু কিছু সিলেবাস শিক্ষার্থীকে ধর্ম সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে এবং পরক্ষণেই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার বীজ বপন করে যাচ্ছে। যা জীবনের বাস্তবতায় এসে শিক্ষার্থীদের পেরেশান করে তুলছে। অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত তাদের মস্তিষ্কে ঠেসে দেয়া হচ্ছে। জন গেটো আরও বলেছে, অল্পবিস্তর সংস্কার দ্বারা এই শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক হবে না। এ জন্য আমাদেরকে আগে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং পরিবারের সাথে এর যোগসূত্র তৈরি করতে হবে। তার মতে, একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে উপযুক্ত হতে হলে তাকে অবশ্যই শিক্ষার্থীকে দুটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দিতে সক্ষম হতে হবে। আর তা হলো, কীভাবে সে জীবনযাপন করবে এবং কীভাবে সে জীবনের সমাপ্তি টানবে? যার কোনোটা সম্পর্কেই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কোনো ধারণা দিতে সক্ষম নয়। বরং এই শিক্ষাব্যবস্থা সবকিছুকে বস্তুগত দৃষ্টিতে বিবেচনা করছে। অথচ তার এই দৃষ্টিকোণ পুরোপুরি ধারণ করার সক্ষমতা নিয়েও বস্তুবাদীরা প্রশ্ন তুলে বসে আছে।

২০০৬ সালে রাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শক রবিনসন—যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের কারণে 'ফারেস (Knight)' উপাধি পেয়েছেন—একটি পর্যালোচনা পেশ করেছেন, যা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। তার পর্যালোচনাটির ভিডিও এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৬ মিলিয়ন মানুষ দেখেছে। তার পর্যালোচনাটির শিরোনাম হলো, Do schools kill creativity? (বিদ্যালয় কি সৃজনশীলতা নষ্ট করে দিচ্ছে?)। এখানে তিনি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, তা শিক্ষার্থীদের মাঝে ভুল হওয়ার ভয় তৈরি করে। যা তাদেরকে অগ্রসর হওয়া ও কোনো কিছু উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে অনীহা তৈরি করে। এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের খেলাধুলার বিষয়টি বিবেচনা করে না। ফলে সে বসে থাকতে ও স্থবির থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাই নিজের যোগ্যতাকে সে কখনো আবিষ্কার করতে পারে না। বরং তাকে দাফন করে দেয়। রবিনসন বলেন, শিক্ষা হলো পরিশোধন সরঞ্জামের মতো। যা মানুষের বিবেক থেকে ভুল ও অনর্থক বিষয়গুলোকে দূর করে

দেয়। এর বাইরে যা কিছু শেখানো হয়, তা শিক্ষার্থীকে অসুস্থ করে তোলে। অথচ সে তার নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে জানতেও পারে না।

ডক্টর জর্জলান একটি ভিডিও তৈরি করেছেন। যার শিরোনাম 'পাশ করার ব্যর্থতা'। সেখানে তিনি বলেছেন, আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক সংস্থা নাসা তাকে ও তার বন্ধু বেস জারম্যানকে নাসায় চাকরিরত ব্যক্তিদের সৃজনশীলতা যাচাই করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার অনুরোধ করে। তারা সেই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করে নাসাকে পেশ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, শিশুদের সৃজনশীলতা নিয়ে তারা একটি গবেষণা-প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। সেই প্রতিবেদনে তারা লেখেন, বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে প্রতিদিনই শিশুরা তাদের সৃজনশীলতাকে হত্যা করছে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে তাদের মাঝে যে সৃজনশীলতা বিদ্যমান ছিল বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা সেটুকুও হারাচ্ছে। ২০১৩ সালে রবিনসন আরও একটি পর্যালোচনামূলক ভিডিও প্রস্তুত করেন। যার শিরোনাম, 'কীভাবে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মৃত্যু-উপত্যকাটুকু অতিক্রম করব?'

কেউ হয়তো বলতে পারেন, কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উপর যোগ্যতা হত্যার অভিযোগ তোলা হয়? অথচ আমরা দেখছি, এর মাধ্যমেই দিনদিন দ্রুতগতিতে বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে। তার উদ্দেশে আমরা বলব, আল্লাহ মানুষকে যেসব যোগ্যতা দান করেছেন তা আরও ক্ষুরধার। আজ আমরা যত আবিষ্কার দেখছি তা হলো কয়েক শতাব্দী যাবৎ ধারাবাহিক গবেষণার ফল, যার মাঝে মুসলিমদেরও বিরাট অবদান রয়ে গেছে। তাই আবিষ্কারের অগ্রগতি এ কথা বোঝায় না যে, বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সফল। বরং Cradles of Eminence নামক একটি বই—যা ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে—তাতে ৭০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির শৈশব নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, তাদের প্রতি পাঁচজনের তিনজন অর্থাৎ প্রতি এক শ জনের ষাটজনই বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের শিক্ষার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। টমাস এডিসনকে তার শিক্ষক বলে দিয়েছিল, তুমি বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত নও। তাই তার আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। শিক্ষকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়াই তাকে বড় হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আইনস্টাইনকে তার গ্রিক ভাষার শিক্ষক বলে দিয়েছিল, সে জীবনে কোনো ক্ষেত্রেই সফল হতে পারবে না। সে সবার সময় নষ্ট করছে। তার উচিত দ্রুত বিদ্যালয় ত্যাগ করা। আল্লাহ ভালো জানেন, পূর্ব ও পশ্চিমে আরও কত প্রতিভাবান মানুষের প্রতিভা ও যোগ্যতা এই শিক্ষাব্যবস্থার অযোগ্যতার ফলে দাফন হয়ে গেছে!

আজকের পৃথিবীতে তাই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে আরেকটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠছে, যাকে Waldorf education বলা হয়। যেখানে শিশুদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে কোনো ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় না। আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির অধিবাসী বহু মানুষ তাদের সন্তানকে এ ধরনের বিদ্যালয়ে পড়ান। এ ধরনের বিদ্যালয়ের উদ্ভাবক হলেন রোডেল্ফ স্টাইনার। ইবনু তাইমিয়ার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। তিনি তার গ্রন্থ 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম' গ্রন্থে বলেছেন, 'যখন মূল নষ্ট হয়ে যায় তখন শাখার মাঝে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে, সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিশেষ কিছু প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে পারবে। কারণ, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে কখনো কখনো সে বিবাদের বিষয়টি নিয়েও সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কারণ, সে তার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। বাস্তবতা হলো, কাফিরের সকল কর্ম ও বিষয়ে অবশ্যই কোনো না কোনো সমস্যা রয়েই যায়। যার ফলে তার পূর্ণ উপকারিতা কখনোই পাওয়া যাবে না। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তার কোনো বিষয় পূর্ণতা লাভ করেছে, তবুও তার বিনিময়ে সে আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে না। তাই তার সকল বিষয় হয়তো বাতিল, নয়তো অপূর্ণাঙ্গ।' তাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুশরিকদের বিরোধিতা করা ও তাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন। বিশেষত তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। তাদের আবিষ্কৃত জিনিস ব্যবহারের বিধান সম্পর্কে আমরা এখানে কথা বলছি না। কিন্তু যেসকল বিষয়ের সাথে জীবনদর্শনের সম্পর্ক রয়েছে সেসব বিষয়ে তাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ, এসব ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করলেই আপনি বিপত্তির শিকার হবেন। যা কখনো আপনি বুঝতে পারবেন; আর কখনো নিজের অজান্তেই তা হয়ে যাবে। কারণ তাদের সকল কর্ম হয়তো বাতিল, নয়তো অপূর্ণাঙ্গ। তাই মুসলিমদের উচিত ওয়াহির মানদণ্ডকে সামনে রেখে নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা নিজেরাই প্রণয়ন করা।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে বের হয়ে যারা নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন তাদের মাঝে একজন হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক সালমান খান। তিনি পাঠদানের ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ ও সরল ভাষার অধিকারী। তিনি নিজ থেকে একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। যার ব্যাপারে তিনি TED এর সাথে আলাপ করেছেন। The History of Education শিরোনামে তার এই আলোচনা আপনি TED এর ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। আমাদের আজকের আলোচনার অনেক অংশ সেখানেও আপনি পেয়ে যেতে পারেন। এই সালমান খান একটি আন্তর্জাতিক বিনামূল্যের শিক্ষাসংস্থা খুলেছেন। যার নাম খান একাডেমি। সেখানে অনেকগুলো

শাস্ত্রের পাঠদান করা হয়। এ সংস্থা থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস শিখতে পারে এবং যা বুঝতে কষ্ট হয় তার ব্যাপারে খুব সহজেই কোনো শিক্ষক থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই সংস্থাটি প্রসিদ্ধি লাভ করার সাথে সাথেই পুঁজিবাদীরা তাকে ঘিরে ফেলেছে। গুগলের মতো প্রতিষ্ঠান ও বিল গেটসের মতো ব্যক্তিরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে এই সংস্থাকে সহায়তা করেছে। আর স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক সহায়তার সাথে সাথে চিন্তাগত প্রভাব কিছুটা তৈরি হয়েছে। যার প্রভাবও দেখা গিয়েছে খুব দ্রুত। গুগল ও মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে খান একাডেমির ইন্সটাগ্রামে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের পোস্ট দেখা গিয়েছে। এ ছাড়াও তারা সমকামিতার প্রচারেও অংশগ্রহণ করেছে। এ ছাড়া যত রাষ্ট্র শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করেছে তার পেছনে সেই ব্রেনওয়াশ ও আগামী প্রজন্মকে নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করেছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আর হয়নি। এ ক্ষেত্রে আপনি শিক্ষাসংস্কার নিয়ে কাজ করা কিছু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দেখতে পাবেন। যেমন : IG, SAT, IB ইত্যাদি। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের মাঝেও উল্লেখিত যেকোনো প্রক্রিয়া বা তার অংশ বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, প্রচলিত সকল শিক্ষাব্যবস্থার মাঝেই আপনি নিম্নোক্ত অসংগতিগুলো পেয়ে যাবেন :

১. ওয়াহির বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্নতা।

২. আল্লাহ সাথে ও ঈমানের সাথে জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা।

৩. জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে ইবাদতের মানসিকতার অনুপস্থিতি।

৪. ব্রেইনওয়াশ ও চিন্তাগত দাসত্ব। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্র বা বিশেষ গোষ্ঠীর সেবাদাসে পরিণত করা হচ্ছে।

৫. যোগ্যতার মানদণ্ডে ক্রমাগত পরিবর্তন।

৬. শিক্ষার ফলাফলকে বস্তুগত উন্নতি ও কর্মের বাজার হিসেবে মূল্যায়ন।

৭. একটি তথ্যের সাথে অন্যটির অসামঞ্জস্যতা ও বিপরীতমুখিতা। দেখা যায়, ছাত্রদের বিজ্ঞানের ক্লাসে এমন কিছু পড়ানো হচ্ছে যা ধর্মের ক্লাসের অনেক কিছুর সাথে সাংঘর্ষিক।

তা হলে এখন কী উপায়? কেমন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন? আর সেই শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর অবস্থানই বা কী? এ ব্যাপারে আমরা সামনে কখনো কথা বলব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, এই পর্বে উল্লেখিত বহু তথ্য আমি বিভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করেছি। তথ্যগুলো আমাকে একত্র করে দিয়েছেন প্রিয় ভাই ডক্টর আব্দুর রহমান জাকির। যিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষা বিষয়ক গবেষক। এ ছাড়াও পর্বটি তৈরি করতে গিয়ে আমি বারবার প্রিয় ভাই উস্তায আনাস শাইখ ইকরিমের শরণাপন্ন হয়েছি। যিনি একজন শারিয়াহ বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়াও অনেক ভাই ও বোন তথ্য সংগ্রহ ও উৎস অনুসন্ধানে আমাকে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুন।
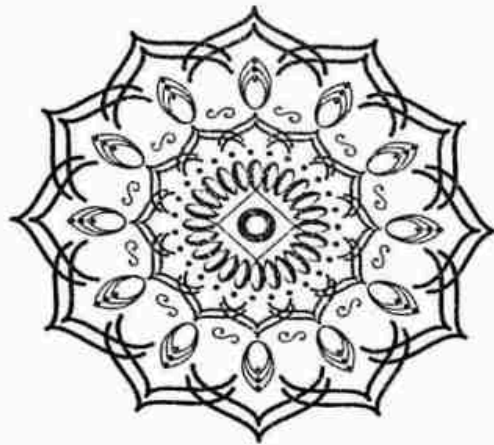
নারী! ওরা তোমাকে স্বাধীনতার প্রলোভন দেখায়। মুক্তির কথা বলে। স্বাবলম্বিতার স্বপ্ন দেখায়। ওরা বলতে চায়, তুমি পরাধীন। তোমার ঘর তোমার কারাগার। তোমার স্বামী তোমার মনিব। তোমার সন্তান তোমার বোঝা। ওরা চায় তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। পরিবারের মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলো। কর্মাঙ্গণে গিয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়াও। মাস শেষে কয়েকটি মুদ্রার মালিক হয়ে নিজেকে সফল ভাবতে থাকো। আসলেই কী তুমি পরাধীন? তাহলে ওরা কেন তোমাকে স্বাধীন করতে চায়? ওরা চায় তুমি তোমার স্নেহশীল পিতা ও দায়িত্ববান স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। তাদের নিরাপত্তা ও দায়িত্বের ছায়া থেকে বেরিয়ে যাও। তারপর কর্পোরেট জগতের আলো আঁধারীতে ওরা তোমাকে খুবলে খুবলে খাবে। সামান্য কিছু মুদ্রার বিনিময়ে ওরা কিনে নিতে চাইবে তোমার স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতা, চরিত্র, দেহ সবকিছু। নারী স্বাধীনতার চটকদার সব শ্লোগানের আঁড়ালে ওরা লুকিয়ে রাখে ওদের দূরভিসন্ধি। প্রতারিত হয়ো না নারী!। আস্থা রাখো তোমার রবের প্রতি। আস্থা রাখো তোমার রবের বিধানের প্রতি। তোমাকে স্বাধীনতার বুলি শুনিয়ে ওরা আসলে কী হাসিল করতে চায়? কোথায় নিয়ে ওরা তোমাকে দাঁড় করাতে চায়? তোমার প্রকৃত স্বাধীনতা আসলে কোথায়? তোমার রব তোমাকে কী বিধান দিয়েছেন? তিনিই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নন।

এসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বর্তমান সময়ের খ্যাতিমান স্কলার ডক্টর ইয়াদ কুনাইবী হাফিজাহুল্লাহ। তার প্রাঞ্জল বর্ণনা আর তথ্যপূর্ণ বক্তব্যে ফুটে উঠেছে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার স্বরূপ। তার জনপ্রিয় সিরিজ 'সিলসিলাতুল মারআহ' এর শ্রুতি অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে শব্দতরু।